বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রদূত

মোহাম্মদ কামরুজ্জামান

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রদূত

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রদূত

মোহাম্মদ কামরুজ্জামান

বাংলা একাডেমী ঢাকা

প্রথম প্রকাশ

আষাঢ় ১৪০১

জুন ১৯৯৪

পাণ্ডুলিপি

ভাষা ও সাহিত্য উপবিভাগ

বাএ ৩০৮৪

প্রকাশক

সুব্রত বিকাশ বড়ুয়া

পরিচালক

ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও পত্রিকা বিভাগ

বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১০০০

মুদ্রাকর

আশফাক-উল-আলম

ব্যবস্থাপক

বাংলা একাডেমী প্রেস, ঢাকা ১০০০

প্রচ্ছদ

হাশেম খান

মূল্য

পঁচাশি টাকা

BIJNAN O PRAJUKTIR AGRADUT (A collection of life-sketches of a number of scientists). Written by Mohammad Kamruzzaman. Published by Subrata Bikash Barua, Director, Language, Literature, Culture and Journal Division, Bangla Academy, Dhaka, Bangladesh. First edition : June 1994. Price Taka 85.00 only.

ISBN 984-07-3093-2

BANSDOC Library
Accession No.
Date

উৎসর্গ

শ্রদ্ধেয় পিতা-মাতার

করকমলে

ভূমিকা

প্রত্যেকটি কাজের একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকে এবং সেখানে পৌঁছানোর জন্য একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনাও থাকে। লক্ষ্যহীন কর্ম আর হালবিহীন নৌকার একই পরিণতি ঘটে। তবে কাজের শুরু থেকে শেষ লক্ষ্যস্থল পৌঁছা পর্যন্ত সর্বক্ষণ যে জিনিসটির প্রয়োজন সেটি হচ্ছে অনুপ্রেরণা। নেতাগণ দেশ ও জাতির মঙ্গল কামনায় অনুপ্রাণিত হয়ে নেতৃত্ব দিয়ে থাকেন, সৈন্যরা দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে হাসতে হাসতে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দেয়। নতুন দেশ আবিষ্কারের নেশায় আবিষ্কারক গহীন জঙ্গল, দুর্গম মরুভূমি, বরফ-শীতল মেরু পাড়ি দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেন না। নতুন আবিষ্কারের উন্মাদনায় বৈজ্ঞানিকরা সারা জীবন ব্যয় করতে কুণ্ঠিত হন না। মানব সমাজের মঙ্গল কামনায় সমাজসেবী, ধর্মপ্রচারক নিজের জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দেন। বিশ্বের প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিদের জীবনী পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, তাঁদের অমর কীর্তির পিছনে কোনো না কোনো বিশেষ অনুপ্রেরণা কাজ করেছে।

বিদ্যুৎ-পরিবাহী আবিষ্কারক মহামতি স্টিফেন গ্রে এক অমর প্রতিভা। কর্মময় জীবন হতে অবসরপ্রাপ্ত ৭০ বৎসরের বৃদ্ধ স্টিফেন গ্রে (১৬৬৬–১৭৩৬) মৃত্যুর পূর্বদিনে লন্ডনের রয়াল সোসাইটির সামনে তাঁর আবিষ্কার প্রদর্শন করে ইতিহাসের বুকে অমর হয়ে আছেন। ঐশ্বরিক শক্তির প্রতি গভীর বিশ্বাসী বিজ্ঞানী ওরস্টেড (১৭৭৭–১৮৮১) বিশ্বাস করতেন, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল শক্তি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। তিনি প্রমাণ করতে সমর্থ হয়েছিলেন যে, চুম্বক ও বিদ্যুৎশক্তি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত এবং তিনি শক্তির অবিনশ্বরবাদ সম্বন্ধে অকাট্য যুক্তি তুলে ধরেন। মাত্র ১৮ বছর বয়সে চোখের সামনে পিতার শিরোচ্ছেদ দেখেও আমপিয়ার (১৭৭৫–১৮৩৬) জীবনের লক্ষ্য থেকে ভ্রষ্ট হন নি। ফলে আমরা পেয়েছি বিশ্বের সেরা একজন অঙ্কশাস্ত্রবিদ, রসায়নবিদ ও বিদ্যুৎ-প্রযুক্তির অন্যতম দিকপাল। ডাক্তারদের অতি প্রয়োজনীয় রোগনির্ণায়ক যন্ত্র স্টেথোস্কোপের আবিষ্কারক চার্লস হুইটস্টোন (১৮০২–১৮৭৫) কিন্তু ডাক্তার ছিলেন না—ছিলেন বাদ্যযন্ত্রের ব্যবসায়ী। বিশ্ববিখ্যাত ডানলপ টায়ারের আবিষ্কারক ডানলপ

ছিলেন একজন পশু-চিকিৎসক। একমাত্র পুত্রের আব্‌দার মেটাতে গিয়ে তিনি ডানলপ টায়ারের আবিষ্কার করেছিলেন। নিজ হাতে বিষপান করেছিলেন, তবুও সক্রেটিস মিথ্যা বলেন নি। জ্যামিতির একটি প্রতিপাদ্য সমাধান করায় ব্যস্ত আর্কিমিডিস দখলদার সেনার হাতে নিহত হয়েছিলেন।

গাছ থেকে ফল ঝরে নিচে পড়ে, কখনো আকাশে উঠে না--কিন্তু কেন ? নিউটন (১৬৪২-১৭২৭) এই 'কেন'র জবাব খুঁজে পেয়েছিলেন। গবেষণাগারে ১৮ থেকে ২২ ঘন্টা পরিশ্রম করে টমাস আলভা এডিসন (১৮৪৭-১৯৩১) দেখিয়ে গিয়েছেন যে, মানুষের পক্ষে সবই সম্ভব। শক্তির সাথে বস্তুর ভর ও আলোর বেগের যোগসূত্র প্রমাণ করে আইনস্টাইন (১৮৭৯-১৯৫৫) মানব জাতিকে শক্তির অফুরন্ত ভাণ্ডার উপহার দিয়েছেন। বিখ্যাত মোর্স কোডের আবিষ্কারক মোর্স (১৭৯১-১৮৭২) ছিলেন একজন চিত্রশিল্পী। গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্কশাস্ত্রের অধ্যাপক পিতার ৭ বৎসর বয়স্ক পুত্র উইলিয়াম টমসন (লর্ড কেলভিন) পিতার সাথে ক্লাসে উপস্থিত ছিলেন। একটি অংকের সমাধান যখন কেউই দিতে পারছিলেন না তখন তিনি চিৎকার করে বলেছিলেন "আব্বু, আব্বু, আমি পারবো!" টেলিফোনের আবিষ্কারক গ্রাহাম বেল (১৮৪৭-১৯২২) ছিলেন মূক ও বধির স্কুলের একজন শিক্ষক।

ইনডাকটেন্সের আবিষ্কারক অলিভার হেভিসাইড (১৮৫০-১৯২৫) আর্থিক দুরবস্থার কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ পান নি, কিন্তু নিজস্ব পরিশ্রম ও সাধনার দ্বারা তিনি অংকশাস্ত্র ও পদার্থবিদ্যায় এত ব্যুৎপত্তি লাভ করেন যে, তাঁর রচিত প্রবন্ধ পড়ে বোঝার মতো ক্ষমতা অনেক পণ্ডিতের তখন ছিল না। ফলে তাঁর প্রবন্ধ কোনো পত্রিকায় ছাপা হতো না। মার্কনী (১৮৭৪-১৯৩৭) রেডিও আবিষ্কার করার পর স্বদেশী ইটালীয় সরকারের কর্মকর্তারা সেটা গ্রহণ করতে অস্বীকার করলে মায়ের অনুপ্রেরণায় ইংল্যান্ড চলে যান এবং সেখানে তিনি প্রতিভার যথাযথ স্বীকৃতি পান। মার্কনী তেমন শিক্ষিত ছিলেন না। শুধুমাত্র নিজের চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের দ্বারা তিনি রেডিওর মতো গুরুত্বপূর্ণ একটি আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

আধুনিক টেলিভিশন সেট ও টেলিভিশন ক্যামেরা আবিষ্কারের কৃতিত্বের অধিকারী সোরিকিন ছোটবেলায় "বালকদের জন্য আবিষ্কারের কাহিনী" নামক বই পড়ে আবিষ্কারক হওয়ার বাসনা পোষণ করে ছাত্র অবস্থাতেই তিনটি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার করেন।

ইলেকট্রনিক্স প্রযুক্তিতে ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট বা আই.সি.চিপ (I.C.Chip) এক বৈপ্লবিক আবিষ্কার। কিন্তু এর আবিষ্কারক কিলবীর (১৯২৩) নাম কত জন জানে? কিলবী ছিলেন খুবই লাজুক ও নিবেদিতপ্রাণ প্রকৌশলী। পকেট ক্যালকুলেটরের তিনিই উদ্ভাবক। কম্পিউটার যে এখন ঘরে ঘরে ব্যবহৃত হয় এজন্য কিলবীর অবদান কম নয়। এক বর্গইঞ্চি সিলিকন চিপের ভিতর ১০ লক্ষ ক্ষুদ্র ইলেকট্রনিক যন্ত্রাংশ বসানো সম্ভব বলে মনে করা হয়। বেতার-তরঙ্গের আবিষ্কারক হার্ৎস্ (১৮৫৭-১৮৯৪) মাত্র ৩৭ বৎসর বয়সে ক্যান্সারে প্রাণত্যাগ করেন। জীবনের এই ক্ষুদ্র পরিসরে তিনি বিশ্বকে অনেক কিছু দিয়েছেন।

অতি সাধারণ জিনিস বালি হতে মহামূল্যবান ও আধুনিক টেলিফোন-যোগাযোগ ব্যবস্থার বিস্ময় আলোক-তন্তু (optical fibre) আবিষ্কার করে সংবাদ-যোগাযোগ ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নতুন এক প্রযুক্তির উদ্ভাবন করে প্রফেসর-বিজ্ঞানী চার্লস কুয়েন কাও বিজ্ঞানীদের শতবর্ষের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করে ইতিহাসে নিজের নাম অক্ষয় করেছেন। চুলের মতো চিকন একটি আলোকতন্তুর ভিতর দিয়ে একসাথে হাজার হাজার টেলিফোন চ্যানেল প্রেরণ করা সম্ভব হয়েছে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ইতিহাস এমনি ধরনের অসংখ্য চমকপ্রদ কাহিনীতে পূর্ণ, সেগুলো থেকে আমরা অনুপ্রাণিত হতে পারি সমৃদ্ধ জীবনের নিশ্চয়তাপূর্ণ নতুন বিশ্ব গড়ে তোলার কাজে অংশগ্রহণ করতে। এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, জাতীয় উন্নয়নে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির চেয়ে বড় হাতিয়ার আর কিছু নেই। একমাত্র বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির মাধ্যমেই আমরা ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও অজ্ঞতার বিরুদ্ধে সংগ্রামে জয়ী হতে পারবো।

আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অসংখ্য শাখা-প্রশাখার মধ্যে ইলেকট্রিসিটি ও ইলেকট্রনিকস একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। বস্তুত ইলেকট্রিসিটি বা বিদ্যুতের আবিষ্কার না হলে মানব সভ্যতার এত দ্রুত অগ্রগতি সম্ভব হতো না। অন্যদিকে ইলেকট্রনিক্সকে বাদ দিয়ে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির কথা ভাবাই যায় না।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এই বিশেষ শাখা দুটিকে যাঁরা তাঁদের বিস্ময়কর প্রতিভা, নিরলস পরিশ্রম, ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও নিরবচ্ছিন্ন সাধনা দিয়ে সমৃদ্ধ করে গেছেন এ গ্রন্থে প্রাতঃস্মরণীয় সেসব মনীষীর জীবন ও কর্মের সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

ছোটবেলায় বিজ্ঞানীদের জীবনী পাঠ করে অনুপ্রাণিত হওয়ার মতো তেমন উল্লেখযোগ্য কোনো বই না পাওয়ার একটা বেদনা আমার মধ্যে ছিল। ছাত্রজীবনেই ভেবেছি, কখনো সুযোগ পেলে বিজ্ঞানীদের জীবনকাহিনী নিয়ে লেখা একখানা বই তরুণ সমাজ তথা দেশের ভবিষ্যত কারিগরদের হাতে তুলে দেবো। এই বইটি সেই আকাঙ্ক্ষা পূরণেরই একটি প্রয়াস। বইটি পড়ে জ্ঞানপিপাসু কিশোর ও কিশোরীরা যদি বিন্দুমাত্র উপকৃত হয় এবং জীবনে চলার পথে এটা থেকে সামান্যতম অনুপ্রেরণা লাভ করে তবেই বইটি লেখার উদ্দেশ্য সার্থক হয়েছে বলে মনে করব।

মোহাম্মদ কামরুজ্জামান

সূচিপত্র

স্টিফেন গ্রে	১
আঁদ্রে মারি আম্পিয়ার	৬
কার্ল ফ্রিডরিখ গাউস	১২
উইলহেলম্‌ এডুয়ার্ড ওয়েবার	১৫
হান্‌স ক্রিশ্চিয়ান ওরস্‌টেড	১৯
স্যামুয়েল ফিন্‌লে ব্রিস মোর্স	২৪
জোসেফ হেনরী	৩০
এল্‌মন ব্রাউন স্ট্রোগার	৩৬
ভেরনার ফন সিমেন্স, ভিলহেলম সিমেন্স, কার্ল সিমেন্স	৪১
উইলিয়াম টমসন (লর্ড কেলভিন)	৪৬
অলিভার হেভিসাইড	৫৩
লিও চার্লস থেভেনিন	৫৮
এডওয়ার্ড লরি নরটন	৬১
অ্যালান আর্চিবাল্ড ক্যাম্পবেল সুইন্‌টন	৬২
হিদদেতসুগু ইয়াগী	৬৮
ভ্লাদিমির কোস্‌মা সোরিকিন	৭৪
এডউইন হাওয়ার্ড আর্মস্ট্রং	৮০
এলেক হারলে রিভ্‌স	৮৭
উইলিয়াম ব্র্যাডফোর্ড শক্‌লি, জন বারডিন ওয়াল্টার হার্ডসার ব্রাটেইন	৯৩
জনভন নিউম্যান	১০০
গ্রেস মারে হুপার	১০৭
প্রকৌশলী বিজ্ঞানী অধ্যাপক মন্ট কোনরাড সুজে	১১৩
জন অ্যামব্রোস ফ্লেমিং	১২১
জাঁ মরিস ইমিলি বদো	১২৯
চার্লস কুয়েন	১৩৬

স্টিফেন গ্রে

(১৬৬৬–১৭৩৬)

বিদ্যুৎ–পরিবাহী আবিষ্কারক

বিদ্যুৎ–প্রযুক্তির ইতিহাসে পরিবাহী ও অপরিবাহী পদার্থের বিশেষ গুণাবলির আবিষ্কার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অনেক শিক্ষিত লোক এখনো জানে না এর আবিষ্কারক কে ? বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিকরা সাধারণত তাঁদের কর্মময় জীবনের মধ্যাহ্নে বিভিন্ন প্রকার আবিষ্কার করে তাঁদের অমর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে যান। কিন্তু কর্মময় জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করে জীবন সায়াহ্নে মৃত্যুর পূর্বদিনে যুগান্তকারী আবিষ্কার করে বিস্ময়কর প্রতিভার বিরল স্বাক্ষর রেখে গেছেন মাত্র একজন, তিনি হলেন বিদ্যুতের পরিবাহিতা ধর্মের আবিষ্কারক স্টিফেন গ্রে। কর্মময় জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করার দশ বছর পর তিনি এই বিখ্যাত, মৌলিক ও যুগান্তকারী আবিষ্কার করেছিলেন।

অষ্টাদশ শতকের প্রথমভাগে বিদ্যুৎ সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞান ছিল অত্যন্ত সীমিত। তবে বহু যুগ ধরে মানুষ এটা জানতো যে, যদি এক টুকরা অম্বরকে (Amber) চামড়া দিয়ে ঘর্ষণ করা হয় তখন এটা ছোট ছোট হালকা বস্তু যেমন কাগজের টুকরা কিংবা পাখির পালক ইত্যাদিকে আকর্ষণ করে। বহু পুরনো এই পদ্ধতি ব্যবহার করে ছোট ছেলেমেয়েরা আজও বেশ মজা করে। তারা চিরুনি দিয়ে শুকনো চুল আঁচড়িয়ে সেটা দিয়ে পাতলা কাগজের ছোট ছোট টুকরাকে আকর্ষণ করে খেলায় মেতে ওঠে। এটা স্থির–বিদ্যুতের একটি সুন্দর উদাহরণও বটে।

ষোড়শ শতকে চুম্বক তত্ত্বের জনক বিজ্ঞানী উইলিয়াম গিলবার্ট ঘোষণা করেছিলেন যে, শুধু অম্বরই নয় অন্যান্য পদার্থেও এই বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। তিনি ঐ সমস্ত পদার্থের সম্মিলিত নাম দিয়েছিলেন ইলেকট্রিক। ইলেকট্রিক হলো গ্রীক শব্দ অম্বর–এর ইংরেজি প্রতিশব্দ। ঐ বিশেষ পদার্থগুলি ব্যতীত অন্য সমস্ত পদার্থকে তখনকার যুগে অ–বৈদ্যুতিক (non-electric) পদার্থ বলে ধরা হতো। সপ্তদশ শতকে এই বিজ্ঞানের কিছু কিছু উন্নতি হতে থাকে। জার্মানির বৈজ্ঞানিক অটো ফন গুয়েরিকে গন্ধকের একটি ঘূর্ণায়মান বল তৈরি করেছিলেন। এটির বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, যখনই এটিকে হাতে নিয়ে ঘর্ষণ করা হতো তখন সেখানে কিছু স্থির–বিদ্যুতের সৃষ্টি হতো। এটিকে

তাই বিশ্বের প্রথম বৈদ্যুতিক যন্ত্র বলে ধরা হয়। সে সময় বৈদ্যুতিক ও চৌম্বক ক্ষেত্র বাতাসে ও শূন্যস্থানে সমভাবে কাজ করে বলে ধারণা করা হতো। সে সময় শূন্যস্থানে শিখাহীন উত্তাপ ডিসচার্জ করলে আলো বিচ্ছুরিত হয় কিনা সে বিষয়েও গবেষণা চলছিল।

কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যোতির্বিদ্যা ও দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপকের সহকারী হিসেবে কর্মরত থাকাকালে স্টিফেন গ্রে কিছু কিছু বৈদ্যুতিক পরীক্ষণ ছাত্রদের দেখাতেন এবং তিনি তাঁর সুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসর শিক্ষকতা কালে ছাত্রদের শেখাতেন কি করে একটি লম্বা কাচের নলকে সজোরে ঘষে তার গায়ে স্থির–বিদ্যুৎ তৈরি করা যায়। ১৭১৯ সালে কর্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণ করার পর তিনি লন্ডনের চার্টার হাউজের সদস্য হয়েছিলেন। এই চার্টার হাউজটি ছিল তৎকালীন পেনশনভোগীদের একটি সংগঠন। এই চার্টার হাউজের সদস্য হয়ে তিনি বিদ্যুতের উপর গবেষণা শুরু করেছিলেন, যে গবেষণার ফল সুদীর্ঘ আড়াইশ বছর পরেও তাঁকে ইতিহাসে অমর করে রেখেছে। অবসর গ্রহণ করার পর তিনি যে সাধনা শুরু করেছিলেন ১৭৩৬ সালে মৃত্যুর পূর্বদিন পর্যন্ত সেই সাধনায় তিনি রত ছিলেন। তাঁর এই সুদীর্ঘ সাধনার ফলাফল তিনি মৃত্যুর পূর্বদিনে লন্ডনের রয়্যাল সোসাইটিতে প্রদর্শন করেছিলেন। ১৭২৯ সালে তিনি বিদ্যুৎ–পরিবাহী তত্ত্বের আবিষ্কার করেছিলেন। এই তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে পরবর্তী শতকে বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফির জন্ম হয়।

গ্রে জানতেন যে, অম্বর, রেজিন (resin), কাচ (বিদ্যুৎ–অপরিবাহী) ইত্যাদিকে তৎকালে প্রচলিত পদ্ধতিতে যেমন ঘর্ষণ, তাপ প্রয়োগ, হাতুড়ির আঘাত ইত্যাদি দ্বারা বৈদ্যুতিকভাবে উত্তেজিত করা সম্ভব, কিন্তু ধাতব পদার্থ ব্যবহার করে সেটা সম্ভব নয়। তিনি এটা খুব ভাল করে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন যে, একটি কাচের দণ্ডকে ঘষে বৈদ্যুতিক চার্জযুক্ত করে সেই চার্জকে ধাতব পদার্থে স্থানান্তর করা সম্ভব এবং এটা তিনি সাফল্যজনকভাবে প্রমাণ করেছিলেন। তিনি যে কাচের নলটি দিয়ে পরীক্ষা করেছিলেন সেটি ছিল সাড়ে তিন ফুট লম্বা, যার ভিতরে এক ইঞ্চি ব্যাসার্ধের একটি ছিদ্র ছিল এবং এর মাথার দিকটা মধ্যবর্তী স্থানের চেয়ে অপেক্ষাকৃত মোটা ছিল। তিনি কাচ–দণ্ডটির উভয় প্রান্ত ছিপি (কর্ক) দিয়ে বন্ধ করে দিয়েছিলেন যাতে নলের ভিতরে ধুলাবালি, ময়লা ইত্যাদি প্রবেশ করতে না পারে। পরবর্তীকালে প্রমাণিত হয়েছিল যে, ঐ ছিপি দুটো ধুলাবালি নিরোধক হিসেবে যত না ফলপ্রদ তার চেয়েবেশি অন্য প্রয়োজনে কার্যকর ছিল।

প্রথমে, কাচ–দণ্ডটির আকর্ষণ করার ক্ষমতার উপর কর্কের কোনোরূপ প্রভাব আছে

কিনা তা প্রমাণ করার জন্য একটি পরীক্ষা চালানো হয়েছিল। বাস্তবক্ষেত্রে এটা প্রভাবহীন বলেই প্রমাণিত হয়েছিল। কিন্তু এর পরে যে ঘটনা ঘটেছিল সেটা ছিল যেমন চমকপ্রদ তেমনি রোমাঞ্চকর। পরীক্ষাকালে তিনি পাখির পাতলা হালকা পালকগুলোকে কর্কের নিকট ধরা মাত্রই পালকগুলো বেশ কয়েকবার আকর্ষিত ও বিকর্ষিত হয়েছিল। এটা দেখে গ্রে–এর বিস্ময়ের অবধি ছিল না। এর মানে হলো কর্কগুলো নিজেরাই ইলেকট্রিফাইড বা বৈদ্যুতিক চার্জযুক্ত হয়েছিল, অর্থাৎ আরো পরিষ্কার করে বলা যায় যে, বৈদ্যুতিক চার্জগুলি কাচের নল থেকে কর্কের মধ্যে স্থানান্তরিত হয়েছিল। এই সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে তিনি হাতির দাঁতের তৈরি একটি বলের ভিতর চার ইঞ্চি লম্বা চামড়ার দণ্ড প্রবেশ করিয়ে অন্য প্রান্তটি কর্কের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে পরীক্ষাটি পুনরায় করে দেখেন। তিনি দেখতে পেয়েছিলেন যে, কর্ক ও চামড়ার দণ্ড উভয়েই বিদ্যুৎপরিবাহী হিসেবে কাজ করতে পারে, যার ফলে বৈদ্যুতিক চার্জগুলো হাতির দাঁতের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। লোহা ও পিতলের তৈরি আট ইঞ্চি ও পরে চব্বিশ ইঞ্চি দীর্ঘ নল ব্যবহার করে তিনি একই ফল পেয়েছিলেন। পরিশেষে তিনি বলটিকে একটি শক্ত পাকানো দড়ি দিয়ে বেঁধে সরাসরি লম্বভাবে ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন এবং একই ফলাফল পেয়েছিলেন। অর্থাৎ বিদ্যুৎ–চার্জগুলো বলের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল। এই সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে তিনি দড়িটির দৈর্ঘ্য ক্রমশ বাড়িয়ে যাচ্ছিলেন, ফলে ঘরের ভিতরে আর পরীক্ষা চালানো সম্ভব ছিল না, তাই তিনি দড়িটিকে সমান্তরালভাবে বিস্তৃত করে পরীক্ষা চালিয়ে যেতে থাকেন। দড়িটিকে সোজা সমান্তরালভাবে ঝুলিয়ে রাখতে তিনি দুটি লোহার খুঁটি পুঁতে ঐ খুঁটি দুটির প্রান্তে আরেকটি দড়ি বেঁধে দিলেন এবং বলটিকে ঝুলিয়ে দিলেন। যখন কাচের দণ্ডটিকে চার্জযুক্ত করে দড়িটিকে স্পর্শ করা হয় দুর্ভাগ্যবশত তখন কিছুই পাওয়া যায় নি, অর্থাৎ কিছুই ঘটে নি। এর কারণ তিনি পরে বুঝতে পেরেছিলেন। লম্বভাবে ঝুলানো দড়ি দিয়ে লোহার খুঁটির মধ্য দিয়ে চার্জগুলি প্রবাহিত হয়ে কাঠের বিমের মধ্যে চলে গিয়েছিল। এই ব্যর্থতায় স্থির নিশ্চিত হয়ে তিনি সমান্তরাল পরীক্ষা পদ্ধতি বাদ দিয়ে লম্বভাবে ঝুলানো দড়ি দিয়ে আরো লম্বা দড়ির সাহায্যে পরীক্ষা চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।

একই বছর জুনের শেষের দিকে তিনি তাঁর বন্ধু গ্লানভিল হুইলারকে (১৭০১–১৭৭০) তাঁর পরীক্ষা দেখিয়েছিলেন। হুইলার নিজেও বিদ্যুৎ তত্ত্বের গবেষক ছিলেন ও বিদ্যুৎ বিষয়ে গভীর জ্ঞান রাখতেন। পরীক্ষাটি দেখে উৎসাহিত হয়ে তিনিও গ্রে–এর সাথে একত্রে পরীক্ষা করতে রাজি হয়েছিলেন। হুইলারের খামার বাড়ির শীর্ষদেশে বসানো

বায়ুর দিক–নির্ণয় দণ্ড থেকে মাটি পর্যন্ত আটত্রিশ ফুট লম্বা দড়ি ঝুলিয়ে একই পরীক্ষার পুনরাবৃত্তি করে তাঁরা একই ফলাফল পেয়েছিলেন অর্থাৎ আটত্রিশ ফুট লম্বা দড়ির মধ্য দিয়ে বৈদ্যুতিক চার্জ হাতির দাঁতের তৈরি বলের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল। পরে হুইলারের পরামর্শে সমান্তরালভাবে ঝুলানো রেশমী দড়ির সাহায্যে একই পরীক্ষা করা হয়, যদিও তখনো তাঁদের জানা ছিল না যে, রেশম বিদ্যুৎ–অপরিবাহী। ১৭২৯ সালের ২ জুলাই ৮০ ফুট লম্বা দড়ির সাহায্যে এবং পরে দৈর্ঘ্য বাড়িয়ে একশত সাতচল্লিশ ফুট লম্বা দড়ি ব্যবহার করে তাঁরা সাফল্য অর্জন করেছিলেন অর্থাৎ এই সুদীর্ঘ দড়ি বেয়ে চার্জপ্রাপ্ত কাচের নল থেকে বৈদ্যুতিক চার্জ হাতির দাঁতের তৈরি বলের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল এবং সেই বলটা আকর্ষণ শক্তি প্রদর্শন করে বৈদ্যুতিক চার্জের উপস্থিতি প্রমাণ করেছিল। পরের দিন দুইশত তিরানব্বই ফুট লম্বা দড়ি ব্যবহার করে পরীক্ষা চালানোর সময় দড়ির ভার সইতে না পেরে রেশমের সুতাটি ছিঁড়ে যায়, তখন তাঁরা পিতলের তৈরি শক্ত তার ব্যবহার করে পরীক্ষাটি আবার করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত কোনো ফলাফলই পাওয়া যায় নি, কারণ পিতলের তৈরি তারের ভিতর দিয়ে সমস্ত বৈদ্যুতিক চার্জ বাহিত হয়েছিল। এই দুর্ভাগ্যজনক ব্যর্থতার মাঝেই তাঁরা সাফল্যের আলো দেখেছিলেন। তাঁরা এটা খুব ভালোভাবে বুঝতে পেরেছিলেন যে, দড়ি/সুতা/তার ইত্যাদির আকার বা আয়তনের উপর বিদ্যুৎ পরিবহণ নির্ভর করে না—নির্ভর করে কি ধরনের পদার্থ দিয়ে এটি তৈরি তার উপর। অর্থাৎ সিল্কের তৈরি সুতার ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হতে পারে নি, কিন্তু পিতলের তৈরি তারের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছিল। ফলে তিনি এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে, সমস্ত পদার্থকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। সিল্ক বা রেশম জাতীয় (অপরিবাহী) এবং পিতল জাতীয় (পরিবাহী)। তিনি তাঁর পরীক্ষাধীন পাকানো দড়িটির নাম দিয়েছিলেন লাইন অফ কম্যুনিকেশন অর্থাৎ যোগাযোগের সূত্র। এর মাত্র কিছু দিন পরে গ্রে–এর বন্ধু বৈজ্ঞানিক জে. টি. ডিসাগুলিয়ার 'ইনুসুলেটর' ও 'কনডাকটর' শব্দ দুটির প্রবর্তন করেন। লাতিন 'ইনসুলেটর' শব্দের মানে হলো দ্বীপ অর্থাৎ বিচ্ছিন্ন অবস্থা। ফলে গিলবার্টের প্রবর্তিত শব্দ দুটি (ইলেকট্রিক ও নন–ইলেকট্রিক) পরিবর্তিত হয়ে কনডাকটর ও ইনসুলেটরে পরিণত হলো। গ্রে এবং হুইলার তাঁদের পরীক্ষাটি সাতশত পঁয়ষট্টি ও আটশত ছিয়াশি ফুট লম্বা দড়ির সাহায্যে সম্পন্ন করে সফলতা অর্জন করেছিলেন। তাঁদের পরীক্ষাটি ছিল আধুনিক টেলিফোন যোগযোগ ব্যবস্থার ভিত্তি। কিন্তু দুর্ভাগ্য এই যে, ঐ পরীক্ষার মূল্যায়ন করার মতো মেধা তখন ছিল না। ফ্রান্সের চার্লস দ্য কে (১৬৯৮–১৭৩৯) গ্রে–এর পরীক্ষার পুনরাবৃত্তি করে প্রমাণ করেছিলেন

যে, ধাতব পদার্থের তৈরি তার ও ভিজা দড়ি শুকনো পাকানো দড়ির চেয়ে অনেক ভালো পরিবাহী। পরবর্তীতে তিনি এই বৈশিষ্ট্য দুটির নাম দিয়েছিলেন 'ভিট্রেয়াস' ও 'রেজিনাস'। এর পরে যুক্তরাষ্ট্রের বৈজ্ঞানিক ফ্রাঙ্কলিন এই শব্দ দুটির সহজ নামকরণ করেন পজিটিভ ও নেগেটিভ।

ইতিমধ্যে গ্রে প্রমাণ করেছিলেন যে, মানবদেহ খুব ভালো বিদ্যুৎ পরিবাহী। এটা প্রমাণ করতে গিয়ে তিনি একটি অল্প বয়স্ক বালককে দড়ির শেষ প্রান্তে ঝুলিয়ে দিয়ে চার্জযুক্ত কাচের নলটিকে বালকটির শরীরে স্পর্শ করান। একটি ধাতব ফলক বালকটির মুখের কাছে ধরা মাত্র ওটি আকর্ষিত হওয়ার মাধ্যমে গ্রে-এর তত্ত্ব প্রমাণিত হয়। এই পরীক্ষাটি এতই জনপ্রিয়তা লাভ করে যে, জার্মানির লাইপসিগ শহরের অধিবাসী জর্জ বোয়াস ১৭৪৩ সালের দিকে দড়ির অপর প্রান্তে সুন্দরী মেয়েদের ঝুলিয়ে রেখে যুবকদেরকে ঐ মেয়েদের স্পর্শ করতে বলতেন। যুবকেরা ঐ মেয়েদের স্পর্শ করবার সময় বিদ্যুৎ চার্জ দ্বারা বিকর্ষিত হয়ে ভয়ে ও আতঙ্কে পিছিয়ে আসতো; এটা একটা মজার খেলায় পরিণত হয়। ১৭৪৫ সালে লাইডেন জার আবিষ্কৃত হওয়ার পর পরীক্ষাটি আরো বেশি জনপ্রিয় হয়ে উঠে। ফ্রান্সের বৈজ্ঞানিক এবে নেলে ১৮০ জন রাজকীয় প্রহরীকে পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে এবং পরবর্তীতে ৫৮০০ জন সন্ন্যাসীকে একত্রিত করে এই পরীক্ষাটি করে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন। পরবর্তী শতাব্দীতে প্রমাণিত হয়েছে যে, বৈদ্যুতিক চার্জকে আলোর গতিবেগের সমান গতিবেগে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে প্রেরণ করা সম্ভব। সত্তর বছরের বৃদ্ধ স্টিফেন গ্রে তার ঐতিহাসিক আবিষ্কারের মাধ্যমে মানব-সভ্যতার ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন।

আমাদের দেশে অনেক অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, বৈজ্ঞানিক, চিকিৎসক, কৃষিবিদ রয়েছেন যাঁরা সুস্থ সুন্দর কর্মহীন অবসর জীবন যাপন করছেন। মহাত্মা গ্রে-এর জীবনী তাঁদের জন্য এক উজ্জ্বল দিকনির্দেশক হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

আঁদ্রে মারি আম্পিয়ার

(১৭৭৫—১৭৩৬)

চল—বিদ্যুৎ প্রযুক্তির জনক

সারাটি জীবন ঘাত—প্রতিঘাত এবং দুঃখ—বেদনার মধ্যে অতিবাহিত করেও ফ্রান্সের বিজ্ঞানী আঁদ্রে মারি আম্পিয়ার নিজকে একজন পৃথিবীখ্যাত অঙ্কশাস্ত্রবিদ, রসায়নবিদ, পদার্থবিদ এবং চলবিদ্যুৎ—প্রযুক্তিবিদ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। বিজ্ঞানী ম্যাকসওয়েল তাঁকে চলবিদ্যুৎ—প্রযুক্তির নিউটন হিসেবে অভিহিত করেছেন। আমরা আজ তাঁর নাম প্রতিটি প্লাগ, সকেট এবং ফিউজ ব্যবহার কালে স্মরণ করে থাকি।

১৭৭৫ সালের ২২ জানুয়ারি ফ্রান্সের লিয়োঁ শহরে তাঁর জন্ম হয়। তাঁর পিতা ছিলেন ফ্রান্সের একজন অন্যতম বিখ্যাত ধনী ব্যক্তি। আম্পিয়ারের জন্মের পর পরই তাঁর পিতা শহর ছেড়ে গ্রামে বসবাস করার সিদ্ধান্ত নেওয়ায় তাঁর বাল্যকাল গ্রামীণ পরিবেশে অতিবাহিত হয়। বাড়িতেই পিতার নিকট তাঁর শিক্ষাজীবন শুরু হয় এবং পিতার উৎসাহ ও যত্নে তিনি অল্প বয়সেই বিভিন্ন প্রকার বিদ্যায় জ্ঞান লাভ করেন। বিজ্ঞান, মেটাফিজিক্স, অঙ্কশাস্ত্র, কলাবিদ্যা, কবিতাচর্চা এমনকি ল্যাটিন ভাষাতেও তিনি খুবই দক্ষতা অর্জন করেন। অঙ্কশাস্ত্রের তৎকালীন বিখ্যাত পণ্ডিত অয়লার ও বারনুলির লিখিত বই বোঝার জন্য তিনি ল্যাটিন ভাষা আয়ত্ত করেছিলেন। এরূপ বহুমুখী জ্ঞান অর্জনের সাথে সাথে রোমান ক্যাথলিক ধর্মের উপরও তিনি প্রচুর অধ্যয়ন করে ধর্মের প্রতি গভীর অনুরাগী হয়ে উঠেন। তাঁর এই ধর্মীয় অনুভূতি পরবর্তী জীবনে তাঁর জীবন ও জীবিকা উভয়ের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল।

ঐতিহাসিক ফরাসি বিপ্লবের পরে ১৭৯৩ সালের ২২ নভেম্বর একজন বুর্জোয়া হিসেবে তাঁর পিতাকে গিলোটিনে শিরোচ্ছেদ করে হত্যা করা হয়। সে সময় আম্পিয়ারের বয়স মাত্র ১৮ বছর। পিতার এই নির্মম হত্যাকাণ্ডে ভীষণভাবে আঘাত পেয়ে তিনি সুদীর্ঘ একটি বছর নির্জন—বাসে থেকে ধীরে ধীরে পুনরায় কর্মজীবনে ফিরে আসেন। এই প্রচণ্ড মানসিক আঘাত সারা জীবন তাঁর মনোজগতে প্রভাব বিস্তার করেছিল। তাঁর বয়স যখন বাইশ তখন তিনি এক মহিলার সাথে পরিচিত হন, পরে এঁকে তিনি স্ত্রী হিসেবে বরণ করেছিলেন। আর্থিক দৈন্যের কারণে তিনি সেই বয়সে বিয়ে করতে

পারেন নি। ১৭৯৯ সালে তাঁরা পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। সে সময় তিনি অঙ্কশাস্ত্রের শিক্ষক হিসেবে জীবিকা নির্বাহ করতেন। এছাড়া তিনি উদ্ভিদবিদ্যা ও কবিতা চর্চাও করতেন। বিবাহের কিছুদিন পর তাঁর এক বিশেষ গবেষণা–প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ঐ গবেষণা–প্রবন্ধের নাম ছিল Theory of games of chance (দৈব খেলার তত্ত্ব)। তাঁর ঐ প্রবন্ধটি খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করে। রাতারাতি তিনি খ্যাতিমান পুরুষে পরিণত হন। পুরস্কার স্বরূপ তিনি বোর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যা ও রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপকের পদ লাভ করেন। এতে তাঁর আর্থিক কষ্টের অবসান ঘটে। মাত্র ৪ বছর যেতে না যেতেই তিনি পুনরায় দুর্ভাগ্যের শিকার হন। এ সময় হঠাৎ তাঁর স্ত্রী মারা যায়। দুঃখ, বেদনা এবং হতাশা ভারাক্রান্ত মন নিয়ে তিনি লিয়ো শহর ত্যাগ করে প্যারিসে বসবাস শুরু করেন। প্যারিসে তিনি নিজকে একজন বিজ্ঞানী হিসেবে ধীরে ধীরে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন। প্রথমে বিখ্যাত ইকোলি পলিটেকনিকের অধ্যাপক ও ইমপেরিয়াল ইনস্টিটিউটের সদস্য এবং পরে প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। এ সময় তৎকালীন বিখ্যাত বিজ্ঞানী বায়র্ট, স্যাভট, লাপলাস ও পোয়াসোঁর সংস্পর্শে এসেছিলেন। তাঁর মানসিক বেখেয়ালিপনার জন্য তিনি ভুলোমনা প্রফেসর হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছিলেন। এমনকি একবার সম্রাট নেপোলিয়ন কর্তৃক দেওয়া নৈশভোজে আমন্ত্রণের কথাও তিনি বেমালুম ভুলে গিয়েছিলেন। যদি তিনি ১৮২০ সালের পূর্বে মৃত্যুবরণ করতেন তবুও অঙ্কশাস্ত্রে ও রসায়নশাস্ত্রে তাঁর অসামান্য অবদানের জন্য তিনি পৃথিবীর বিখ্যাত বিজ্ঞানীদের একজন হিসেবে চিহ্নিত হতেন। উদাহরণস্বরূপ বিখ্যাত আভোগাড্রোর সূত্রটি ফ্রান্সে আভোগাড্রো–আম্পিয়ার সূত্র হিসেবেই সুপরিচিত। কারণ আভোগাড্রোর আবিষ্কারের তিন বছর পরে আম্পিয়ারও একই সূত্র আবিষ্কার করেছিলেন। ১৮১০ সালে ক্লোরিন এবং ১৮১৩ সালে আয়োডিন এই দুইটি মৌলিক পদার্থের আবিষ্কার তিনিই করেছেন। কিন্তু মাত্র সামান্য সময়ের ব্যবধানে স্যার হামফ্রি ডেভী সমস্ত কৃতিত্বের অধিকারী হয়েছিলেন। যাহোক ১৮২০ সাল থেকে ১৮২৭ এই সাত বছরে ইলেকট্রোডায়নামিকসে তাঁর অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি অমর হয়ে আছেন। ১৮২০ সালের ২১ জুলাই প্রকাশিত ওরসটেডের তড়িৎ–চৌম্বক তত্ত্ব সারা বিশ্বে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করে, কারণ এর ত্রিশ বছর পূর্বে চার্লস কুলম্ব প্রমাণ করেছিলেন যে, চুম্বক ও বিদ্যুৎ উভয়ের ধর্ম আলাদা এবং এদের মধ্যে পারস্পরিক কোনো সম্পর্ক নেই। ওরসটেড সেই মতবাদ খণ্ডন করে বিদ্যুৎ ও চুম্বক শক্তি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত বলে প্রমাণ করেছিলেন। এরপরে প্যারিসবাসীরা অবাক বিস্ময়ে একের পর এক নিত্য নতুন

প্রযুক্তির উদ্ভাবনের সাথে পরিচিত হয়েছেন, কারণ আম্পিয়ার সে সময় ওরসটেডের সূত্রকে বিশ্লেষণ করে এর দিগন্তকে আরো প্রসারিত ও সমৃদ্ধ করে চলেছিলেন। আম্পিয়ার এই নতুন প্রযুক্তির নামকরণ করেছিলেন চলবিদ্যুৎ প্রযুক্তি বা ইলেকট্রোডায়নামিকস, কেননা চলবিদ্যুৎশক্তির দ্বারাই এই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ প্রযুক্তির সৃষ্টি হয়েছে। তিনি পুরাতন বিদ্যুৎ–প্রযুক্তির নামকরণ করেছিলেন স্থিরবিদ্যুৎ–প্রযুক্তি (ইলেকট্রোস্টাটিকস) ১৮২২ সালের দিকে তিনি নতুন প্রযুক্তিতে আরো কিছু নতুন নতুন শব্দের সংযোজন করেন ; যেমন, বিদ্যুৎ–প্রবাহ বা কারেন্ট, বিদ্যুৎ টেনশন বা ভোল্টেজ ইত্যাদি। ১৮২৭ সালের দিকে বৈজ্ঞানিক ওহ্‌ম্‌ বিদ্যুৎ–প্রবাহের সূত্রের প্রচলন করেন। ওরসটেডের আবিষ্কার বিশ্লেষণ করার পর তিনি এটাকে একটি সূত্রের আকারে প্রকাশ করেন যেটা Right handed screw rule বা দক্ষিণাবর্তী স্ক্রু–নীতি বলে বিখ্যাত হয়ে আছে। বিদ্যুৎ ও চুম্বকের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক স্থিরনিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হওয়ার পর প্রশ্ন উঠেছিল যে, এ দুটোর মধ্যে কোন্‌টা মৌলিক। আম্পিয়ারের মতে বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রই (fields of electricity) চুম্বক প্রবাহের সৃষ্টি করে থাকে। এই মতবাদে বিশ্বাসী হয়ে বিদ্যুৎ–চুম্বকের সৃষ্টি করে তিনি একটি নতুন তত্ত্বের প্রচলন করেন। যদি তাঁর ধারণা সঠিক হয়ে থাকে তবে স্বাভাবিকভাবেই মনে করা যাবে যে, যখন বিদ্যুৎপ্রবাহ একটি চুম্বকশলাকাকে নাড়া দেয় তখন তা নিশ্চয়ই একটি বিদ্যুৎ–ক্ষেত্রের উপর আরেকটি বিদ্যুৎ–ক্ষেত্রের প্রভাব। তাই তিনি বলতে চাইলেন যে, দুটি বিদ্যুৎ–প্রবাহ তাদের চুম্বক শক্তির মাধ্যমে একে অন্যের উপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে। এই তত্ত্বের প্রমাণস্বরূপ তিনি বিজ্ঞানী লাপলাস কর্তৃক সুপারিশকৃত একটি সাধারণ পরীক্ষার পুনরাবৃত্তি করেছিলেন। দুটি সমান্তরাল বৈদ্যুতিক তারের ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত করে দেখা গিয়েছিল যে, যখন তার দুটোর মধ্য দিয়ে একই দিকে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয় তখন তারা পরস্পরকে চুম্বকশক্তির মাধ্যমে আকর্ষণ করে। কিন্তু একই তার দুটো পরস্পরকে বিকর্ষণ করে, যখন বিপরীতমুখী বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়। এভাবে কোনো দণ্ডচুম্বক ব্যতীতই চুম্বকতত্ত্বের উপর সর্বপ্রথম গবেষণা পরিচালিত হয়েছিল। তিনি এই পরীক্ষাটির সাহায্যে এটাই প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, তার দুটোর পরস্পরের প্রতি এই আকর্ষণ ও বিকর্ষণ স্থিরবিদ্যুতের প্রভাবে হয় নি। বিখ্যাত ইটালিয়ান বৈজ্ঞানিক ভোল্টার নামে তিনি এই নতুন বৈশিষ্ট্যটির নামকরণ করেছিলেন ভোল্টায়িক প্রভাব। তিনি আরেকটি নতুন শব্দের সংযোজন করেছিলেন, সেটি হলো গ্যালভানোমিটার। তিনি নিজেই বলেছিলেন যে, এটা যদিও চুম্বক–কম্‌পাসের মতো

কাজ করে তবুও এর মূল গঠন–পদ্ধতি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। বিদ্যুতের তারকে চুম্বক–কম্পাসের উপরে ও নিচে সমান্তরালভাবে রেখে তার ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত করে কম্পাসের কাঁটার নড়া–চড়া দেখে তিনি বিদ্যুৎপ্রবাহের দিক নির্ণয় করেছিলেন এবং কত কৌণিক দূরত্বে কাঁটার সরণ ঘটে সেটা থেকে বিদ্যুতের পরিমাণ পরিমাপ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ইটালিয়ান বৈজ্ঞানিক গ্যালভানির নামে তিনি এই যন্ত্রের নামকরণ করেন। গ্যালভানি প্রথম চলবিদ্যুতের আবিষ্কার করেছিলেন। বর্তমানে প্রচলিত চলবিদ্যুতের একক আম্পিয়ার–এর নামকরণ তিনি নিজে করেন নি, পরবর্তীতে অন্য বিজ্ঞানীরা তাঁর নামে বিদ্যুতের এককের (unit) নামকরণ করেছিলেন। এই সমস্ত ঘটনা থেকে বিজ্ঞানীদের পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ এবং নিজকে জাহির না করার অতুলনীয় দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষ করা যায়।

গ্যালভানোমিটারকে যাতে আরো ব্যাকপভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব হয় সেজন্য তিনি একটি সুন্দর প্রস্তাব করেছিলেন। তিনি সুপারিশ করেছিলেন যে, ভাষার বর্ণমালায় যে কয়টি অক্ষর আছে ততটি বিদ্যুৎ–পরিবাহী এবং চুম্বকশলাকা ব্যবহার করে এবং প্রত্যেকটি অক্ষরের সাথে একটি চুম্বক শলাকা যোগ করে এবং আরো কিছু উপায় অবলম্বন করে টেলিগ্রাফ প্রেরণযন্ত্র বানানো সম্ভব এবং এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বার্তা প্রেরণ করাও সম্ভব। বার্তা প্রেরণের সুবিধার্থে তিনি প্রেরক যন্ত্রের সাথে একটি কী–বোর্ড বা অক্ষর প্রেরণ যন্ত্রেরও সুপারিশ করেছিলেন। তাঁর এই প্রস্তাবিত ব্যবস্থা অনুযায়ী টেলিগ্রাফ তৈরি হয় নি এবং তাঁর এই প্রস্তাবের ত্রিশ বছর পরে উদ্ভাবিত টেলিগ্রাফ পদ্ধতিতে এটা কোনোরূপ অবদান রেখেছিল কিনা সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। তবে একথা ঠিক যে, তাঁর আবিষ্কৃত গ্যালভানোমিটার টেলিগ্রাফ আবিষ্কার ও প্রচলনে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। যখন বাস্তবভাবে টেলিগ্রাফের প্রচলন হয়েছিল তখন অক্ষরের পরিবর্তে সংকেতের সাহায্যে বার্তা প্রেরণ করা হতো, ফলে বৈদ্যুতিক তারের সংখ্যা এবং চুম্বক–শলাকার সংখ্যা কমানো সম্ভব হয়েছিল। ইতিমধ্যে তাঁর অন্যতম সহযোগী সুইভগার জার্মানিতে আরো সংবেদনশীল একটি গ্যালভানোমিটার তৈরি করেন যার মধ্যে একশতটি তারের প্যাঁচের কুণ্ডলীর উপর ঠিক কেন্দ্রস্থলে একটি চুম্বক–শলাকা বসানো ছিল। ১৮২০ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর এই নতুন যন্ত্রটির ঘোষণা দেওয়া হয় এবং পরবর্তী সময়ে টেলিগ্রাফ পদ্ধতির উন্নয়নে এটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলো। আম্পিয়ার নিজেও তারের প্যাঁচানো কুণ্ডলী ব্যবহার করতেন এবং এগুলোর নামকরণ করেছিলেন সলিনয়েড (solenoid)। তিনি দেখিয়েছিলেন যে, একটি চুম্বকের ভিতর যে সমস্ত গুণ বিদ্যমান ঐ কুণ্ডলী সেগুলির

অনুকরণ করতে পারে। পরে এই কুণ্ডলীর সাহায্যে বৈজ্ঞানিকরা আরো অধিক শক্তিশালী বৈদ্যুতিক চুম্বক তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ১৮৩১ সালে যুক্তরাষ্ট্রের জোসেফ হেনরি যে বৈদ্যুতিক চুম্বক বানিয়েছিলেন সেটি ১টন ওজনের জিনিস উত্তোলন করে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিল।

এরপর তিনি একটি অত্যন্ত দুঃসাহসিক মতবাদ প্রকাশ করলেন। তিনি বললেন যে, একটি দণ্ড–চুম্বক হচ্ছে এমন একটি চুম্বক যার ভিতর দিয়ে বৃত্তাকারে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয় এবং এর গতি বা প্রবাহ–পথ অক্ষপথের কেন্দ্রকে ঘিরে আবর্তিত হয়, এবং এই কেন্দ্রীভূত বিদ্যুৎ–প্রবাহের সৃষ্টি হয় চুম্বক–দণ্ডটি যে পদার্থে গঠিত সেই পদার্থের দুইটি অণুর পারস্পরিক সংস্পর্শের কারণে। এইভাবে তিনি পৃথিবীর চুম্বকক্ষেত্রের কারণ বিশ্লেষণের অতি কাছাকাছি পৌছে গিয়েছিলেন। এই চুম্বকক্ষেত্রটি পৃথিবীর পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে প্রবাহিত বিদ্যুৎ–প্রবাহের কারণে সৃষ্টি হয়ে থাকে। কিন্তু তাঁর ঘনিষ্ঠতম বন্ধু অগাসটিন ফ্রেনেল, যিনি আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য সম্বন্ধে গবেষণা করে বিখ্যাত হয়েছেন, তিনি আম্পিয়ারের দণ্ডচুম্বকের বিশ্লেষণের একটি ত্রুটি বের করে বলেন যে, যেহেতু লোহা একটি খুব ভালো বিদ্যুৎ–পরিবাহী নয় সুতরাং এর ভিতর দিয়ে যে কোনো ধরনের বিদ্যুৎ প্রবাহিত হোক না কেন, এটা চুম্বক–দণ্ডের ভিতরে উত্তাপের (molecular resistance) সৃষ্টি করবে, এবং তাই যদি আম্পিয়ারের বিশ্লেষিত মতবাদ সঠিক হয় তবে অবশ্যই চুম্বকটি খুব বেশি উত্তপ্ত হয়ে উঠবে, আর সেটা না হলে কমপক্ষে উষ্ণ হবেই। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে সেটা ঘটে নি। যাহোক পরবর্তী সময়ে ফ্রেনেল নিজেই এর সমাধান করেছিলেন। তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে, লোহার অণুর অভ্যন্তরীণ বৃত্তাকার বিদ্যুৎ–প্রবাহ এক অণু থেকে অন্য অণুতে প্রবাহিত না হয়ে অণুর ভিতরেই বৃত্তাকারে প্রবাহিত হতে থাকে। এই সমাধানটি আম্পিয়ার গ্রহণ করেছিলেন এবং এটা দিয়ে তিনি তাঁর ইলেকট্রোডায়নামিকসের গাণিতিক সমাধান বিশ্লেষণ করেছিলেন। এইভাবেই এটা সুন্দরভাবে প্রমাণিত হয় যে, একটি দণ্ড–চুম্বকের চুম্বকত্ব হচ্ছে প্রতিটি অণুর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত বিদ্যুৎ–প্রবাহের যোগফল। লৌহ, নিকেল, কোবাল্টের মতো ধাতব পদার্থের অণুর ভিতর দিয়ে প্রবাহিত ইতস্তত বিক্ষিপ্ত বিদ্যুৎপ্রবাহসমূহ, যাদের যোগফল হচ্ছে শূন্য অর্থাৎ কিছুই নয়, সেগুলিকে অন্য একটি বিদ্যুৎপ্রবাহ দ্বারা একদিকবর্তী করে একটি স্থায়ী চুম্বকে পরিণত করা সম্ভব। যে সমস্ত ধাতব পদার্থের মধ্যে চৌম্বক বৈশিষ্ট্য নেই সেগুলোর অণুগুলোকে একদিকবর্তী করা যায় না। ফলে ঐগুলিকে চুম্বকে পরিণত করা সম্ভব নয়। তাঁর এই মতবাদটি পরবর্তীকালে বিখ্যাত চুম্বকতত্ত্ববিদ বিজ্ঞানী উইলহেলেম ওয়েবার কর্তৃক পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত হয়ে বিদ্যুৎচৌম্বক মতবাদের মূল ভিত্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আজও প্রচলিত আছে। এরপরে আম্পিয়ার তাঁর চল–বিদ্যুতের

আণবিক মতবাদকে আরো এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে বললেন, এটা শুধু বিদ্যুৎ–চুম্বকেরই উৎস নয়, এটা রাসায়নিক বিক্রিয়ার উৎসও বটে। অর্থাৎ তিনি সম্পূর্ণ নতুন এক ধরনের বস্তুতত্ত্বের উপর আলোকপাত করতে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু খুবই পরিতাপের বিষয় এই যে, কেউই এই নতুন ধারণাকে তখন স্বাগত জানায় নি। সুদীর্ঘ দেড়শত বছর পরে বিখ্যাত মার্কিন পদার্থবিজ্ঞানী আর.পি. ফেইনম্যান ১৯৬৫ সালে আধুনিক কোয়ান্টাম ইলেকট্রোডাইনামিকসের উপর মন্তব্য প্রসঙ্গে বলেছেন, এই একটিমাত্র তত্ত্বে আমরা সকল প্রকার শক্তির বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাই। যদিও দেড়শত বছর পূর্বে আম্পিয়ার এই সূত্রটির যথার্থ নামকরণ করতে পারেন নি, তথাপি সম্পূর্ণ নিজস্ব অনুভূতি ও দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি উক্ত সূত্রের ধারণা দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, তৎকালীন যুগে আম্পিয়ার ছিলেন একজন আলোর দিশারী। তিনি অনেক আকর্ষণীয় পরীক্ষা–নিরীক্ষা করেছিলেন এবং ইলেকট্রোডায়নামিক্সকে একটি সুন্দর ও সুগঠিত গাণিতিক শাস্ত্রে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। ১৮২৭ সালে তিনি তাঁর সমস্ত গবেষণাপত্র সমন্বিত করে একটি বিশেষ গবেষণা পুস্তক প্রকাশ করেছিলেন এবং সেটা তৎকালে খুবই সমাদৃত হয়েছিল। আজও ঐ পুস্তকটিকে ইলেকট্রোডায়নামিক্স তত্ত্বের গাণিতিক বিশ্লেষক হিসেবে খুবই প্রয়োজনীয় বলে মনে করা হয়। জীবনের শেষ দিকে তিনি তাঁর আজন্ম লালিত একটি বাসনা পরিপূর্ণ করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। সেটা ছিল বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা–প্রশাখাকে যথাযথভাবে বিন্যস্ত করা। ১৮৩৪ সালে তিনি তাঁর জীবনের সর্বশেষ সংকলিত গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন। তিনি এটাকে তাঁর জীবন সাধনার সর্বশ্রেষ্ঠ ফসল বলে অভিহিত করেছেন। আজকাল লোকে সে সম্বন্ধে প্রায় ভুলেই গেছে বলা চলে। তাঁর রচিত ঐ প্রবন্ধ সংকলন থেকে বিজ্ঞানীরা ইলেকট্রোডায়নামিক্স সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে পেরেছেন। তাই তাঁর সম্মানে বিদ্যুৎপ্রবাহের এককের নামকরণ তাঁর নামে করা হয়েছে। তাঁর আবিষ্কৃত ইলেকট্রোডায়নামিক্স, ইলেকট্রোস্ট্যাটিস্টিকস, গ্যালভানোমিটার, ভোল্টায়িক ও সলিনয়েড শব্দের মাঝে মানব সভ্যতার ইতিহাসে তিনি অমর হয়ে আছেন।

১৮৩৬ সালের ১৩ জুন ৬১ বছর বয়সে ফ্রান্সের মার্সাই নগরীতে আম্পিয়ার প্রাণত্যাগ করেন। তাঁর সমাধিতে একটি প্রস্তর ফলকে "অবশেষে সুখী ব্যক্তি" এই কথা কয়টি উৎকীর্ণ করে রাখা হয়েছে। তাঁর একমাত্র পুত্র পিতা সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন যে, তিনি কখনো "হতে পারে" এই কথায় সন্তুষ্ট হতেন না, তাই সারাটি জীবন তিনি সত্যের সন্ধানে ব্রতী ছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে যাঁরা নানা প্রকার দুঃখ বেদনা ও মানসিক অশান্তিতে কষ্ট পাচ্ছেন তাঁদের জীবনে আঁদ্রে মারি আম্পিয়ার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

কার্ল ফ্রিডরিখ গাউস

(১৭৭৭–১৮৫৫)

চুম্বকতত্ত্বের পথিকৃৎ—প্রতিভা

জার্মানির ব্রুনসউইক শহরে ১৭৭৭ সালের ৩০ এপ্রিল এক দরিদ্র পরিবারে কার্ল ফ্রিডরিখ গাউস জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ছিলেন অক্ষরপরিচয়হীন একজন দরিদ্র দিনমজুর। চারিত্রিক দিক দিয়ে তাঁর পিতা একজন গোঁয়ার ও অভদ্র বলে পরিচিত ছিলেন। তাঁর মাতা একজন অল্পশিক্ষিতা মহিলা হলেও খুবই বুদ্ধিমতী ছিলেন। এমনি এক প্রতিকূল পরিবেশে গাউসের মতো এক বিস্ময়কর প্রতিভার জন্ম ও বিকাশ হয়েছিল। তিনি খুবই মেধাবী ও বুদ্ধিমান ছিলেন। শোনা যায় যে, ছেলেবেলায় কথা বলতে শেখার পূর্বে তিনি গণনা করতে শিখেন। অঙ্কশাস্ত্রে তিনি একজন দিকপাল ছিলেন। ছোট বেলায় স্কুলশিক্ষক তাঁর মেধার পরিচয় পেয়ে খুবই আশ্চর্য হয়েছিলেন এবং তাঁর পিতাকে অনুরোধ করেছিলেন, যাতে কোনো কারণেই গাউসের লেখাপড়া বন্ধ না করা হয়। পনের বছর বয়সে ডিউক ফার্দিনান্দ কর্তৃক প্রদত্ত একটি বৃত্তি পাওয়ায় তাঁর আর্থিক কষ্ট দূর হয়ে যায়। স্কুলজীবন শেষ করে তিনি প্রথমে ব্রুনসউইক কলেজে এবং ১৭৯৫ সালে গ্যোটিংগেন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন।

বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করার পূর্বেই তিনি সম্পূর্ণ নিজের প্রচেষ্টায় কিছু কিছু নতুন সূত্রের উদ্ভাবন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ সমাপ্ত করে তিনি ব্রুনসউইকে ফিরে আসেন এবং অঙ্কশাস্ত্রের উন্নয়নে গভীরভাবে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি সারা জীবন স্বল্পভাষী ছিলেন এবং লোকজনের সংসর্গ পছন্দ করতেন না। তিনি মনে মনে খুব উচ্চ আকাঙ্ক্ষা পোষণ করতেন এবং বিতর্কিত বিষয় থেকে নিজেকে সব সময় দূরে রাখতেন। তিনি অত্যন্ত আত্মসচেতন ও কট্টর জাতীয়তাবাদী ছিলেন। যখন তাঁর বৃত্তির টাকার পরিমাণ বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল তখন তিনি মন্তব্য করেছিলেন যে, ওটা তাঁর পরিশ্রমের আয় নয় এবং ঐ সময় পর্যন্ত দেশকে কিছু দিতে না পারার বেদনায় তিনি খুবই ব্যথিত ছিলেন। দেশের জন্য কিছু করার সংকল্প ব্যক্ত করে তিনি জ্যোতির্বিদ্যায় মনোনিবেশ করেন এবং ১৮০৭ সালে গ্যোটিংগেন মানমন্দিরের পরিচালকের পদ গ্রহণ করেন। তিনি একজন সুন্দর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন উচ্চাকাঙ্ক্ষী স্বল্পভাষী

ব্যক্তি ছিলেন। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে তাঁর অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁকে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদদের একজন বলে গণ্য করা হয়। অঙ্কশাস্ত্রে সুগভীর পাণ্ডিত্যের জন্য তাঁকে আর্কিমিডিস ও নিউটনের সমতুল্য মনে করা হয়। অঙ্কশাস্ত্রে অসাধারণ ব্যুৎপত্তির কারণে তাঁকে গ্যোটিংগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্কশাস্ত্রের অধ্যাপক হিসেবে নিয়োগ করা হয়।

তিনি কোনো প্রকার বৈজ্ঞানিক সম্মেলনে যোগ দেওয়া পছন্দ করতেন না। তিনি সারা জীবনে মাত্র একবার একটি মাত্র বৈজ্ঞানিক সম্মেলনে যোগদান করেছিলেন। সেটি ছিল ১৮২৮ সালে বার্লিনে অনুষ্ঠিত এক সম্মেলন। সেই সম্মেলনে যোগ দেওয়ার ফলে তাঁর জীবনে এক আমূল পরিবর্তনের সূচনা হয়। সেখানে তিনি বিজ্ঞানী উইলহেলম এডুয়ার্ড ওয়েবারের সাথে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন। গাউস আগে থেকে ভূ-চুম্বকত্ব (জিও-ম্যাগনেটিজম) সম্বন্ধে খুবই আগ্রহী ছিলেন এবং সেই সম্মেলনে তিনি ওয়েবারকে সুযোগ্য সহকারী হিসেবে পাওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন। সে সময় গাউসের বয়স ছিল ৫১ বছর, আর ওয়েবার মাত্র ২৪ বছরের যুবক। বয়সের এত ব্যবধান সত্ত্বেও তাঁরা উভয়ে মিলে বৈজ্ঞানিক যুগল প্রতিভার এক অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। আজ সুদীর্ঘ দেড়শত বছর পরেও তাঁদের মিলিত প্রচেষ্টার সুফলগুলো যুগান্তকারী আবিষ্কার হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে। গাউস ছিলেন পিতার বয়সী এবং সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অঙ্কশাস্ত্রবিদ। অপরদিকে ওয়েবার ছিলেন একজন তরুণ ও অত্যন্ত মেধাবী এক্সপেরিমেন্টাল ফিজিসিস্ট বা পরীক্ষণ পদার্থবিদ। তাঁরা উভয়ে মিলে চুম্বক তত্ত্বে পরম এককের (absolute unit) প্রবর্তন করেন। তাঁরাই সর্বপ্রথম পৃথিবীর চুম্বকত্ব পরিমাপের চেষ্টা করেন। এবং ইলেকট্রোম্যগনেটিক টেলিগ্রাফের উদ্ভাবনও তাঁরাই করেছিলেন। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, তাঁদের এই ব্যতিক্রমধর্মী জুটির প্রয়াস মাত্র ছয় বৎসর স্থায়ী হয়। দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে হঠাৎ করে তাঁদের যৌথ প্রচেষ্টা বন্ধ হয়ে যায়।

গ্যোটিংগেন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা শুরু করার দশ বছর পরে তিনি ভূপৃষ্ঠের জরিপ ও মানচিত্র অঙ্কনবিদ্যা তথা 'জিওডেসি' তে (Geodesy) উৎসাহী হয়ে উঠেন এবং ১৮২০ সালে জার্মানির হানোকার রাজ্যের ত্রিকোণমিতিক জরিপের দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। সুদীর্ঘ ২৭ বছর পরে তিনি ঐ দুঃসাধ্য জরিপ কাজ সম্পন্ন করেন। প্রথম দিকে কয়েক বছর জরিপের সমস্ত কাজ নিজেই করতেন। এ সময় তাঁকে অনেক বাধা-বিপত্তির মধ্যে কাজ করতে হতো। যথাযথ যানবাহনের অভাব ও আনুষঙ্গিক প্রয়োজনীয়

যন্ত্রপাতির নিদারুণ অভাবে তাঁর কাজকর্মে খুবই অসুবিধা হতো। কাজটি শুরু করার প্রথম দিকে জরিপের সুবিধার্থে তিনি "হোলিওট্রপ" নামে একটি নতুন জরিপ যন্ত্রের উদ্‌ভাবন করেন। এটা ছিল কয়েকটি আয়নার সমন্বয়ে গঠিত একটি টেলিস্কোপ, যার সাহায্যে সূর্যরশ্মি প্রতিফলিত করা যেতো। এর সাহায্যে ১৫ মাইল দূরত্বে অবস্থিত যে কোনো বস্তুর প্রতিটির প্রতিবিম্ব টেলিস্কোপের মধ্যে একটি উজ্জ্বল তারকার মতো দেখা যেতো। তিনি গর্ব করে বলতেন যে, ঐ যন্ত্রের সাহায্যে চাঁদ পর্যন্ত দেখা সম্ভব।

তিনি দুবার বিবাহ করেছিলেন। প্রথমা স্ত্রীর গর্ভে ৩টি সন্তানের জন্ম হয়। ১৮০৯ সালে তৃতীয় সন্তান প্রসবকালে প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যু হয়। প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুতে তিনি খুবই ব্যথিত হয়েছিলেন এবং এক বছর পরে তাঁর স্ত্রীর সবচাইতে অন্তরঙ্গ বান্ধবীকে দ্বিতীয় স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেন। এর পরেই তাঁর সংসারে অশান্তি দেখা দেয়। দুই স্ত্রীর সন্তানদের মধ্যে সারাক্ষণ ঝগড়া ও মারামারি লেগেই থাকতো। যক্ষ্মায় আক্রান্ত হয়ে ১৮৩১ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী মৃত্যুবরণ করেন। গাউস সারা জীবন তাঁর রোগের চিকিৎসা নিজেই করেছেন। শেষ জীবনে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি একজন চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়েছিলেন। ১৮৫৪ সালের হেমন্তে তিনি খুব বেশি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং কিছুদিন শয্যাশায়ী থাকার পর ১৮৫৫ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি ৭৭ বছর বয়সে নিদ্রিত অবস্থায় প্রাণত্যাগ করেন। বিশ্ববিখ্যাত এই বিজ্ঞানী সম্বন্ধে ভালো করে জানতে হলে তাঁর সহকর্মী বিজ্ঞানী উইলহেলম এডুয়ার্ড ওয়েবারের জীবনী অবশ্যই জানতে হবে, কারণ গাউসের সাধনার চরম ও পরম বিকাশ ঘটেছিল উভয়ের যৌথ প্রয়াসের মাধ্যমে।

উইলহেল্‌ম্‌ এডুয়ার্ড ওয়েবার

(১৮০৪–১৮৯১)

চুম্বকতত্ত্বের অবিস্মরণীয় প্রতিভা

১৮০৪ সালের ২৪ অক্টোবর জার্মানির ভিটেনবার্গে বিজ্ঞানী উইলহেলেম এডুয়ার্ড ওয়েবারের জন্ম হয়। তাঁর পিতা ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্মতত্ত্বের অধ্যাপক। তাঁরা ছিলেন বার ভাইবোন। এর মধ্যে তাঁর মাত্র তিন ভাই ও এক বোন জীবিত ছিলেন, অন্যরা শৈশবেই মারা যায়। তাঁর তিন ভাইয়ের মধ্যে এক ভাই জার্মান সরকারের মন্ত্রী পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন ও অন্য দুই ভাই লাইপসিগ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হয়েছিলেন। ১৮৩৭ সালে তিনিও একই বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক পদে যোগদান করেন। তিন ভাই একই সাথে একই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, এটা যে কোনো পরিবারের জন্য একটি অত্যন্ত গৌরবের বিষয়। ১৮২২ সালে হালে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে ১৮২৬ সালে ওয়েবার ডক্টরেট ডিগ্রি প্রাপ্ত হন।

প্রথম জীবনে ওয়েবারের বেশিরভাগ গবেষণাই পানি ও বাতাসে সৃষ্ট কম্পনমাত্রা নির্ণয়ের উপর সীমাবদ্ধ ছিল। ১৮২৮ সালে তিনি বার্লিনে অনুষ্ঠিত এক বৈজ্ঞানিক সম্মেলনে অরগান পাইপের কারণে সৃষ্ট কম্পনমাত্রার উপর একটি বক্তৃতা দেন। সেখানে বিখ্যাত বিজ্ঞানী গাউস উপস্থিত ছিলেন। ১৮৩২ সালে বিজ্ঞানী গাউসের সাহায্য ও সহযোগিতায় তিনি গ্যোটিংগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের পদে নিযুক্তি লাভ করেন। অধ্যাপক গাউস ও অধ্যাপক ওয়েবার ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে এক অনন্য জুটি হিসেবে পরিগণিত হন। ১৮৩১ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ১৮৩৭ সালের নভেম্বর পর্যন্ত সুদীর্ঘ ছটি বছর তাঁরা তাঁদের যুগল কর্মপ্রতিভার এক অনবদ্য স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন।

তাঁরা একত্রে কাজ করে অ্যাবসোলিউট ম্যাগনেটিক ইউনিট বা পরম চৌম্বক এককের উদ্‌ভাবন করেছেন [ভর, দৈর্ঘ্য ও সময়ের উপর ভিত্তি করে এটা করেছেন ; কোনো যন্ত্রপাতি কিংবা নির্দিষ্ট প্রমিত মানসম্পন্ন কোনো কিছু ব্যবহার করেন নি।] পৃথিবীর চুম্বকক্ষেত্রের উপর কাজ করেছেন এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে এই তত্ত্বের উপর কাজ করার প্রস্তাব করেছেন। তাঁদের এই যৌথ উদ্যম ও প্রচেষ্টা রাজনৈতিক

কারণে বেশি দিন স্থায়ী হতে পারে নি। ১৮৩৭ সালে হানোফারে এক নতুন রাজা ক্ষমতায় এসে পূর্বেকার সমস্ত গণতান্ত্রিক অধিকারসহ শাসনতন্ত্র বাতিল করে দিলে অধিকার-সচেতন অনেকেই এর প্রতিবাদ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সাতজন অধ্যাপকের সাথে অন্যতম প্রতিবাদকারী ওয়েবারও এক ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করেন। ফলস্বরূপ অন্য অধ্যাপকদের সাথে ওয়েবারও চাকুরি থেকে বরখাস্ত হন। তাঁকে পুনর্বহাল করার সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। গণতন্ত্রমনা ওয়েবার এতে হতোদ্যম না হয়ে চুম্বকতত্ত্বের উপর আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রস্তুত করার জন্য লন্ডন ও প্যারিস সফর করেন। ১৮৪৩ সালে লাইপসিগ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্য দুই ভাইয়ের সাথে তিনি অধ্যাপনায় যোগ দেন। ১৮৪৮ সালে হানোফারের রাজনৈতিক পরিবর্তন সাধিত হলে সসম্মানে তাঁকে গ্যোটিংগেন বিশ্ববিদ্যালয়ে পুনর্বহাল করা হয়, কিন্তু এর মধ্যে অনেক সময় গড়িয়ে গিয়েছিল ; গাউস তখন ৭১ বছরের বৃদ্ধ। তাঁদের যৌথ কর্ম-উদ্যোগ আর কখনোই নতুন করে শুরু হতে পারে নি। ১৮৪৫ সালের দিকে তিনি বিদ্যুৎপ্রবাহের অ্যাবসোলিউট ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ইউনিট সম্বন্ধে তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করেন এবং একক পরিমাণ বিদ্যুৎপ্রবাহের ফলে বিযুক্ত হওয়া পানির পরিমাণ নির্ধারণে সক্ষম হন। কিছুদিন পর্যন্ত বিদ্যুতের একক হিসেবে তাঁর নাম ব্যবহৃত হতে থাকে, ১৮৮১ সালে প্যারিসে অনুষ্ঠিত এক আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক সম্মেলনে তাঁর নামের বদলে বিজ্ঞানী আম্পিয়ারের নাম গৃহীত হয়। অবশ্য ১৮৩৫ সাল থেকেই ম্যাগনেটিক ফ্লাক্সের একক হিসেবে তাঁর নামটিই ব্যবহৃত হয়ে আসছে। ১৮৫২ সালে তিনি বৈদ্যুতিক রোধের অ্যাবসোলিউট ইউনিটের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ দান করেন। তিন বছর পরে তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু রুডলফ কলোরাশ-এর সাথে যৌথভাবে ইলকট্রোস্টাটিক ও ইলেকট্রোডাইনামিক চার্জের মধ্যকার অনুপাতের মান নির্ধারণ করতে সক্ষম হন। এটা ছিল ইলেকট্রিক ফোর্সের উপর ওয়েবার-তত্ত্বের সুদীর্ঘ ১০ বছরের গবেষণার অংশবিশেষ। দুই বছর পরে তাঁদের এই তাত্ত্বিক বিশ্লেষণযুক্ত গবেষণা প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। বিখ্যাত বিজ্ঞানী ম্যাকসওয়েল তত্ত্বটি ব্যবহার করেছিলেন। যখন ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ও ইলেকট্রোস্টাটিক এককদ্বয়কে অনুপাত হিসেবে পরিবর্তিত করা হয় তখন যে নতুন সংখ্যা পাওয়া যায় তার মান হলো প্রতি সেকেণ্ডে ৩.১০৭x১০ মিটার অর্থাৎ আলোর গতিবেগের সমান।

১৮৩০ সালের দিকে বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফির উপর নানা প্রকার মতবাদের উদ্ভব হতে থাকে, কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে সফল প্রয়োগ তখনো সম্ভব হয়ে উঠে নি। ১৮৩৩ সালের দিকে ওয়েবার বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফ লাইনের প্রচলন করেন এবং ১৮৩৮ সাল পর্যন্ত ঐ

লাইনটি কার্যক্ষম ছিল। এই লাইনটি প্রধানত বৈজ্ঞানিক ক্রিয়াকাণ্ডের জন্য ব্যবহৃত হতো। বিজ্ঞানী গাউস এটার সামরিক ও বাণিজ্যিক গুরুত্ব অনুধাবন করে এর উন্নতির জন্য চিন্তা-ভাবনা করেন, কিন্তু নিজেদের হাতে পর্যাপ্ত সময় না থাকার কারণে মিউনিখ থেকে স্টাইনহাইল নামক একজন প্রতিভাবান তরুণকে ডেকে এনে ঐ দায়িত্ব দিয়েছিলেন। পরবর্তীতে গাউস এবং ওয়েবারের টেলিগ্রাফ-পদ্ধতি টেলিগ্রাফ যোগাযোগ ব্যবস্থায় তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম না হলেও কার্যত ওটাই ছিল সার্বক্ষণিকভাবে ব্যবহৃত বিশ্বের প্রথম টেলিগ্রাফ পদ্ধতি।

১৮৩৩ সালের দিকে ওয়েবার বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যা বিভাগ থেকে অ্যাস্ট্রনোমিক্যাল ল্যাবরেটরি পর্যন্ত খুঁটি বসিয়ে দুটো তামার তার টেনে টেলিগ্রাফ-লাইন বসিয়েছিলেন। এই লাইনটি বহুবার ছিঁড়ে গিয়েছিল। পরের বছরে এই লাইনটি জিওম্যাগনেটিক অবজারভেটরি পর্যন্ত দুই মাইল দূরত্বে সম্প্রসারিত করা হয়। এরপর এই টেলিগ্রাফ পদ্ধতিটির কার্যকারিতার অনেক উন্নতি সাধন করা হয়েছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ১৮৩৫ সালে এক বজ্রপাতে এটা সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয়ে যায়। এর পুনর্নির্মাণ আর সম্ভব হয় নি। প্রথম দিকে টেলিগ্রাফ লাইনটি একটি ব্যাটারির দ্বারা পরিচালিত হতো। পরবর্তী বছরে এটি একটি "ইনডাক্টর" দ্বারা চালানো হয়। এই ইনডাক্টরটি ছিল একটি ব্যতিক্রমধর্মী অনন্যসাধারণ ইলেকট্রোম্যাগনেটিক জেনারেটর। বিজ্ঞানী গাউস এর ডিজাইন করেছিলেন।

একটা নিতান্ত সাধারণ দুটো বার ম্যাগনেটের দণ্ড চুম্বক সমন্বয়ে গঠিত একটি ববিনের উপর তামার তারের ৩৫০টি প্যাঁচ জড়ানো ছিল। পরে ঐ প্যাঁচের সংখ্যা দ্বিগুণ করা হয়। সংকেত প্রেরণের সময় ঐ ববিনটাকে একটি হাতলের সাহায্যে দণ্ড-চুম্বকের উপরে ও নিচে উঠানামা করানো হতো। ববিনটির উঠা-নামার ফলে তামার তারের কুণ্ডলীর মধ্যে ক্ষণস্থায়ী স্পন্দনযুক্ত বিদ্যুৎপ্রবাহের সৃষ্টি হতো, যার প্রবাহের দিক নির্ভর করতো দণ্ডটি উপরে উঠার বা নিচে নামার ওপর। কুণ্ডলীটি সংকেত প্রেরণ লাইনের সাথে একটি কম্যুটেটরের মাধ্যমে সংযুক্ত ছিল, যার সাহায্যে বিদ্যুৎপ্রবাহের দিক পরিবর্তন করা সম্ভব হতো। ববিনটিকে উঠা-নামা করেও কম্যুটেটরের অবস্থান পরিবর্তন করে পজিটিভ অথবা নেগেটিভ স্পন্দন সৃষ্টি ও তা ইচ্ছামতো নিয়ন্ত্রণ করা হতো। গ্রাহক যন্ত্রটিও ছিল একটি অনন্যসাধারণ ডিজাইন প্রতিভার প্রকাশ। একটি বড় তামার ফ্রেমের উপর ৩০০০ ফুট লম্বা তারের কুণ্ডলী পেঁচানো ছিল। এই কুণ্ডলীর ভিতর ১৮ ইঞ্চি লম্বা একটি ভারি স্থায়ী চুম্বকদণ্ড রেশমের সুতার সাহায্যে ঝুলানো ছিল, ফলে এটি অতি সহজেই ঘুরতে পারতো। ক্ষণস্থায়ী অতি নিম্নশক্তিসম্পন্ন বিদ্যুৎপ্রবাহ ঐ

চুম্বকদণ্ডটিকে সামান্যই নাড়া দিতে পারতো। ঝুলন্ত সুতার সাথে একটি ছোট আয়না সংযুক্ত ছিল। ঐ আয়না থেকে সামান্য দূরে ও কিছুটা উপরে স্কেলযুক্ত একটি টেলিস্কোপ বসানো ছিল। এই স্কেলের প্রতিবিম্বটি আয়নায় প্রতিফলিত হয়ে দণ্ড-চুম্বকটির নড়াচড়া নির্দেশ করতো এবং সেটা টেলিস্কোপের সাহায্যে দেখা যেতো। গ্রাহকযন্ত্রের সাথে একটি ঘন্টাধ্বনির ব্যবস্থা করা হয়েছিল যাতে ঐ ঘন্টাধ্বনি থেকে অপারেটর অতি সহজেই সংকেত-আগমন বুঝতে পারে। বিদ্যুৎ-চুম্বকদণ্ডটি বৃহৎ পরিসরে নড়াচড়া করলে ঘন্টাধ্বনি আপনা-আপনি বন্ধ হয়ে যেতো।

তাঁদের উদ্ভাবিত টেলিগ্রাফপদ্ধতিটি যদিও অনেক দিন ব্যবহৃত হয়েছিল তবু এটা কখনোই বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চলে নি। তরুণ বিজ্ঞানী স্টাইনহাইল তাঁর নিজস্ব প্রযুক্তিগত দক্ষতা দিয়ে একটি ঘূর্ণায়মান কাগজের ফিতার মধ্যে ধারণকৃত সংবাদ ডর্ট প্রিন্টিং-এর সাহায্যে মুদ্রণের পন্থা উদ্ভাবন করেছিলেন।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে অবিস্মরণীয় অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বিজ্ঞানী গাউস ও বিজ্ঞানী ওয়েবারকে অনেক সম্মান ও পদকে ভূষিত করা হয়েছিল। ওয়েবার অকৃতদার ছিলেন। ১৮৯১ সালের ২৪ অক্টোবর গ্যোটিংগেনের বাগানবাড়িতে ৮৬ বছর বয়সে তিনি পরলোকগমন করেন। গাউস ও ওয়েবারের বন্ধুত্ব ছিল দুটি বিপরীত মেরুর সম্মিলন। গাউস ছিলেন স্বল্পভাষী, কঠোর প্রকৃতির ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী, কিন্তু ওয়েবার ছিলেন বিনয়ী, বন্ধুবৎসল ও মৃদুভাষী। তাঁদের যৌথ প্রচেষ্টার ফল সুদীর্ঘ ১৫০ বছর পরেও বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির জগতে অবিস্মরণীয় হয়ে আছে এবং আগামী দিনগুলোতেও থাকবে।

হান্‌স্ ক্রিশ্চিয়ান ওর্‌স্টেড

(১৭৭৭–১৮৫১)

ইলেকট্রোম্যাগনেটিজমের আবিষ্কারক

বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, অনেক বিশ্ববিখ্যাত আবিষ্কার সাধারণত লোকচক্ষুর অন্তরালে ল্যাবরেটরি বা বিশেষ কোনো স্থানে সবার অগোচরেই ঘটেছিল। জনসমক্ষে কোনো বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার বা দর্শকবৃন্দের উপস্থিতিতে কোনো বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হওয়া সত্যিই খুব বিরল ঘটনা। বিশ্বনন্দিত ডেনিশ বৈজ্ঞানিক হান্‌স্ ক্রিশ্চিয়ান ওরস্‌টেডের জীবনে এমনি এক বিরল ঘটনা ঘটেছিল। ১৯২০ সালে তিনি ইলেকট্রোম্যাগনেটিজম সূত্র আবিষ্কার করে ইলেকট্রিসিটি ও ম্যাগনেটিজম এই দুইটি পৃথক বিজ্ঞানের শাখাকে একই সূত্রে গেঁথে নতুন এক বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের জন্ম দিয়েছিলেন। এই সূত্রটিই হলো বিশ্ববিখ্যাত ইলেকট্রোম্যাগনেটিজম বা বিদ্যুৎ–চৌম্বক তত্ত্ব।

ডেনিশ পিতামাতার সর্বজ্যেষ্ঠ সন্তান ওরস্‌টেড ছোটবেলা থেকে প্রতিবেশীদের হাতে লালিত পালিত হয়েছিলেন, কারণ তাঁর পিতা ছিলেন সে দেশের একজন বিখ্যাত ভেষজবিদ এবং তাঁর পিতামাতা উভয়েই তাঁদের দোকানের ব্যবসা নিয়ে এত বেশি ব্যস্ত থাকতেন যে, দুই সন্তানের প্রতি যথাযথ যত্ন নেওয়া সম্ভব হতো না। তাঁদের প্রতিবেশী একজন জার্মান পরচুলা–নির্মাতা ও তাঁর ডেনিশ স্ত্রী ওরস্‌টেড ও তাঁর ছোটভাইকে দেখাশুনা করতেন। তাঁদের নিকট দুই ভাই জার্মান ভাষা, অঙ্কশাস্ত্র ও ধর্মীয় শাস্ত্র শিক্ষা পেয়েছিলেন। ওরস্‌টেড পড়াশুনায় খুবই মনোযোগী ছিলেন। একটু বড় হয়ে পিতার দোকানে ফার্মাসিস্ট হিসেবে কিছুদিন শিক্ষানবিশী করে তিনি কোপেনহাগেন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন এবং ফার্মাসিতে ডিগ্রি লাভ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালেই ওরস্‌টেড জার্মানির বিখ্যাত দার্শনিক ইমানুয়েল কান্টের (১৭২৪–১৮০৪) জীবনদর্শনের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তৎকালীন প্রকাশিত একটি বিশেষ জার্নালের সম্পাদকীয় বোর্ডের সদস্য হিসাবেও তিনি দায়িত্ব পালন করেন। ঐ বিশেষ জার্নালটির উদ্দেশ্য ছিল দার্শনিক কান্টের মতাদর্শের প্রচার। তিনি তাঁর ডক্টরেট থিসিসও একই মতবাদের উপর লিখেছিলেন। তাঁর গবেষণা–পত্রের

বিষয় বস্তু ছিল বিজ্ঞানের জগতে কান্টের জীবনদর্শনের প্রভাব। কান্টের দর্শন থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি অনুভব করেছিলেন যে, এক জাতীয় শক্তিকে অন্য জাতীয় শক্তিতে রূপান্তরিত করা সম্ভব, অর্থাৎ শক্তির রূপান্তর ঘটে থাকে, এবং এইভাবেই তিনি বিদ্যুৎশক্তিকে চুম্বকশক্তিতে রূপান্তরিত করার সম্ভাবনার বিষয়টি আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি কিছুদিন কোপেনহাগেন শহরের একটি বিখ্যাত ঔষধের দোকানে ম্যানেজার হিসেবে কর্মরত ছিলেন ও একই সাথে কোপেনহাগেন বিশ্ববিদ্যালয়ে অবৈতনিক প্রভাষক হিসেবে কাজ করতেন। ঐ সময় একটি তিন বৎসর মেয়াদী গবেষণা বৃত্তি পেয়ে তিনি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভ্রমণের সুযোগ লাভ করেন এবং একজন দার্শনিক হিসেবে প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। কিন্তু একজন বিজ্ঞানী হিসেবে তখনো তাঁর অনেক কিছু জানা বাকি ছিল, তাই নিজকে একজন বিজ্ঞানী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তিনি তাঁর জ্ঞানের পরিধি বিস্তারে সবিশেষ যত্নবান হয়ে ওঠেন। ঐ সময়, ১৮০০ সালে ইতালির বৈজ্ঞানিক আলেস্সান্দ্রো ভোল্টা প্রাইমারি ব্যাটারি আবিষ্কার করে বিশ্বব্যাপী এক আলোড়নের সৃষ্টি করেন। ১৮০১ সালে ওরস্টেডও একটি ব্যাটারি আবিষ্কার করেন এবং জার্মানি ও ফ্রান্সে ব্যাপকভাবে পরিভ্রমণ করেন। সে সময় তিনি প্যারিসে বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিকদের সংস্পর্শে আসার সুযোগ পেয়েছিলেন। তখন প্যারিস ছিল বিশ্বের জ্ঞানবিজ্ঞানের কেন্দ্র। দেশে ফিরে এসে তাঁকে খুবই হতাশ হতে হলো, কারণ কর্তৃপক্ষ তাঁকে প্রফেসর পদে নিযুক্তি দেন নি। যা হোক, তাঁর বাগ্মিতা খুব শীঘ্রই তার খ্যাতি এনে দিলো এবং শ্রোতারা তাঁর বক্তৃতা শোনার জন্য গভীর আগ্রহ সহকারে অপেক্ষা করতো। কিছুদিন এইভাবে চলার পর তাঁকে অসাধারণ অধ্যাপক হিসেবে একটি বিশেষ পদ দান করা হয়। তিনি ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন প্রকার পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করেন, যেগুলো সমসাময়িক বৈজ্ঞানিকদের খুবই প্রশংসা অর্জন করতে সমর্থ হয়। তাঁর জীবনদর্শনের ভিত্তি ছিল এই বিশ্বাস যে, প্রকৃতি এক ও একক। ১৮১০ সালে এক নিবন্ধে তিনি তাঁর এই বিশ্বাসকে ব্যক্ত করেছিলেন। একজন নিবেদিতপ্রাণ খ্রিষ্টান হিসেবে তিনি সর্বদা এই বিশ্বাস পোষণ করতেন যে, সমগ্র বিশ্বচরাচর ঈশ্বরের সৃষ্টি এবং তিনি এই জগৎকে যথাসম্ভব কম প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করে চলমান রেখেছেন। শক্তির অবিনশ্বরবাদে বিশ্বাসী হয়ে তিনি অনুভব করেছিলেন যে, প্রকৃতির বিভিন্নধর্মী আচার-আচরণ এবং শক্তির বিভিন্ন রূপ এই দুইয়ের মধ্যে এক সুন্দর যোগসূত্র রয়েছে, অর্থাৎ উভয়ই একই সূত্রে গাঁথা। তাই তিনি তাঁর মতবাদ প্রকাশ করেছিলেন এইভাবে যে, প্রকৃতির বিভিন্নধর্মী ব্যবহার অর্থাৎ শক্তির বিভিন্ন প্রকারভেদ একই উৎস থেকে সৃষ্ট।

ফলে বিদ্যুৎ, চুম্বক, আলো, তাপ, রসায়নশাস্ত্র ইত্যাদি বিভিন্নধর্মী হলেও মূলত দুই প্রকার শক্তির বিভিন্নরূপ এবং ঐ দুই শক্তির রূপও মূলত একই উৎস থেকে সৃষ্ট।

আঠার শতকের প্রথমদিকেই প্রতিষ্ঠিত হয় যে, বিদ্যুৎশক্তি ও রসায়নের মধ্যে একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে এবং ঐ বিজ্ঞানের নাম হয়েছিল ইলেকট্রোকেমিস্ট্রি। ওরস্‌টেডের মতে বিদ্যুৎপ্রবাহ হলো দুটি বিপরীতধর্মী শক্তির প্রকাশ (ধনাত্মক ও ঋণাত্মক)। তিনি আরো বিশ্বাস করতেন যে, এই শক্তি ঢেউয়ের আকারে বাতাসের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়। যদি খুব সূক্ষ্ম তার দিয়ে এটার প্রবাহকে রুদ্ধ করা যায় তবে ঐ সরু তারটি উত্তপ্ত হয়ে উঠে এটাই প্রমাণ করবে যে, ঐ তাপ ঐ দুই বিপরীতধর্মী শক্তিরই অন্য একটি রূপ। সরু তারটিকে খুব বেশি উত্তপ্ত করলে সেটা থেকে আলো বিচ্ছুরিত হয়ে এটাই প্রমাণ করবে যে, আলো ও বিদ্যুৎ একই শক্তির দুই রূপ। ১৮১২–১৮১৩ সালে নিজের রচিত একটি বিখ্যাত গ্রন্থে তিনি এই মতবাদ ব্যক্ত করেন। ইলেকট্রোম্যাগনেটিজম তত্ত্বের আবিষ্কারের আট বছর পূর্বে এবং মাইকেল ফ্যারাডে ও ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েলের বহু পূর্বে তিনি বিদ্যুৎশক্তি ও চুম্বকশক্তির পারস্পরিক সম্পর্কের কথা প্রকাশ করেছিলেন।

বহু পূর্ব থেকেই বিজ্ঞানীদের জানা ছিল যে, বিদ্যুৎ ও চুম্বকের মধ্যে একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। যেমন, উভয়েই আকর্ষণ–বিকর্ষণ শক্তিসম্পন্ন, উভয়েরই দুই রূপঃধনাত্মক–ঋণাত্মক এবং উভয়েই দুই মেরুবিশিষ্ট। এটাও প্রমাণিত হয়েছিল যে, একটি লৌহ–শলাকার ভিতর বিদ্যুৎ প্রবাহিত হলে শলাকাটি চুম্বকত্ব প্রাপ্ত হয়। এবং আকাশে বিদ্যুৎচমক যে আসলে বিদ্যুৎপ্রবাহ এটা যুক্তরাষ্ট্রের বৈজ্ঞানিক বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন প্রমাণ করেছিলেন। ১৭৭৪ সালে জার্মানির ব্যাভারিয়ান একাডেমী বিদ্যুৎ ও চুম্বকের পারস্পরিক সম্পর্ক প্রমাণ করার জন্য একটি পুরস্কার ঘোষণা করে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত কেউই এটা প্রমাণ করতে পারে নি। ১৭৮০ সালের দিকে বিখ্যাত ফরাসী বৈজ্ঞানিক চার্লস কুলম্ব সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করেছিলেন যে, বিদ্যুৎ ও চুম্বক সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী বিজ্ঞানের দুটি শাখা, যদিও এদের মধ্যে কিছু কিছু সামঞ্জস্য রয়েছে। বহুদিন যাবৎ এই ধারণাই বৈজ্ঞানিক সমাজে স্বীকৃত ছিল। ওরস্‌টেড কিন্তু সব সময় ভিন্নমত পোষণ করতেন। দার্শনিক কান্টের মতবাদে প্রভাবিত এবং স্রষ্টায় গভীরভাবে বিশ্বাসী হয়ে তিনি সব সময় বিশ্বাস করতেন যে, বিদ্যুৎ ও চুম্বকের মাঝে একটি গভীর সম্পর্ক রয়েছে এবং এটা শুধু প্রমাণের অপেক্ষামাত্র যে, একটিকে আরেকটিতে রূপান্তরিত করা সম্ভব। ১৮১৯–১৮২০ সালের মাঝামাঝি সময়ে তিনি কিছুসংখ্যক বয়োজ্যেষ্ঠ ছাত্রদের মাঝে ধারাবাহিক বক্তৃতা দিয়েছিলেন। ছাত্রদেরকে তিনি নানারূপ পরীক্ষা–

নিরীক্ষা করে দেখাতেন, তার মধ্যে একটি বিশেষ পরীক্ষা ছিল একটি চুম্বক-শলাকার উপর একটি বন্ধ বিদ্যুৎ-বর্তনীর কি প্রভাব হতে পারে সেটা নির্ণয় করা। এর আগে অনেকেই মুক্ত বিদ্যুৎ-বর্তনীর প্রভাব নিয়ে অনেক চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তাতে কোনো ফল পাওয়া যায় নি। যা হোক, বক্তৃতা দেওয়ার আগে হাতে যথেষ্ট সময়ের অভাবে তিনি পরীক্ষাটি নিজে করার সুযোগ না পাওয়ায় সেটি বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন ; কিন্তু বক্তৃতা দেওয়ার সময় তিনি তাঁর মত পরিবর্তন করে পরীক্ষাটি ছাত্রদের দেখানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তাঁর পরীক্ষাধীন বিদ্যুৎ-পরিবাহী তারটি খুব বেশি সরু হওয়ায় এর মধ্য দিয়ে অল্প পরিমাণ বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়ে তারের চারদিকে চুম্বকক্ষেত্রের সৃষ্টি করেছিল এবং লৌহ-শলাকাটি সামান্য নড়ে উঠেছিল। তবে শলাকাটির নড়াচড়া এতই মন্থর ছিল যে, স্বয়ং ওর্‌স্টেডও এ সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে পারেন নি, ফলে কোনো নাটকীয় ঘটনার সৃষ্টি হয় নি। যা হোক পরীক্ষাটি পুনরায় করা হয় তিন মাস পরে ১৮২০ সালের জুলাই মাসে। এবার অধিক শক্তিশালী ব্যাটারি ও অপেক্ষাকৃত মোটা তারের সাহায্যে পরীক্ষাটি করা হয়। ফলে অধিক শক্তিশালী চুম্বকক্ষেত্রের সৃষ্টি হয় এবং লৌহ শলাকাটি নড়ে উঠে এবং তা খুব ভালোভাবে দৃষ্টিগোচর হয়। পরবর্তী সময়ে ওর্‌স্টেড দুঃখ করে বলেছিলেন যে, যে পরীক্ষাটি তাঁকে বিশ্ব বৈজ্ঞানিক সমাজে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে সেটি পুনরায় করতে তিনি অযথাই তিনটি মাস বিলম্ব করেছিলেন।

যা হোক পরীক্ষাটি সম্পাদন করে তিনি প্রমাণ করেছিলেন যে, বিদ্যুৎপ্রবাহ চুম্বকক্ষেত্রের সৃষ্টি করে থাকে। এইভাবে ওর্‌স্টেড বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এক বিপুল সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছিলেন। পরে তিনি আরেকটি পরীক্ষা সম্পন্ন করেছিলেন। একটি তারের মধ্য দিয়ে সরাসরি বিদ্যুৎ প্রবাহিত করে তারের নিচে একটি চুম্বক-শলাকা রেখে সেটিকে তারের চারপাশে ঘুরিয়ে প্রমাণ করেছিলেন যে, তারের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত বিদ্যুৎ তারের চারপাশে বৃত্তাকার চুম্বকক্ষেত্রের সৃষ্টি করে এবং তারটি কী জাতীয় ধাতব পদার্থের তৈরি হবে সেটা তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়, তবে ধাতব পদার্থের গুণাবলির উপর চুম্বকক্ষেত্রের পরিসীমা নির্ভর করে। তাঁর এই পরীক্ষাটির তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ১৮২৬ সালে ওহ্‌মের সূত্র দ্বারা প্রমাণিত হয়েছিল এবং বলতে গেলে এই পরীক্ষাটি ছিল বিদ্যুৎ-পরিমাপ যন্ত্রের প্রথম প্রদর্শনী। চুম্বকক্ষেত্রের বিভিন্ন গুণাবলি পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছিলো যে, এটা বিভিন্ন মাধ্যমের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়। যখন একটি অ-চুম্বক শলাকা তৈরি করে একই পরীক্ষা করা হয়েছিল তখন কোনো প্রকার সাড়া পাওয়া যায় নি অর্থাৎ অচুম্বক পদার্থের তৈরি শলাকাটির উপর প্রবাহিত বিদ্যুতের কোনো প্রকার প্রভাব ছিল না। ১৮২০ সালের ২১ জুলাই লাতিন ভাষায়

তিনি তার পর্যবেক্ষণের ফলাফলসহ একটি লেখা প্রকাশ করে সেটির অনুলিপি তৎকালীন ইউরোপের বিখ্যাত বিজ্ঞান–কেন্দ্রগুলোতে পাঠিয়ে দেন। চুম্বক–পদার্থের ওপর বিদ্যুতের প্রভাব সম্পর্কিত তাঁর এই আবিষ্কারের গুরুত্ব ত্বরিত গতিতে সর্বত্র স্বীকৃতি লাভ করে এবং তৎকালীন ইউরোপে এটা এক বিরাট উত্তেজনার সৃষ্টি করে। তাঁর আবিষ্কৃত এই নতুন প্রযুক্তির প্রভাব ও ফলাফল বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নবদিগন্তের সূচনা করে। ইলেকট্রোডায়নামিক বা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রোটেশনের প্রভাবে পরবর্তীকালে উদ্ভাবিত হয়েছিল ইলেকট্রোম্যাগনেটিজম, থার্মো–ইলেকট্রেসিটি। উনবিংশ শতাব্দীর ফিজিক্যাল সাইন্সের বিরাট অংশ জুড়ে এর প্রভাব পড়েছিল। প্রযুক্তির ক্ষেত্রে তাঁর আবিষ্কৃত তত্ত্ব নব নব প্রযুক্তির জন্ম দিয়েছিল : যেমন ইলেকট্রোম্যাগনেট, গ্যালভানোমিটার, টেলিগ্রাফ, ইলেকট্রিক মোটর, বিদ্যুৎ–জেনারেটর, রেডিও, টেলিফোন ইত্যাদি। তিনি পরবর্তী জীবনে গ্যাসের উপর চাপের প্রভাব সংক্রান্ত বিভিন্ন পরীক্ষা–নিরীক্ষা করেছিলেন এবং সেই সঙ্গে ডায়াম্যাগনেটিজমের উপরও অনেক কাজ করেছিলেন। কিন্তু মৃত্যুর পূর্বে তিনি তাঁর পুরাতন নেশা অর্থাৎ দর্শনশাস্ত্রের দিকে ঝুঁকে পড়েন।

ডেনমার্কের বিজ্ঞানী সমাজে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন। ১৮২০ সালে তিনি কোপেনহাগেন বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের জন্য সর্বপ্রথম একটি রসায়ন গবেষণাগার স্থাপন করেন। রসায়ন গবেষণাগার শব্দটি তৎকালে কারো জানা ছিল না, কারণ তখনকার যুগে ছাত্ররা কোনো পরীক্ষা–নিরীক্ষা নিজের হাতে করার সুযোগ পেতো না। তিনি অনেক জনহিতকর প্রতিষ্ঠানও গড়ে তুলেছিলেন। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের উপর গবেষণার জন্য স্থাপিত একটি সোসাইটি, একটি ম্যাগনেটিক মানমন্দির এবং ডেনমার্কের প্রথম ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়, যার প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক ছিলেন তিনি। সমাজে সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি বিজ্ঞান শিক্ষার প্রচলন করার জন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করে গেছেন, যার জন্য তিনি নিজেই জনসমক্ষে বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের উপর একজন দক্ষ অভিনেতার মতো বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতেন। সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনে তৎকালীন বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীদের সাথে তাঁর সাক্ষাতের এবং পরিচিতি লাভের সৌভাগ্য হয়েছিল। এদের মধ্যে আম্পিয়ার, বায়ট, এরাগো, ফ্রেনেল, ফুরিয়ার, গাউস, সিব্যাক, হেরসেল, ডেভি, ফ্যারাডে এবং হুইটস্টোন প্রমুখ বিশ্ববরেণ্য বৈজ্ঞানিকদের নাম উল্লেখযোগ্য। ওরস্‌টেডের অনুপ্রেরণা এবং সহযোগিতায় হুইটস্টোন তাঁর প্রথম গবেষণাপত্র রচনা করেছিলেন। এই মহান বিজ্ঞানী ১৮৫১ সালে পরলোকগমন করেন।

স্যামুয়েল ফিনলে ব্রিস মোর্স

(১৭৯১–১৮৭২)

আমেরিকার দ্য ভিঞ্চি

যদি কাউকে প্রশ্ন করা হয় যে, মোর্স কোডের আবিষ্কারক কে ছিলেন তবে অতি সহজেই তিনি উত্তর করবেন, বিজ্ঞানী মোর্স। এই সহজ প্রশ্নটি করার উদ্দেশ্য হচ্ছে উত্তরদাতার উপস্থিত বুদ্ধি যাচাই করা, কারণ মোর্স মূলত বৈজ্ঞানিক ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন চিত্রশিল্পী। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ডিজাইন একাডেমীর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন। তিনি যখন তাঁর দ্বিতীয় পেশা হিসেবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে গ্রহণ করেছিলেন তখন তাঁকে মূল পেশা চিত্রকলাকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও পরিত্যাগ করতে হয়েছিল এবং এই জন্য তিনি আজীবন দুঃখ ও অনুতাপ করে গেছেন।

১৭৯১ সালের ২১ এপ্রিল যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেট্‌স অঙ্গরাজ্যের চার্লসটন শহরে স্যামুয়েল ফিনলে ব্রিস মোর্স জন্মগ্রহণ করেন। তাঁকে যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানীদের মধ্যে অন্যতম প্রধান বলে মনে করা হয়। তিনি ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রে উপনিবেশ স্থাপনকারী ও বসতি স্থাপনকারী সাদা আমেরিকানদের ষষ্ঠ বংশধর। তাঁর এগারজন ভাইবোনের মধ্যে মাত্র তিনজন জীবিত ছিলেন। বাকিরা সব শৈশবেই মারা যায়। বিদ্যালয়ের ছাত্র থাকাকালীন অবস্থায় তিনি একজন চিত্রকর হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছিলেন। বিশেষ করে হাতির দাঁতের উপর সূক্ষ্ম ও নিপুণ কারুকার্যে তাঁর জুড়ি ছিল না। তাঁর পিতা কিন্তু চিত্রকর্মকে জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করাটা একেবারেই পছন্দ করতেন না। ফলে বাধ্য হয়ে তাঁকে একটি বইয়ের দোকানে কেরানির চাকুরি নিতে হয়েছিল। তাই বলে তাঁর সুপ্ত প্রতিভা স্তব্ধ হয়ে যায় নি। ১৮১১ সালের ১৩ জুলাই বিশ বৎসর বয়সে পিতার আশীর্বাদ নিয়েই তিনি চিত্রকলা অধ্যয়নের জন্য লন্ডনে গিয়ে সেখানে রয়েল একাডেমীতে ৪ বছর চিত্রশিল্পের উপর পড়াশুনা করেন। সেখানে তিনি অনেকগুলি বিখ্যাত চিত্র অঙ্কন করেছিলেন। সেগুলোর মধ্যে "মরণোম্মুখ হারকিউলিস" চিত্রটি রয়েল একাডেমীর স্থায়ী প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছে। তাঁর আরেকটি চিত্রকর্ম হচ্ছে হারকিউলিসের একটি অতি ক্ষুদ্র প্রতিকৃতি। সেটির জন্য তিনি রয়েল সোসাইটি অফ আর্টস–এর স্বর্ণপদক লাভ করেছিলেন। দেশে ফিরে এসে তিনি

পঞ্চদশ শতকের গৌরবময় ঐতিহাসিক জাঁকজমকপূর্ণ রাজকীয় চিত্রকর্মে আত্মনিয়োগ করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তার এই প্রয়াস নিদারুণভাবে বাধাগ্রস্ত হয়। কারণ যুক্তরাষ্ট্রবাসীরা তাঁর অঙ্কিত ঐতিহাসিক চিত্রকর্মের প্রতি কোনো উৎসাহই দেখায় নি। বাধ্য হয়ে জীবিকার তাগিদে তাঁকে মানুষের প্রতিকৃতি অঙ্কনে মনোনিবেশ করতে হয়েছিলো। যুক্তরাষ্ট্রবাসীরা নিজের প্রতিকৃতি অঙ্কন করানোর প্রতি বেশি আগ্রহী ছিল। এই পেশায় তিনি অসামান্য সাফল্য লাভ করেছিলেন। তাঁর ব্যক্তিত্ব ও দক্ষতার জন্য তিনি অচিরেই সমাজে একজন বিশেষ সম্মানিত ব্যক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। সে সময় ১৮২৫ সালে তাঁর অঙ্কিত দুটি প্রতিকৃতি খুবই প্রসিদ্ধি লাভ করে। একটি হচ্ছে লাফায়েতের, অপরটি হচ্ছে সিনেটের ছিয়াশিজন প্রতিনিধির প্রতিকৃতি সম্বলিত পুরাতন হাউজ অফ রিপ্রেজেনটেটিভ্‌স্ নামক ছবিটি। চিত্র অঙ্কন করার সময়ও তিনি নানা প্রকার পরীক্ষা–নিরীক্ষা করতেন। যেমন তার স্ত্রী ও ৮ ছেলেমেয়ের প্রতিকৃতি অঙ্কন কালে তিনি পানির পরিবর্তে দুধের মধ্যে রং গুলিয়ে নিয়েছিলেন এবং কখনো কখনো এ কাজে বিয়ারও ব্যবহার করতেন। ১৮২০ সালের মাঝামাঝি সময়ে তাঁর জীবনে এক বিরাট বিপর্যয় নেমে আসে ; মাত্র চার বছরের মধ্যে তাঁর স্ত্রী ও পিতা–মাতা পরলোকগমন করেন। দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে ১৮২৯ সালে তিনি পুনরায় ইউরোপ পাড়ি দেন এবং সেখানে তিন বছর অতিবাহিত করে ১৮৩২ সালে দেশে ফিরে যান। দেশে প্রত্যাবর্তনকালে জাহাজে একদিন নৈশভোজের টেবিলে একজন সহযাত্রী তাঁর সাথে বিদ্যুৎ–প্রযুক্তি সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হন এবং ঐ আলাপ–আলোচনায় তিনি বিদ্যুৎ প্রযুক্তির প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। সহযাত্রীর কথাবার্তা শোনার পর তিনি মন্তব্য করেছিলেন যে, সংবাদ বা বার্তা বিদ্যুৎপ্রবাহের মাধ্যমে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে অবশ্যই প্রেরণ করা সম্ভব। জাহাজ ভ্রমণ শেষ হওয়ার পূর্বেই তাঁর নোট বইয়ের পাতা বিভিন্ন প্রকার পরিকল্পনা ও ছকে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। আর পরবর্তী বছরগুলোতে তাঁর চিন্তার জগতে এক আমূল পরিবর্তনের সূচনা হয়।

তিনি একটি পদ্ধতির উদ্ভাবন করেছিলেন যেটার সাহায্যে শব্দকে কতকগুলি সংখ্যার সমষ্টি দ্বারা উপস্থাপন করা যেতো এবং এইভাবেই তিনি তাঁর কোডবুক লেখার প্রাথমিক কাজকর্ম শুরু করেছিলেন। প্রতিটি সংখ্যা আবার কতকগুলি বিন্দু ছেদ-চিকের (dott and dashes) সমষ্টি হিসেবে প্রেরণের চিন্তাভাবনা করা হয়েছিল। এটা কিন্তু বর্তমানে প্রচলিত বিখ্যাত মোর্সকোড ছিল না—এটা প্রেরণ করার জন্য দ্রুতগতিসম্পন্ন যন্ত্রের প্রয়োজন ছিল, যার প্রতিটি অক্ষরের মাথায় দাঁত বসানো ছিল। ঐ দাঁতের মধ্যে কতকগুলো ছিল বিন্দুচিহ্নযুক্ত আর কতকগুলো ছিল ছেদচিহ্নযুক্ত।

একটি দন্ডের উপর ঐগুলি সাজানো ছিল এবং যখন কোনো অক্ষরকে চাপ দেওয়া হতো সেটা তখন অগ্রভাগের দাঁতের সাহায্যে ব্যাটারিকে সার্কিটের সাহায্যে সংযুক্ত ও বিযুক্ত করতো। প্রথম থেকেই তিনি এমন একটি গ্রাহকযন্ত্রের চিন্তাভাবনা করছিলেন যেটার সাহায্যে ধারণকৃত সংবাদকে স্থায়ীভাবে সংগ্রহ করা যাবে। প্রাথমিক যুগের এ ধরনের যন্ত্রে একটি ইলেকট্রোম্যাগনেটের সাহায্যে একটি পেন্সিলকে নাড়াচাড়া করে বিন্দু ও ছেদচিহ্নগুলো একটি কাগজের ফিতার উপর অঙ্কিত করা হতো। ইতোমধ্যে ইউরোপেও চুম্বকশলাকাযুক্ত টেলিগ্রাফ পদ্ধতির উপর খুব জোর আলোচনা চলছিল। মোর্সের সমস্ত চিন্তাভাবনা একান্তভাবে তাঁর নিজস্ব ছিল। বহুদিন পর্যন্ত তিনি একথা ভাবতে বা শুনতে পছন্দ করতেন না যে, তাঁর পূর্বে বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফ নিয়ে কেউ চিন্তাভাবনা করেছে। জাহাজে ভ্রমণ শেষে নিউইয়র্কে ফিরে এসেই তিনি টেলিগ্রাফি নিয়ে খুব বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়েন, কিন্তু মাত্র কিছুদিন পরে তাঁকে সংসারের ও রুজিরোজগারের প্রয়োজনে ব্যস্ত হতে হয়, কারণ তাঁর অনেকগুলো ছেলেমেয়ে ছিল। কিছু পুরাতন চিত্রকর্ম অসমাপ্ত অবস্থায় ছিল এবং হাতে পয়সাকড়িও তেমন ছিল না। ১৮৩৫ সালের শেষের দিকে তিনি নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে চিত্র ও ভাস্কর্যের অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন। ছাত্রদের চিত্রকর্ম শিক্ষাদান, চিত্র অঙ্কন ইত্যাদিতে তাঁর বেশির ভাগ সময় কেটে যেতো, কিন্তু এত করেও তাঁর আর্থিক দীনতার অবসান হয় নি। তবু এই অর্থসঙ্কটের মাঝেও তিনি টেলিগ্রাফির উপর কাজকর্ম চালিয়ে যেতে থাকেন। একই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানের অধ্যাপক লিওনার্দো দ্য গেইলকে সহকর্মী হিসেবে পেয়ে তাঁর নিকট থেকে তিনি বিজ্ঞানী হেনরি কর্তৃক উদ্ভাবিত ইলেকট্রোম্যাগনেটিজম সম্পর্কে অনেক জ্ঞান লাভ করেছিলেন। ১৮৩১ সালে হেনরি এক মাইল দূরবর্তী একটি ঘন্টা বাজাতে সক্ষম হন। এটাই ছিল বিশ্বের প্রথম বৈদ্যুতিক ঘন্টা। অধ্যাপক গেইল মোর্সের সহযোগী হিসেবে টেলিগ্রাফ আবিষ্কারের ক্ষেত্রে অনেক অবদান রেখেছিলেন। তিনি মাত্র ১০টি তারের প্যাঁচের বদলে শত শত প্যাঁচ ব্যবহার করে অধিক শক্তিশালী বিদ্যুৎচুম্বকের সৃষ্টি করে গ্রাহকযন্ত্র বানিয়েছিলেন এবং প্রেরণযন্ত্রে একটিমাত্র কোষবিশিষ্ট ব্যাটারির পরিবর্তে একাধিক কোষবিশিষ্ট ব্যাটারি ব্যবহার করে আরো অধিক শক্তিশালী ভোল্টেজের সৃষ্টি করতে সক্ষম হন। গেইলের এই অসাধারণ অবদানের ফলে মোর্স তাঁর টেলিগ্রাফ–পদ্ধতি প্রেরণ ক্ষমতা মাত্র চল্লিশ গজ থেকে ১০ মাইল দূরত্বে বৃদ্ধি করতে সক্ষম হন। কখনো কখনো হেনরি স্বয়ং উপস্থিত থেকে তাঁদের কাজে উৎসাহ ও পরামর্শ দিতেন। সেই সময় যুক্তরাষ্ট্র সরকার তাঁদের দেশের জন্য টেলিগ্রাফ–পদ্ধতি প্রবর্তনের কথা চিন্তাভাবনা করছিলেন। অন্য প্রার্থীদের সাথে ১৮৩৭ সালে ২৭ সেপ্টেম্বর মোর্সও তাঁর

পরিকল্পনা দাখিল করেন এবং অক্টোবরে পেটেন্টের জন্য আবেদন করে ১৮৪০ সালের ২০ জুন এককভাবে পেটেন্ট লাভ করেন। তিনি ইংল্যান্ডেও পেটেন্টের জন্য আবেদন করেছিলেন। কিন্তু কুক ও হুইটস্টোনের আপত্তির কারণে তাঁর আবেদন নাকচ হয়ে যায়, কারণ ইতোমধ্যেই তাঁদের পদ্ধতি ইংরেজ সরকার পেটেন্ট করেছিলেন। সে সময় মোর্স ও গেইলের সাথে আরো এক ব্যক্তি যুক্ত হয়েছিলেন। তিনি হলেন তরুণ প্রকৌশলী আলফ্রেড ভেইল। তরুণ ভেইল ১৮৩৭ সালের সেপ্টেম্বরে নতুন অংশীদার হিসেবে যোগদান করে কোম্পানির আর্থিক স্বচ্ছলতা ও প্রযুক্তিগত দক্ষতার উৎকর্ষ সাধন করেন।

মোর্স কর্তৃক উদ্‌ভাবিত প্রথম যন্ত্রটি এতই বিশ্রী ও স্থূলাকৃতি ছিল যে, ওটার দিকে তাকাতে তিনি খুবই লজ্জাবোধ করতেন। মোর্স নিজে প্রথম যন্ত্রটি কিভাবে তৈরি করেছিলেন সে সম্বন্ধে বর্ণনা দিয়েছেন। পুরাতন একটি ছবির ক্যানভাসের ফ্রেমকে টেবিলের সাথে বেঁধে দেওয়া হয়। কাঠের তৈরি পুরাতন ঘড়ির চাকাগুলো খুলে নিয়ে তার উপর দিয়ে কাগজের ফিতাকে সম্মুখের দিকে এগিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। এর সাথে ছিল তিনটি কাঠের গোলাকৃতি পিপা। মোর্স ও ভেইল যুক্তভাবে তাঁদের উদ্ভাবিত যন্ত্রের উন্নয়নে সচেষ্ট হয়েছিলেন। প্রেরণযন্ত্রে টাইপের পরিবর্তে চাবি ও চাবি বোর্ড সংযুক্ত করা হয়েছিল। গ্রাহকযন্ত্রে পেন্সিল, কলম ও খোদাইযন্ত্রের (embossers) মধ্যে কোন্‌টি বেশি উপযোগী সেটি পরীক্ষা করা হয়। এবং পুরাতন কোডপদ্ধতি বাদ দিয়ে প্রতিটি শব্দের জন্য বিন্দু ও ছেদচিহ্নযুক্ত কোডের প্রবর্তন করা হয়। এইভাবে প্রথম মোর্স কোড একাধিকবার পরিবর্তিত হয়ে বর্তমানে ব্যবহৃত কোডের রূপ নিয়েছিল এবং এটা করেছিলেন তরুণ প্রকৌশলী আলফ্রেড ভেইল। যদিও মোর্স তাঁর চিন্তা–ভাবনার ক্ষেত্রে অন্যের চিন্তাভাবনা মোটেই গ্রহণ করতেন না, কিন্তু তরুণ বৈজ্ঞানিক ভেইলের সংস্কারসাধনকে তিনি বাধা দেন নি। ১৮৩৮ সালের মার্চ মাসে এফ.ও.জে. স্মিথ নামে একজন আইনবিদ তাঁদের সাথে যোগ দেন ; অর্থাৎ তিনি হলেন চতুর্থ অংশীদার। তাঁর দায়িত্ব ছিল রাজধানী ওয়াশিংটনের জটিল ও কঠিন ব্যুরোক্র্যাটদের নিকট থেকে অনুমোদন আদায় করা। তবে পরে প্রমাণিত হয়েছিল যে, তাঁকে অংশীদার হিসেবে গ্রহণ করা মোর্সের জীবনের এক মারাত্মক ভুল কাজ হয়েছিল। সমসাময়িক ব্যক্তিরা স্মিথকে একজন বিবেকহীন, নীতিজ্ঞানবর্জিত দুশ্চরিত্র ব্যক্তি বলে বর্ণনা করেছেন। টেলিগ্রাফ কোম্পানির বিস্তারকল্পে তিনি কংগ্রেসের সদস্য হিসেবে নিজের পদাধিকার ও ক্ষমতার অপব্যবহার করেছিলেন। পরে তিনি মোর্সকে অযথা হয়রানি করে ৪ লক্ষ মার্ক (জার্মান মুদ্রা) আদায় করে নিয়েছিলেন। ইউরোপের বিভিন্ন দেশ মোর্সকে এই অর্থ সম্মানী হিসেবে দিয়েছিল। তাঁর এই সমস্ত কার্যকলাপে মোর্স খুবই হতাশ হয়েছিলেন। ১৮৩৮ সালে উন্নততর সংস্করণসহ মোর্সের উদ্ভাবিত

যন্ত্রটি জনসাধারণের সম্মুখে প্রদর্শনের জন্য উপস্থিত করা হয়। এতে বিন্দু ও ছেদচিহ্নযুক্ত সংগৃহীত সংবাদ কাগজের উপর এমবোস করা হতো এবং এই সংবাদ পাঠানোর গতি ছিল মিনিটে দশ শব্দ। সরকারের নিকট হতে সাহায্য ও সহযোগিতা পাওয়ার জন্য তিনি ব্যক্তিগতভাবে আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন। অবশেষে ১৮৪৩ সালে তাঁর প্রচেষ্টা সফল হয়। কংগ্রেস তাঁকে ত্রিশ হাজার ডলার মঞ্জুরি দান করে। ওয়াশিংটন থেকে বাল্টিমোর পর্যন্ত চল্লিশ মাইল দীর্ঘ লাইন বসানোর জন্য ঐ টাকা দেওয়া হয়। কিন্তু দীর্ঘসূত্রতা মোর্সকে আর্থিক সংকটে ফেলে দেয়। এমনকি যে ভেইলের পরিবার তাঁকে সাহায্য দিয়ে যাচ্ছিলো তারাও তখন পিছিয়ে যায়। ১৮৩৭ থেকে ১৮৪৪ এই কয়টি বছর তাঁর জন্য সত্যিই বড় দুঃসময় ছিল। তিনি অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে ঐ সংকটের মোকাবেলা করেছিলেন। ঋণ গ্রহণ করার চেয়ে দারিদ্র্য ও অনাহারকেই তিনি বেছে নিয়েছিলেন। তাঁর এই অদ্ভুত ধৈর্য ও চারিত্রিক দৃঢ়তার কারণে অবশেষে তিনি সাফল্যের মুখ দেখতে সক্ষম হয়েছিলেন। চল্লিশ মাইল দীর্ঘ লোহার প্রেরণ কেবলের ভিতর দুটি সমান্তরাল তার ছিল। এই সুদীর্ঘ কেবলটিকে খুব যত্ন সহকারে পরীক্ষা করে ঐ কেবলের উপর সীসার আচ্ছাদন দিয়ে মাটির নিচ দিয়ে বসানো হয়েছিল। দুর্ভাগ্যবশত যখন ওটার ভিতর দিয়ে পরীক্ষামূলক সংকেত প্রেরণ করা হয়েছিল তখন অপর প্রান্তে কোনো সংকেতই পাওয়া যায় নি। পরে এটার কারণ অনুসন্ধান করে দেখা গেল যে, কেবলের উপর উত্তপ্ত সীসার আবরণ দেওয়ার সময় কেবলের উপরিভাগের অপরিবাহী আবরণ (রবারের তৈরি বিদ্যুৎ-নিরোধক) গলে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। বহু পরিশ্রম করে ঐ গোটা লাইনটাকে মাটি খুঁড়ে তুলে ফেলা হয় এবং পরে কাঠবাদাম গাছের খুঁটি পুঁতে মাটির উপর দিয়ে লাইন টানা হয়। চূড়ান্তভাবে সংবাদ–প্রেরণ শুরু করার পূর্বে প্রতিদিন নিয়মিতভাবে লাইনটিকে পরীক্ষা করা হতো। অবশেষে ১৮৪৪ সালের ২৪ মে তারিখে মোর্সের ৫৩তম জন্মবার্ষিকীর কয়েক দিন পরে সর্বপ্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে ঐ লাইনের ভিতর দিয়ে সংবাদ প্রেরণ করা হয়। ঐতিহাসিক সংবাদটি ছিল "স্রষ্টা কত যে পরিশ্রম করেছে"। একই বছর বাল্টিমোর শহরে রাজনৈতিক দল ডেমোক্রাটদের বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ায় মোর্স ও তাঁর নব উদ্ভাবিত টেলিগ্রাফ–পদ্ধতি খুব ভাল গণপ্রচার পেয়েছিলো। তৎকালে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থীকে নয়টি প্রাথমিক নির্বাচনের মধ্য দিয়ে যেতে হতো এবং প্রত্যেকটি নির্বাচনের ফলাফল ঐ লাইনের সাহায্যে তাৎক্ষণিকভাবে ওয়াশিংটনের পাঠিয়ে দেওয়া হতো। বুদ্ধিমান মোর্স তাঁর কোম্পানির ওয়াশিংটনস্থ সদর দফতরকে সুপ্রীম কোর্ট বিল্ডিংয়ের একটি কক্ষে স্থাপন করেছিলেন। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের খবরাখবর জানার জন্য উল্লসিত ও উত্তেজিত রাজনীতিকরা মোর্সের অফিসের ভিতরে ও বাইরে এত বেশি সংখ্যায় ভিড় করেছিলেন যে, ঐ সময় বাধ্য হয়ে সিনেটের অধিবেশন বন্ধ করে দিতে হয়েছিল। এইভাবে রাতারাতি মোর্সের

খ্যাতি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। ১৮৪৫ সালের মধ্যেই নিউইয়র্ক এবং বোস্টনের মধ্যে লাইন বসানো হয়। এই লাইনে দুটি তারের পরিবর্তে একটি তার ব্যবহার করা হয়, ভূমি বা মাটিকে অপর তারের পরিবর্তে ব্যবহার করা হয়েছিল। কাগজের ফিতার উপর শুকনো ছাপের বদলে কালির ব্যবহার প্রচলন করা হলো। তাই সংবাদ প্রেরণকালে যে ঠক ঠক শব্দ হতো, অপারেটর সেটা শুনেই অক্ষরটি বুঝতে পারতো, ফলে নির্ভুলভাবে সংবাদ প্রেরণ সম্ভব হলো। সর্বপ্রথম লাইন বসানোর মাত্র ৪ বছর সময়ের মধ্যে চল্লিশ মাইল থেকে এটার দৈর্ঘ্য বেড়ে দাঁড়ায় আট হাজার মাইল। এর পরে মাত্র ৮ বছরে এই লাইনের দৈর্ঘ্য হয়ে যায় ষোল হাজার মাইল অর্থাৎ গোটা যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে মাকড়সার জালের মতো এর ব্যবহার ছড়িয়ে পড়েছিল। মোর্সের তীব্র ইচ্ছা ছিল যে, সরকার তাঁর প্রবর্তিত পদ্ধতিকে রাষ্ট্রীয়করণ করে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীনে জাতীয় পর্যায়ে এটা পরিচালনা করবেন। কিন্তু সরকার তা না করে বিভিন্ন ব্যক্তিমালিকানাধীন কোম্পানিকে লাইসেন্স প্রদান করায় অসংখ্য কোম্পানির প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। যা হোক পরে ছোট ছোট কোম্পানিগুলো একত্র হয়ে বড় বড় কোম্পানির পত্তন করেছিল। ১৮৫১ সালে প্রতিষ্ঠিত মিসিসিপি ভ্যালি টেলিগ্রাফ কোম্পানি এগুলোর মধ্যে সর্ববৃহৎ ছিল এবং পরে সেটা ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন নামে বিখ্যাত হয়েছিল।

প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর তেইশ বছর পরে সাতান্ন বছর বয়সে তিনি দ্বিতীয়বার বিয়ে করেছিলেন। শেষজীবনে অর্থের প্রাচুর্য পেয়ে একজন মানবপ্রেমিক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তিনি বিভিন্ন সমাজহিতৈষী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলেন ও পুনরায় চিত্রকলার উন্নতির জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন। ১৮৩৬ সালে তিনি নিউইয়র্ক শহরের মেয়রের পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ব্যর্থ হয়েছিলেন। পরে তেষট্টি বছর বয়সে পুনরায় রাজনীতিতে প্রবেশ করে ডেমোক্রাটিক পার্টির পক্ষ থেকে সিনেটর হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পরাজিত হয়েছিলেন।

সময়ের সাথে সাথে মোর্স টেলিগ্রাফ পদ্ধতির উত্তরোত্তর উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি হতে থাকে; মোর্সের উদ্ভাবিত টেলিগ্রাফ পদ্ধতি এতই জনপিয়তা লাভ করে যে, গল্পে আছে, একজন সহজ সরল ওয়াশিংটনবাসী একটি পার্সেল টেলিগ্রাফের সাহায্যে বাল্টিমোর শহরে পাঠাতে চেয়েছিল।

সুদীর্ঘ কর্মময় জীবন ও শেষ বয়সে বিলাসিতা ও প্রাচুর্যে ভরা জীবনযাপন করার পর ১৮৭২ সালে একাশি বছর বয়সে মোর্স মৃত্যুবরণ করেন। একজন চিত্রশিল্পী থেকে বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক হওয়ার সৌভাগ্য খুব কম লোকের ভাগ্যেই ঘটে থাকে। বিশ্ববিখ্যাত ইতালীয় চিত্রকর লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির মতো প্রতিভা নিয়ে জন্মেছিলেন বলে অনেকে তাঁকে যুক্তরাষ্ট্রের লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি বলেও অভিহিত করে থাকে।

জোসেফ হেনরি

(১৭৯৭–১৮৭৫)

অভিনেতা থেকে প্রকৌশলী ও বিজ্ঞানী

বিখ্যাত বিজ্ঞানী জোসেফ হেনরি শৈশবে জীবনের তাগিদে মাত্র ১৪ বছর বয়সে লেখাপড়া বাদ দিয়ে একজন গাড়ি নির্মাতা ও রৌপ্যকারের দোকানে শিক্ষানবিশ হিসেবে যোগদান করতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু মাত্র কিছু দিন পরেই দোকানের মালিক তাঁর সম্বন্ধে বলেছিলেন যে, তিনি একজন রৌপ্যকার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পক্ষে একেবারেই অনুপযুক্ত। মালিকের মন্তব্যে তিনি কখনো মন খারাপ করেন নি, বরং অসীম ধৈর্য সহকারে সুদীর্ঘ দুই বছরের শিক্ষানবিশি সমাপ্ত করেছিলেন। পরবর্তী জীবনে যখন তিনি নিজেই যন্ত্রপাতি তৈরি শুরু করেন তখন ঐ শিক্ষানবিশ বিদ্যা তাঁর খুব কাজে লেগেছিল। এভাবে তিনি জীবনের প্রারম্ভে সামান্য একজন রৌপ্যকার থেকে পরবর্তী জীবনে যুক্তরাষ্ট্রের সেরা বিজ্ঞানীদের একজন হতে পেরেছিলেন।

তিনি তাঁর আবিষ্কারের কোনো পেটেন্ট করেন নি বরং একথা বলতেন যে, একজন বিজ্ঞানীর আবিষ্কারের উপর সারা বিশ্বের প্রতিটি মানুষের জন্মগত অধিকার রয়েছে। চল্লিশোর্ধ্ব বয়সে একজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও পণ্ডিত হিসেবে তিনি ওয়াশিংটনে অবস্থিত স্মিথসোনিয়ান ইনস্‌টিটিউশনের ফার্স্ট সেক্রেটারি নিযুক্ত হন। সেখানে কর্মরত থাকা অবস্থায় স্বীয় প্রভাব প্রয়োগ করে পেশাদার বিজ্ঞানীদের বিজ্ঞান গবেষণায় আরো নিবেদিতপ্রাণ করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। শুধু একজন বিচক্ষণ বৈজ্ঞানিক প্রশাসক হিসেবে তাঁর পরিচিতি নয়। তাঁর প্রথম পরিচিতি এবং তিনি অমর হয়ে আছেন বিদ্যুৎচুম্বক ক্ষেত্রে তাঁর অবদানের জন্য। বিদ্যুতের ইনডাকটেন্সের একক "হেনরি" তাঁর নামে নামকরণ করা হয়েছে। একটি নগরীর নাম, পোর্ট হেনরি, সেটিও তাঁর নামে রাখা হয়েছে।

বিদ্যুৎচুম্বকের ক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে তাঁর অপরিসীম অবদান রয়েছে। ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ইনডাকশন (বিদ্যুৎচৌম্বকের আবেশ) এবং সেলফ ইনডাকশন (স্ব-আবেশ)–এর যুগ্ম আবিষ্কারক হিসেবে শিল্পক্ষেত্রে বিদ্যুৎচুম্বকের প্রয়োগকৃত চুম্বকের প্রস্তুতকারক এবং সর্বোপরি বিশ্বের সর্বপ্রথম বৈদ্যুতিক ঘন্টার প্রস্তুতকারী

হিসেবে তিনি ইতিহাসে ঠাঁই করে নিয়েছেন। এই বৈদ্যুতিক ঘন্টাটিকে অনেকে আবার বিশ্বের সর্বপ্রথম ইলেকট্রোম্যাগনেটিক টেলিগ্রাফ হিসেবে মনে করে থাকেন।

হেনরির পিতামহ হেনড্রিক ও তাঁর ভাই আলেকজান্ডারস স্কটল্যান্ড থেকে ১৭৭৫ সালে ১৬ জুন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরে নতুন করে বসতি স্থাপন করেন। সে সময় নিউইয়র্কের লোকসংখ্যা ছিল মাত্র ৩০ হাজার। তাঁর দাদা ১৭৪৫ সালে গ্লাসগোর বিখ্যাত জেকোবাইট বিদ্রোহে অংশ নিয়েছিলেন। একজন মহান দেশপ্রেমিক হওয়া সত্ত্বেও তাঁর দাদা পারিবারিক পদবি হেনডরিস থেকে হেনরিতে পরিবর্তন করেন। পারিবারিক পদবি পরিবর্তনের জন্য জোসেফ হেনরি অনেক আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন।

হেনরির জন্মদিন নিয়ে মতভেদ রয়েছে। তাঁর জন্মদিন ১৭ ডিসেম্বর ১৭৯৭ সাল বলে সাধারণত মনে করা হয়। তাঁর জীবনীলেখক কার্লসনের মতে হেনরির জন্মদিন হচ্ছে ৯ ডিসেম্বর। যা হোক, তিনি একটি দরিদ্র পরিবারে রোগাক্লিষ্ট পিতার ঘরে জন্মেছিলেন। মাত্র ৭ বছর বয়সে নিউইয়র্কের আলবেনি থেকে ৩৬ মাইল দূরে গলওয়েতে এক নিকট–আত্মীয়ের নিকট তাঁকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সেখানে তিনি প্রায় ৭ বছর অতিবাহিত করেন এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়া শেষ করে চৌদ্দ বছর বয়সে জীবিকার তাগিদে গ্রামেরই একটি দোকানে শিক্ষানবিশ হিসেবে কাজ শুরু করেন।

শৈশবে একদিন তাঁর পোষা খরগোশটি পালিয়ে যায়। সেটিকে ধরার জন্য তিনি তার পিছু পিছু স্থানীয় গির্জার কাঠের মেঝের নিচে চলে যান এবং কাঠের তক্তার তৈরি পাটাতনের ফোঁকর গলিয়ে গীর্জার ভিতরে প্রবেশ করেন। সেখানে গীর্জার লাইব্রেরিটি দেখে তিনি খুবই অবাক হয়েছিলেন। সেখানে তিনি এমন সব বই দেখতে পেয়েছিলেন যেগুলো স্কুলের লাইব্রেরি কিংবা বাড়িতেও ছিল না। গীর্জার কাঠের পাটাতনের ফোঁকর দিয়ে লুকিয়ে একাধিকবার ঐ লাইব্রেরিতে প্রবেশ করে পড়াশুনা করার চেষ্টা করার সময় একদিন হাতেনাতে ধরা পড়েন, কিন্তু গির্জার সদয় কর্তৃপক্ষ তাঁর মধ্যে বিদ্যানুরাগের পরিচয় পেয়ে তাঁকে সরাসরি সদর দরোজা দিয়ে প্রবেশ করার এবং লাইব্রেরি ব্যবহার করার অনুমতি প্রদান করেন।

চৌদ্দ বছর বয়সে পিতার মৃত্যু হলে বাধ্য হয়ে তাঁকে স্থানীয় একজন রৌপ্যকারের দোকানে শিক্ষানবিশের কাজ গ্রহণ করতে হয়। এ সময় থিয়েটারের প্রতি ধীরে ধীরে তাঁর আকর্ষণ জন্মে এবং তিনি গভীরভাবে এর সাথে জড়িয়ে যান। এভাবে তিনি একজন অভিনেতা নাট্যকার ও প্রযোজকে পরিণত হন। স্থানীয় একটি সৌখিন নাট্যগোষ্ঠীর পক্ষে তিনি অভিনয় করা শুরু করেন। তার কিছু দিন পরে হঠাৎ সামান্য

একটি অসুখ তাঁর জীবনের গতিপথ বদলে দেয়। সংসারের বাড়তি খরচ মিটানোর জন্য তাঁর মাতা বাড়ির ঘরগুলো অতিথিদের ভাড়া দিতেন। তিনি যখন অসুস্থ হয়ে শয্যাশায়ী ছিলেন তখন রবার্ট বয়েল নামে একজন অতিথি তাঁকে "লেকচার অন একসপেরিমেন্টাল ফিলসফি, এস্ট্রনোমি এন্ড কেমিস্ট্রি" নামক একটি বই পড়তে দেন। বইটি তাঁর খুবই ভাল লাগে বলে অতিথি তাঁকে বইটি উপহারস্বরূপ দিয়ে দেন। যাহোক ঐ বিশেষ বইটি পড়ে জীবন সম্বন্ধে তাঁর ধ্যানধারণা সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়ে যায়। তিনি অভিনয় ছেড়ে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠেন। বিশ্বের বিজ্ঞানী সমাজ রবার্ট বয়েল নামক ঐ অতিথি ভদ্রলোকের নিকট আজীবন কৃতজ্ঞ হয়ে আছে।

হেনরির জীবনের সাথে বিজ্ঞানী মাইকেল ফ্যারাডের জীবনের আশ্চর্য রকম মিল দেখতে পাওয়া যায়। শৈশবে জীবিকার তাগিদে বই বাঁধাইয়ের দোকানে কাজ করার সময় এক ভদ্রলোক দয়াপরবশ হয়ে তাঁকে একটি বই পড়তে দিয়েছিলেন যেটা পড়ে তাঁর জীবনের গতিপথ সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়েছিল। হেনরি যখন উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, তাঁর প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষা একজন বিজ্ঞানী হিসেবে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয় তখন তিনি আলবেনি একাডেমীতে নৈশ ক্লাসে ভর্তি হয়ে জিওমেট্রি, মেকানিক্স এবং ইংরেজি গ্রামার অধ্যয়ন শুরু করেন। তখন তাঁর বয়স ছিল ২১ বছর। কিছু দিনের মধ্যে ইংরেজি গ্রামার খুব ভালোভাবে আয়ত্ত করে তিনি নিজ বাড়িতেই ছাত্র পড়াতে শুরু করেন এবং একটি স্কুলে শিক্ষকতার চাকুরি লাভ করেন। ঐ চাকুরির টাকা দিয়ে তিনি তাঁর পড়াশুনার খরচ চালাতেন। ঐ সময় তিনি বিভিন্ন লেকচারারের সহকারী হিসেবে কাজ করতেন ও পরে ডাক্তারি পড়ার জন্য প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। কিছুদিন পর তিনি একই একাডেমীর লাইব্রেরিয়ানের পদে নিয়োগ লাভ করেন। ১৮২৪ সালে তাঁর সর্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। পড়াশুনার সাথে সাথে তিনি নানা প্রকার কাজকর্মও করে যাচ্ছিলেন। তিনি কিছুদিন একজন সার্ভেয়ার হিসেবে হাডসন নদী থেকে আয়ার হ্রদ পর্যন্ত রাস্তা তৈরি করার জন্য ম্যাপ তৈরি করেন। তিনি এ জরিপ কাজ এত সুন্দর ও নিখুঁতভাবে সমাধা করেছিলেন যে তার বন্ধু-বান্ধবেরা তাঁকে একজন সিভিল ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য বিশেষভাবে পীড়াপীড়ি করেছিলেন। নিউইয়র্ক স্টেটে জরিপ করার সময় তিনি কিছু টাকাপয়সা সঞ্চয় করতে সমর্থ হন। ১৮২৬ সালের বসন্তে তিনি তিনটি কাজের সুযোগ লাভ করেন ; ওহাইও রাজ্যের একটি খাল খননের তদারকির কাজ মেক্সিকোতে একটি খনিক ব্যবস্থাপকের পদ এবং আলবেনি একাডেমীর অংক ও প্রাকৃতিক দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপকের পদ স্বাভাবিকভাবে তিনি অধ্যাপনার জীবিকাই

বেছে নেন।

২৮ বছর বয়সেই তিনি তাঁর জীবনের লক্ষ্যপথে সঠিক পথের সন্ধান পেয়েছিলেন। প্রথমে গ্রামের দোকানের কর্মচারী, রৌপ্যকারের দোকানের শিক্ষানবিশ, মঞ্চ অভিনেতা, ডাক্তারি, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এবং সব শেষে অধ্যাপনা। বিখ্যাত বিজ্ঞানী ওর্‌স্‌টেডের একটি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার প্রদর্শনী দেখে তিনি ইলেকট্রোম্যাগনেটিজম বা বিদ্যুৎচুম্বকতত্ত্বের প্রতি আকৃষ্ট হন। যেহেতু তিনি অংকশাস্ত্র অধ্যাপনায় নিয়োজিত ছিলেন তাই গ্রীষ্মের ছুটির অবসরে সম্পূর্ণ নিজের খরচে তিনি বিজ্ঞানের সাধনায় নিজেকে নিয়োজিত করেন।

তাঁর জীবনের সর্বপ্রথম ও অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অবদান হল তিনি বিখ্যাত ইংরেজ বিজ্ঞানী উইলিয়াম স্টারজিওনের উদ্ভাবিত বৈদ্যুতিক চুম্বকের অভাবনীয় উন্নতি বিধানে সক্ষম হয়েছিলেন। এই কাজটি করে তিনি খুবই আত্মতৃপ্তি লাভ করেন। কিছুদিন পরে তিনি এর মৌলিক নির্মাণ-কৌশলের আমূল পরিবর্তন সাধন করেন। তিনি তামার তারের প্যাঁচের সংখ্যা বৃদ্ধি করে এবং প্রতিটি প্যাঁচ একটিকে আরেকটি থেকে বৈদ্যুতিকভাবে বিচ্ছিন্ন রাখার জন্য ইনসুলেশন বা বিদ্যুৎনিরোধক ব্যবহার করেন।

১৮২৭ সালে তাঁর ডিজাইনকৃত প্রথম বৈদ্যুতিক চুম্বকটি প্রথমে ১৪ পাউন্ড ও পরে ২৮ পাউন্ড ওজন উত্তোলন করে বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। পরবর্তী কয়েক বছরে তিনি অপেক্ষাকৃত কম খরচে আরো উৎকৃষ্ট মানের ব্যাটারি তৈরি করা ও আরো বেশি প্যাঁচযুক্ত শক্তিশালী চুম্বক তৈরি করার সাধনায় নিয়োজিত হন। এই সাধানায় তিনি সমান্তরাল ও সিরিজ কানেকশান ব্যবহার করে নতুন এক ধরনের ফল লাভ করেন। তিনি এর নামকরণ করেছিলেন ইমপিডেন্স ম্যাচিং। সম্পূর্ণ নিজস্ব সাধনা ও দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তিনি ওহ্‌মের নীতি সম্বন্ধে নতুন এক ধারণা করতে সক্ষম হয়েছিলেন, যদিও তিনি তখনো বিজ্ঞানী ওহ্‌মের নামও শোনেন নি। তিনি তাঁর নিজস্ব মতানুযায়ী নতুন বৈশিষ্ট্যদুটোর নামকরণ করেন 'ইনটেনসিটি' (ভোল্টেজের ক্ষেত্রে) এবং 'কোয়ানটিটি' (বিদ্যুৎ-প্রবাহের ক্ষেত্রে) এই শব্দদুটো বিজ্ঞানীসমাজ কর্তৃক সমাদৃত হয়ে পরবর্তী ৩০ বছর ব্যবহৃত হয়েছিল।

বৈদ্যুতিক চুম্বক তৈরিতে তাঁর সাফল্য দেখে "পেনফিল্ড আয়রন ওয়ার্কস" নামক একটি কোম্পানি তাঁকে একটি বৃহৎ আকারের চুম্বক তৈরির অনুরোধ করে। পরবর্তীকালে তাঁর সম্মানে এই পেনফিল্ড শহরটির নামকরণ করা হয় পোর্ট হেনরি। ১৮৩১ সালে ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুরোধে তিনি ৬০ পাউন্ড ওজনের একটি বৈদ্যুতিক চুম্বক তৈরি করেন, যেটা দিয়ে এক টন ওজনের জিনিস উত্তোলন করা সম্ভব হতো।

আলবেনি একাডেমীতে শিক্ষাকতার সময় তিনি একটি যন্ত্র তৈরি করেছিলেন, সেটাকে কোনো কোনো বিজ্ঞানী প্রথম ইলেকট্রোম্যাগনেটিক টেলিগ্রাফ, আবার অনেকে এটাকে প্রথম বৈদ্যুতিক ঘন্টা বলে মনে করে থাকেন। এই যন্ত্রটির প্রথম প্রদর্শনী করার সময় ক্লাসরুমের ভিতর প্রায় এক মাইল লম্বা তার টানিয়ে তিনি ছাত্রদের সবাইকে হতবাক করে দিয়েছিলেন। লম্বা প্যাঁচানো তারের এক প্রান্তে একটি ছোট বৈদ্যুতিক চুম্বকের ভিতর বিদ্যুৎ প্রবাহিত হওয়া মাত্র একটি পিভটের উপরে বসানো একটি স্থায়ী চুম্বকদণ্ডকে বিকর্ষণ করতো এবং বিকর্ষিত চুম্বকদণ্ডটি একটি ঘন্টার উপর আঘাত করায় শব্দের সৃষ্টি হতো।

বিজ্ঞানী হেনরির জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কার হলো ইনডাকশন (আবেশ) ও সেলফ ইনডাকশন। এই দুটো অবশ্য পরবর্তীতে বিজ্ঞানী মাইকেল ফ্যারাডে কর্তৃক আবিষ্কৃত হয়েছিল। হেনরিকে সেলফ–ইনডাকশন ও ফ্যারাডেকে ইনডাকশনের আবিষ্কারক হিসেবে ধরা হয়ে থাকে। তিনি ইনডাকশন আবিষ্কার করার পর ফ্যারাডের আবিষ্কার সম্বন্ধে অবগত হন, তাই সেটা তিনি আর বৈজ্ঞানিক জার্নালে প্রকাশ করেন নি। ১৮৩২ সালে প্রকাশিত এক বৈজ্ঞানিক নিবন্ধে তিনি সেলফ–ইনডাকশন তত্ত্বের প্রথম উল্লেখ করেন। বিজ্ঞানী ফ্যারাডে ১৮৪৩ সালে একই ঘোষণা দিয়েছিলেন।

হেনরির সাফল্য অতি অল্প সময়ে বিজ্ঞানীসমাজ কর্তৃক সমাদৃত হয় এবং ১৮৩২ সালের নভেম্বর মাসে তিনি নিউ জার্সি কলেজের ন্যাচারাল ফিলসফির অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এই কলেজটি বর্তমানে প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয় নামে বিখ্যাত। তাঁর সমসাময়িক বিজ্ঞানীরা তাঁর সম্বন্ধে বলতেন যে, তিনি ছিলেন তুলনাহীন। দশ বছর পরে তিনি একটি লাইডেন জার–এ ক্যাপাসিটর হতে নির্গত ডিসচার্জের পরিমাণ নিরূপণ সংক্রান্ত পরীক্ষণের উপর গবেষণা শুরু করেন।লাইডেন জার থেকে মুক্ত হওয়া চার্জসমূহ প্যাঁচানো তারের কুণ্ডলীর উপর বসানো শলাকাটিকে যেভাবে চুম্বকে পরিণত করে সেটাকে খুব গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে ও সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করে তিনি এই নতুন সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, ঐ চার্জযুক্ত হওয়ার পদ্ধতিটি একটি স্পন্দন–পদ্ধতি। তিনি পর্যবেক্ষণ করেন যে, উপরের ঘর থেকে প্রায় এক ইঞ্চি লম্বা একটি একক স্ফুলিঙ্গ ৩০ ফুট নিচে অবস্থিত মাটির নিচের ঘরে রক্ষিত একটি প্যাঁচানো সার্কিটের মাঝখানে অবস্থিত একটি শলাকাকে চুম্বকে পরিণত করতে সক্ষম।

১৮৫১ সালে তিনি ঐ ফলাফল সম্বন্ধে নিশ্চিতভাবে বলেছিলেন যে, ঐ স্ফুলিঙ্গটি ঢেউয়ের আকারে স্পন্দিত হয়ে পরিবাহিত হয়েছিল এবং অবিশ্বাস্য দূরত্বে পৌছাতে সক্ষম হয়েছিল। ১৮৮৪ সালে তাঁর এক ছাত্র লিখেছিল যে, কলেজের হল ঘরে

অবস্থিত ঐ বিশেষ ইলেকট্রিক্যাল মেশিন থেকে নির্গত বৈদ্যুতিক স্ফুলিঙ্গটি আশেপাশে বৈদ্যুতিক লাইনের তারের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সমস্ত গ্রামের স্বাভাবিক বিদ্যুৎপ্রবাহ ক্ষণিকের জন্য বন্ধ করে দিয়েছিল। পরে অবশ্য অন্যান্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে এটাই প্রমাণিত হয়েছিল যে, তিনি ঐ বিশেষ পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা বিদ্যুৎচৌম্বক তরঙ্গ তৈরি, প্রেরণ ও নির্ণয় করতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং ইথার (ether) সম্বন্ধে তিনি একটি গুণগত বর্ণনামূলক তত্ত্বের প্রায় কাছাকাছি পৌছেছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি বিজ্ঞানী ম্যাক্সওয়েল ও ফ্যারাডের ধ্যানধারণা থেকেও অনুপ্রাণিত হয়ে থাকতে পারেন।

হেনরির আবিষ্কারগুলো বিজ্ঞানীসমাজ কর্তৃক স্বীকৃতি পেতে অনেক সময় লেগেছিল এবং অনেক বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়েছিল, কারণ তিনি সেগুলো ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করতে অনেক বিলম্ব করতেন। পরবর্তীকালে, যে বৈজ্ঞানিক জার্নালে তিনি তাঁর গবেষণা-নিবন্ধ প্রকাশ করতেন সেটা যুক্তরাষ্ট্রে জনপ্রিয় হলেও ইউরোপে ততটা পরিচিত ছিল না। ফলে ইউরোপীয়রা অনেক দেরিতে তাঁর আবিষ্কার সম্বন্ধে জানতে পেরেছিলেন। ১৮৯৩ সালে অনুষ্ঠিত ইলেকট্রনিক্স্ কংগ্রেসের এক আর্ন্তজাতিক সম্মেলনে তিনি যখন বিদ্যুৎ-চুম্বকের এককের নামকরণ সম্বন্ধে প্রস্তাব উত্থাপন করেন তখন সেটা একজন ফরাসি বিজ্ঞানী কর্তৃক যথাযথভাবে উত্থাপিত হয় এবং এক ব্রিটিশ বিজ্ঞানী সেটা সমর্থন করেছিলেন।

শুধু ইলেকট্রোম্যাগনেটিজমের প্রতিই যে তাঁর আকর্ষণ ছিল তা নয়, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিষয় যেমন জ্যোতির্বিদ্যা, ভূ-পদার্থবিদ্যা, আবহাওয়াতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব এবং নৃতত্ত্ব ইত্যাদির উপর গভীরভাবে পড়াশুনা করছেন। স্মিমসোনিয়ান ইনস্টিটিউশনের ফাষ্ট সেক্রেটারি হিসেবে তিনি নিজেকে একজন যোগ্য প্রশাসক হিসেবে প্রমাণ করেছেন।

খালাতো বোন হেনরিয়েটার সাথে তাঁর বিবাহিত জীবন খুবই মধুর ও আনন্দময় ছিল। ১৮৭৭ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। মাত্র ৫ মাস পরে ১৩ মে ১৯৭৮ সালে ৮১ বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। বন্ধুরা তাঁর চিকিৎসার জন্য ৪০ হাজার পাউন্ড চাঁদা তুলেছিল। সে টাকা প্রথমে হেনরির চিকিৎসার জন্য এবং পরে তাঁর পরিবারের কল্যাণে ব্যয় করা হয়। তাঁর পরিবার পরবর্তীকালে ঐ টাকা ন্যাশনাল একাডেমীকে দান করে দেয়। মৃত্যুর পূর্বে তিনি যখন ডাক্তারদের পাওনা টাকা দিতে চেয়েছিলেন তখন উপস্থিত ডাক্তারেরা সমস্বরে জবাব দিয়েছিল "আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মহান বিজ্ঞানীর নিকট আমাদের কোনো পাওনা নাই।"

এলমন ব্রাউন স্ট্রোগার

(১৮৩৯–১৯০২)

স্বয়ংক্রিয় টেলিফোন এক্সচেঞ্জের উদ্ভাবক

টেলিফোনের ডায়াল ঘুরালেই কাঙ্ক্ষিত নম্বরে সংযোগ হয়ে যায় এবং কথা বলা সম্ভব হয়। এই স্বয়ংক্রিয় টেলিফোন ব্যবস্থার উদ্ভাবক এলমন ব্রাউন স্ট্রোগার। তিনি পেশায় বিজ্ঞানী কিংবা প্রকৌশলী ছিলেন না। প্রথম জীবনে একজন সৈনিক ও পরবর্তী জীবনে একজন ব্যবসায়ী হিসেবে তিনি প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ১৮৩৯ সালের ১৯ অক্টোবর যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরের পেনফিল্ড নামক স্থানে তাঁর জন্ম হয়। ছয় ভাই ও ছয় বোনের বিশাল পরিবারের একজন সদস্য হিসেবে সাংসারিক প্রয়োজনে বাইশতম জন্মদিনে তাঁকে অশ্বারোহী বাহিনীতে যোগদান করতে হয়। সে সময় যুক্তরাষ্ট্রে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়েছিল। ১৮৬৪ সালের শেষ পর্যন্ত তিনি সেনাবাহিনীতে কর্মরত ছিলেন এবং সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট হিসেবে পদোন্নতি পেয়েছিলেন। যুদ্ধ শেষে সেনাবাহিনী ছেড়ে দিয়ে বেসামরিক জীবনে প্রবেশ করেন এবং বাড়ির কাছাকাছি এক স্কুলের প্রিন্সিপাল নিযুক্ত হন । এই একই স্কুলে তিনি ছেলেবেলায় লেখাপড়া করেছিলেন। ইলিনয়, ক্যানসাস প্রভৃতি শহরে শিক্ষকতা করে অবশেষে ক্যানসাস শহর থেকে ষাট মাইল দূরে একটি স্থানে একটি দোকান কিনে ব্যবসা শুরু করেন। তাঁর ব্যবসাটি ছিল মৃতদেহের সৎকার করা। এই ব্যবসায়ে ব্যস্ত থাকাকালীন তিনি স্বয়ংক্রিয় টেলিফোনের কথা চিন্তাভাবনা করতেন, কারণ সে সময় টেলিফোনের সংযোগ পেতে হলে এক্সচেঞ্জের মহিলা অপারেটরদের মাধ্যমে যেতে হতো, ফলে ব্যবসায়ের গোপনীয়তা বিঘ্নিত হতো। সে সময়ে অনেকেই স্বয়ংক্রিয় টেলিফোনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে সেটা উদ্ভাবনের চিন্তাভাবনা করেছিলেন, কিন্তু এলমন ব্রাউনই হচ্ছেন প্রথম সফল আবিষ্কারক যিনি সর্বপ্রথম একটি কার্যকরী স্বয়ংক্রিয় টেলিফোন এক্সচেঞ্জ তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

তাঁর এই উদ্ভাবনের পটভূমিকা হিসেবে একটি সুন্দর গল্প প্রচলিত আছে । একদিন সকালে স্থানীয় খবরের কাগজে তিনি তাঁর বন্ধুর মৃত্যুর খবর পড়ে খুবই দুঃখিত হন, কিন্তু একই সঙ্গে এ কথা পড়ে তিনি খুবই আশ্চর্য হয়ে যান যে, তাঁর ঐ মৃত বন্ধুর

সৎকার করেছে তাঁরই প্রতিদ্বন্দ্বী এক ব্যবসায়ী। কড়া মেজাজি স্ট্রোগার এতে ভীষণ রেগে যান। তিনি ভেবেছিলেন যে, টেলিফোন এক্সচেঞ্জের মহিলা টেলিফোন অপারেটরের ভুলের জন্য এটা ঘটেছে। কারণ তিনি স্থির নিশ্চিত ছিলেন যে, তাঁর মৃত বন্ধুর আত্মীয়স্বজনেরা অবশ্যই তাঁর সংগে যোগাযোগের চেষ্টা করেছিল, কিন্তু হয়তো বা তাঁর টেলিফোন তখন ব্যস্ত ছিল অথবা অন্য কিছু ঘটেছিল, যার জন্য তিনি তাঁর মৃত বন্ধুর সৎকার করতে পারেন নি। তিনি টেলিফোন অফিসে গিয়ে কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ করেন, কিন্তু তাঁরা সেটা অস্বীকার করেন। ফলে রাগান্বিত হয়ে তিনি মনে মনে সিদ্ধান্ত নেন যে, এমন একটি পদ্ধতি উদ্ভাবন করতে হবে যাতে টেলিফোন গ্রাহকেরা সরাসরি তাদের কাঙ্ক্ষিত নম্বরের সাথে যোগাযোগ করতে সক্ষম হবে, এবং যার ফলে কর্তব্যে অবহেলাকারী কোনো মহিলা টেলিফোন অপারেটরের আর প্রয়োজনই হবে না।

একই চিন্তা ভাবনায় তিনি দিনরাত মগ্ন হয়ে থাকলেন। তৎকালে প্রচলিত হস্তচালিত টেলিফোন এক্সচেঞ্জে যেয়ে সেগুলোর কার্যপদ্ধতি সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করে সেই পদ্ধতিকে কিভাবে স্বয়ংক্রিয় করা যায় সে সম্বন্ধে তিনি একটি ধারণায় পৌঁছতে সক্ষম হলেন। প্রথমে তিনি নরম কাঠের তৈরি একটি বৃত্তাকার 'কলার বক্স' (caller box)–এর উপর আলপিন সাজিয়ে তাঁর স্বপ্নের পরিকল্পনার একটি মডেল তৈরি করেন। খুব শীঘ্রই তিনি ১০টি কলাম ও ১০টি সারিবিশিষ্ট একশত টেলিফোন লাইনের স্বয়ংক্রিয় সংযোগ ব্যবস্থার একটি মডেল তৈরি করতে সক্ষম হন। ১৮৮৯ সালের ১২ মার্চ এক হাজার লাইনবিশিষ্ট স্বয়ংক্রিয় টেলিফোন এক্সচেঞ্জের পেটেন্টের জন্য তিনি আবেদন করেন এবং দু'বছর পরে পেটেন্ট–স্বত্ব লাভ করেন। ইলেকট্রিক্যাল কিম্বা মেকানিক্যাল প্রযুক্তির উপর তার নিজের কোনো প্রকার জ্ঞান না থাকার কারণে তিনি তাঁর ভ্রাতস্পুত্র ওয়ালটারকে একটি কার্যকর মডেল বানানোর দায়িত্ব দিয়েছিলেন। ওয়াল্টার ছিলেন একজন সুদক্ষ স্বর্ণকার। তিনি তাঁর অভিজ্ঞতা ও কর্মকুশলতা দিয়ে একশত লাইনবিশিষ্ট স্বয়ংক্রিয় সুইচিং ব্যবস্থাসম্পন্ন এক্সচেঞ্জ বানাতে সক্ষম হন। এই একশত লাইনবিশিষ্ট পদ্ধতিতে একটি সিলিন্ডারের ভিতর একশতটি সংযোগবিন্দু ছিল এবং সেগুলো একটিমাত্র সারিতে সাজানো ছিল। এটা ক্যানসাস নগরে বেল টেলিফোন কোম্পানির সদর দফতরে জনসাধারণ্যে প্রদর্শনীর জন্য রাখা হয়। কিন্তু স্ট্রোগারের দুর্ভাগ্য যে, এটা কোনো শিল্প–উদ্দ্যোক্তাকে আকৃষ্ট করতে পারে নি। যাহোক জোসেফ হ্যারিস নামে একজন চতুর ও উচ্চাভিলাষী সেল্‌সম্যান স্ট্রোগারকে খুবই উৎসাহ দান করে বলে যে, ১৮৯২ সালে শিকাগোতে যে বিশ্ব বাণিজ্যমেলা অনুষ্ঠিত হবে সেই মেলায় যদি এই উদ্ভাবিত পদ্ধতির প্রদর্শনী করা যায় তবে সেখানে

কোনো না কোনো শিল্পপতি অবশ্যই এটার প্রতি আগ্রহ প্রদর্শন করবে। এইভাবে হ্যারিসের অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বিশ্বমেলা শুরু হওয়ার দুই বছর পূর্বে ওয়ালটারকে সাথে নিয়ে স্ট্রোগার শিকাগোতে যান এবং সেখানে এস. এ. মায়ার নামে এক বন্ধু তাঁকে এই নতুন পদ্ধতিটির উন্নয়নে অনেক সহায়তা করেন। ইতোমধ্যে কিছু শিল্পপতি তাঁর এই পদ্ধতিতে আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং অর্থনৈতিক সহযোগিতা করতে সম্মত হন। ১৮৯১ সালের ৩০ অক্টোবর তারিখে ইলিনয় রাজ্যে সর্বপ্রথম স্ট্রোগারের স্বয়ংক্রিয় টেলিফোন এক্সচেঞ্জ কোম্পানির রেজিষ্ট্রি করা হয়। তখন স্ট্রোগারের মাসিক বেতন নির্ধারণ করা হয় একশত ডলার। এইভাবে তিনি মৃতদেহের সৎকার করার ব্যবসা থেকে অব্যাহতি লাভ করেন। এই স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিটি শিকাগো রেলওয়ে কোম্পানিকে দেখানো হয়। এম. এ. মায়ার এই রেলওয়েতেই চাকুরি করতেন। একটি মডেল তৈরিকারক কোম্পানিকে সুইচিং পদ্ধতিটির মডেল তৈরি করার দায়িত্ব দেওয়া হয় এবং এটাকে আরো উন্নত করার প্রচেষ্টা চলতে থাকে। ইন্ডিয়ানা রাজ্যের লা-পোর্টে নামক স্থানে ১৮৯২ সালের হেমন্তে বিশ্বের সর্বপ্রথম স্বয়ংক্রিয় টেলিফোন এক্সচেঞ্জ চালু করা হয়। এদিকে একটি ঘটনা ঘটেছিল যার জন্য স্ট্রোগার-এর কোম্পানি অতি সহজেই লা-পোর্টে শহরে ব্যবসা করার অনুমতি পেয়েছিল। ১৮৯০ সালে বেল টেলিফোন কোম্পানি তাদের প্রযুক্তি চুরি করে টেলিফোন ব্যবস্থা চালু করার জন্য লা-পোর্টে শহরের টেলিফোন কোম্পানির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে। বিজ্ঞ বিচারক বেল টেলিফোন কোম্পানির পক্ষে রায় প্রদান করেন এবং লা-পোর্টে শহরের সমস্ত টেলিফোন পুড়িয়ে ফেলারও নির্দেশ দেন। এই অবস্থায় স্ট্রোগার যখন নতুন টেলিফোন কোম্পানির জন্য আবেদন করেন তখন কর্তৃপক্ষ অতি সহজেই তাঁকে আইনগত অধিকার প্রদান করেন। একটি মুদি দোকানের উপরতলায় মাসিক ২৫ ডলার ভাড়ায় স্ট্রোগারের স্বয়ংক্রিয় টেলিফোন এক্সচেঞ্জ চালু করা হয়। এর মধ্যে ঘরের অর্ধেক অংশ ১৫ ডলারে অন্যের নিকট ভাড়া দেওয়া হয়েছিল। যা হোক নতুন ব্যবসা শুরু করার জন্য ঐ জায়গাটুকুই যথেষ্ট ছিল। সেপ্টেম্বরে লাইন বসানোর কাজ শুরু হয় এবং অক্টোবরের মাঝামাঝি সময়ে সুইচ বসানোর কাজ শেষ হওয়ায় সর্বপ্রথম ৫২ জন গ্রাহককে পরীক্ষামূলকভাবে সংযোগ দেওয়া হয়। ১৮৯২ সালে ৩ নভেম্বর একটি জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এর শুভ উদ্বোধন ঘটে। অনেক নামি দামি লোককে আমন্ত্রণ জানানো হয় এবং শিকাগো থেকে একটি বিশেষ ট্রেনের ব্যবস্থা করে তাঁদেরকে লা-পোর্টে শহরে আনা হয়। টেলিফোন এক্সচেঞ্জে নিয়ে যাবার পর অতিথিরা বিভিন্ন তাকের উপর থরে থরে সজানো ৮০টি স্ট্রোগার সুইচ এবং সেই সাথে বড় বড় ব্যাটারি দেখতে পান। বলা বাহুল্য, সেখানে কোনো মহিলা

টেলিফোন অপারেটর ছিলেন না।

শিকাগোর সংবাদপত্র 'দি ডেইলি ওশেন' –এর সংবাদদাতা একথা ভেবে হয়রান হয়ে গিয়েছিলেন যে, এতবড় একটি টেলিফোন এক্সচেঞ্জ কি করে একজন মাত্র স্বত্বাধিকারী পরিচালনা করতে সক্ষম হবে এবং তাঁকেও কিছুই করতে হবে না সব কিছুই স্বয়ংক্রিয়ভাবে সমাধা হবে। স্ট্রোগার ও তাঁর কোম্পানির লোকজনদের সেদিন যদিও কিছুই করণীয় ছিল না কিন্তু বেচারা গ্রাহকদের সেদিন ভোগান্তির একশেষ হয়েছিল, কারণ আমন্ত্রিত অতিথিরা দুপুর ১২–৩০টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিটির কার্যকারিতা নিজ হাতে প্রমাণ করে দেখতে খুবই আগ্রহী ছিলেন, ফলে বেচারা গ্রাহকদের বারে বারে রিসিভার তুলে জওয়াব দিতে হচ্ছিল। ঐ দিনটি সত্যিই স্ট্রোগার ও তাঁর লোকজনদের জন্য একটি ঐতিহাসিক সাফল্যের দিন হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিল। পরের দিন শিকাগোর বিখ্যাত দৈনিক পত্রিকাগুলোতে সংবাদ শিরোনাম বেরিয়েছিল "মহিলা অপারেটরদের দিন ফুরিয়ে গেছে"। ডায়াল টেলিফোন পদ্ধতিটি ছিল স্ট্রোগারের কোম্পানির ইঞ্জিনিয়ারদের উদ্ভাবন–ক্ষমতার সাফল্যের এক অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এই পদ্ধতি সময়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে প্রায় একশত বৎসর যাবত এককভাবে চালু থাকার পর এই সেদিন মাত্র (১৯৮০ সালে) এর বদলে পুশ–বাটন টেলিফোন প্রবর্তিত হয়। মজার ব্যাপার হচ্ছে এই যে, স্ট্রোগারের উদ্ভাবিত পদ্ধতিতেও সর্বপ্রথম পুশ–বাটন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছিল। একশতের কম সংখ্যক গ্রাহকের জন্য তাঁর কোম্পানির প্রকৌশলীরা খুব সহজ পুশ–বাটন পদ্ধতির উদ্ভাবন করেছিল। এতে মাত্র দুটো বোতাম ছিল। উদাহরণস্বরূপ, ৩৭ নম্বর ডায়াল করতে গিয়ে একজন গ্রাহককে দশম ঘরের বোতাম তিনবার ও একক ঘরের বোতামটি সাতবার টিপ দিতে হতো, কিন্তু এতে মুশকিল ছিল এই যে, এটা সহজ হলেও বেশির ভাগ গ্রাহকই কতবার বোতামটি টিপেছে সেটা ভুলে যেতো।

লা–পোর্টের সাফল্যজনক উদ্বোধনের পর তাঁর পদ্ধতিটি খুব দ্রুতগতিতে যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য শহরেও ছড়িয়ে পড়তে থাকে। মাত্র ৪ বছরের মধ্যে ইলিনয়ের ফোর্ট শেরিডিয়ান, ইন্ডিয়ানা, আইওয়া, মিন্নোসোটা, নিউ মেক্সিকো, কলোরাডো এবং উইসকনসিন অংগরাজ্যে এটার প্রয়োগ শুরু হয়ে যায়। প্রথমদিকে প্রতিটি নতুন এক্সচেঞ্জ এক একটি নবতর ও উন্নততর প্রযুক্তির বাস্তব ক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহৃত হতো। ১৮৯৫ সালের মধ্যেই তাঁর কোম্পানির প্রকৌশলীরা একটির পর একটি উন্নততর পদ্ধতির উদ্ভাবন করে বর্তমানে প্রচলিত পদ্ধতির চূড়ান্তরূপ দান করতে সক্ষম হয়। "ধাপে ধাপে উপরে উঠা এবং পরে ঘূর্ণায়মান গতিতে নির্দিষ্ট নম্বরের মাঝে যুক্ত হওয়া" এই চূড়ান্ত ডিজাইনে পৌছার জন্য অনেক পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজন ও বিয়োজন করতে হয়। লা–পোর্টে স্থাপিত সর্বপ্রথম মডেলটিতে যেটি তার ব্যবহার করা

হয়েছিল। তিনটি ছিল সংকেত প্রেরণের জন্য একটি সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার জন্য ও সর্বশেষ তারটি ছিল কথা বলার জন্য। পুশ–বাটন পদ্ধতিতে গ্রাহকেরা বোতাম টেপার সংখ্যা ভুলে যাওয়ার কারণে ১৮৯৬ সালের দিকে ঘূর্ণায়মান ডায়াল পদ্ধতির প্রবর্তন করা হয়। ১৮৯৭ সালে এই পদ্ধতির উন্নয়ন প্রচেষ্টায় আরেক ধাপ অগ্রগতি সাধিত হয়। এতে ট্রান্সফার ট্রাংকিং পদ্ধতির প্রবর্তন করা হয়, যাতে এক এক্সচেঞ্জের লোক দূরবর্তী অন্য এক্সচেঞ্জের সাথে সরাসরি কথা বলতে সক্ষম হয়। ফলে এক্সচেঞ্জের আকার ও আয়তনের পরিবর্তন ঘটে, কারণ পূর্বে একটি সুইচ একটি মাত্র এক্সচেঞ্জের জন্য ব্যবহৃত হতো এবং ঐ একটি সুইচের মাধ্যমে এক্সচেঞ্জের সবগুলো টেলিফোনের সাথে যোগাযোগ করা হতো।

স্ট্রোগার তাঁর প্রতিষ্ঠিত কোম্পানির সাথে মাত্র কয়েক বছর যুক্ত ছিলেন। তিনি তার ৪৮ তম জন্মবার্ষিকীতে স্মরণীয় আবিষ্কারটি করেছিলেন। (যারা মনে করে ৪০ বছর পার হয়ে গেছে জীবনে কিছুই করা হলো না, এটা তাদের জন্য এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত)। ১৮৯০ সালের দিকে তাঁর স্বাস্থ্য ক্রমাবনতির দিকে যেতে থাকলে তিনি তাঁর প্রতিষ্ঠিত কোম্পানি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। তাঁর কোম্পানিটি উত্তরোত্তর উন্নতির পথে এগুতে থাকে এবং বিদেশেও এর শাখা খোলা হয়। ১৯০১ সালে এটা অটোমেটিভ ইলেকট্রিক নামে নতুন রূপ লাভ করে এবং পরে ১৯৫৫ সালে জেনারেল টেলিফোন অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স নামে রূপান্তর লাভ করে। বর্তমানে এটি GTE কম্যুনিকেশন সিস্টেমের একটি অঙ্গীভূত প্রতিষ্ঠান।

কর্মময় জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করলেও ব্যক্তিগত জীবনে তিনি খুবই কর্মমুখর ছিলেন। তিনি তাঁর ব্যক্তিতগত নার্স সুসান বেলাংগারকে বিয়ে করেন এবং ফ্লোরিডা রাজ্যের সেন্ট পিটারসবুর্গের স্বাস্থ্যকর পরিবেশে বসবাস করতে থাকেন। নার্স সুসান তাঁর চতুর্থ স্ত্রী কিংবা পঞ্চম স্ত্রী ছিলেন সে সম্বন্ধে সঠিক কিছু বলা যায় না। প্রথম স্ত্রী দুটি কন্যাসন্তান রেখে মারা যাওয়ার পর তিনি দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন। দ্বিতীয় স্ত্রীর ভাগ্যে কি ঘটেছিল সঠিক জানা যায় না। ১৮৮৬ সালে তিনি এলিস মেরী মিল নামে এক ভদ্রমহিলাকে বিয়ে করেন। এই স্ত্রীর গর্ভে তাঁর একমাত্র পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে। এই স্ত্রীর সাথে তিনি সুদীর্ঘকাল কানসাস শহরে বসবাস করেন। ১৯০২ সালের ২৬ মে ৬২ বছর বয়সে সেন্ট পিটারসবুর্গের বাড়িতে তিনি পরলোকগমন করেন। তাঁর মৃত্যুর ৪৭ বছর পরে অর্থাৎ তাঁর ১১০ তম জন্মবার্ষিকীতে বিভিন্ন টেলিফোন কোম্পানির প্রতিনিধিরা সম্মিলিতভাবে তাঁর কবরে একটি ব্রোঞ্জের স্মৃতিফলক স্থাপন করে। সেই ফলকের মধ্যে তাঁর অবিস্মরণীয় প্রতিভা ও স্বয়ংক্রিয় টেলিফোন এক্সচেঞ্জ উদ্ভাবনে তাঁর অবদানের কথা উল্লেখ করে তাঁরা তাঁদের শ্রদ্ধাঞ্জলি উৎকীর্ণ করে রেখেছেন।

ভেরনার ফন সিমেন্স (১৮১৬–১৮৯২)
ভিল্‌হেল্‌ম্‌ সিমেন্স (১৮২৩–১৮৮৩)
কার্ল সিমেন্স (১৮২৯–১৯০৬)
সিমেন্স সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ভ্রাতৃত্রয়

সিমেন্স (জার্মানি) কোম্পানি একটি বিশ্ববিখ্যাত প্রতিষ্ঠানের নাম। বিশেষ করে বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম তৈরির ক্ষেত্রে এবং টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থায় এটি অত্যন্ত সুপরিচিত ও নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশের টেলিফোন যোগাযোগ ব্যবস্থায় এই প্রতিষ্ঠানের অনেক অবদান আছে। এই বিখ্যাত কোম্পানিটির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন জার্মানির দুই ভাই ভেরনার ফন সিমেন্স ও ভিল্‌হেল্‌ম্‌ সিমেন্স। পরবর্তীতে ছোট ভাই কার্ল সিমেন্সও এতে যোগদান করেন। তাঁদের পিতার নাম ফার্ডিনান্ড সিমেন্স এবং মাতার নাম এলিনর সিমেন্স। তাঁরা ছিলেন চৌদ্দ ভাইবোন। পিতা ছিলেন পেশায় একজন কৃষক। জার্মানির হানোফার নগরীতে ১৮১৬ সালে জ্যেষ্ঠ সন্তান ভেরনার এবং ১৮২৩ সালে চতুর্থ সন্তান ভিল্‌হেল্‌মের জন্ম হয়। ভিলহেল্‌মের জন্মের কিছুদিন পর তাঁদের পিতা হামবুর্গ থেকে একশত বিশ কিলোমিটার দূরে ল্যুবেক শহরে নতুন করে বসতি স্থাপন করেছিলেন। সেখানে তিনি একটি বিরাট খামারের দেখাশোনা ও পরিচালনা করতেন। এখানে ১৮২৯ সালে ষষ্ঠ সন্তান কার্লের জন্ম হয়। ১৪ জন ভাইবোনের মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভেরনার ফন সিমেন্সই মূলত সিমেন্স কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তাঁর স্বপ্ন ছিল একজন স্থপতি–প্রকৌশলী হবার, কিন্তু অর্থনৈতিক কারণে বাধ্য হয়ে তাঁকে সেনাবাহিনীতে যোগদান করতে হয়েছিল। সেখানে তিনি একজন গোলন্দাজ অফিসার হিসেবে কর্মরত ছিলেন। বার্লিনে প্রশিক্ষণরত অবস্থায় অঙ্কশাস্ত্র ও বিজ্ঞানশাস্ত্রে তিনি বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেন। প্রশিক্ষণ শেষে সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা ও উদ্যমে তিনি বিজ্ঞানশাস্ত্রে আরো পড়াশোনা এবং পরীক্ষা–নিরীক্ষা চালিয়ে যেতে থাকেন। ছোট ভাই ভিলহেল্‌মের পড়াশোনার প্রতি তাঁর তিক্ষ্ণ নজর ছিল, কারণ তাঁর দৃঢ়বিশ্বাস ছিল যে, ভবিষ্যতে ভিলহেল্‌ম একজন নামকরা প্রকৌশলী হবেই। পিতার অনুমতি নিয়ে তিনি তাই ভিলহেল্‌ম্‌কে এক কারিগরি স্কুলে ভর্তি করে দেন। প্রত্যহ সকালে তিনি তাঁকে নিজে অংক করাতেন। একই সঙ্গে উইলিয়াম

ইংরেজি ভাষাও শিখতে থাকেন, কারণ ভেরনার বুঝতে পেরেছিলেন, ইংরেজি ভাষা ভালোরূপে আয়ত্ত করতে না পারলে ছোট ভাইয়ের প্রকৌশল–শিক্ষা পূর্ণাংগ রূপ লাভ করবে না।

১৮৩৯ সালে মাতার আকস্মিক মৃত্যু ও পরবর্তী বছর পিতার অকালমৃত্যুতে এত বড় সংসারের সম্পূর্ণ দায়দায়িত্ব ভেরনারের কাঁধে পড়ে। সে সময় ১৪ ভাইবোনের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠের বয়স ছিল পাঁচ বছরেরও কম। এতবড় সংসারের বোঝা বহন করেও তিনি নিজকে বৈজ্ঞানিক সাধানায় নিয়োজিত রেখেছিলেন। এর ফলস্বরূপ ১৮৪৩ সালে ইলেকট্রোপ্লেটিং–এর উপর একটি নতুন পদ্ধতি আবিষ্কারের সাফল্য অর্জন করেন। চতুর্থ ভাই ভিলহেল্‌মের উপর এই নব উদ্ভাবিত পদ্ধতিটি বাজারজাত করার দায়িত্ব দেওয়া হয়। মাত্র একুশ বছর বয়সে এই দায়িত্ব পেয়ে ভিলহেলম সর্বপ্রথম যে যন্ত্রটি বিক্রি করেছিলেন তার লভ্যাংশ দিয়ে তিনি ইংল্যান্ড ভ্রমণে যান। ইংল্যান্ডে এই পদ্ধতিটি বিক্রি করার প্রচেষ্টা চালিয়ে তিনি বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করেন। এই সময় তিনি বার্মিংহামে রিচার্ড এলকিংটন নামে এক ভদ্রলোকের সাথে পরিচিত হন। এই ভদ্রলোক তাঁকে জার্মান কোম্পানির ব্রিটিশ পেটেন্ট পেতে সর্বাত্মক সাহায্য ও সহযোগিতা করেছিলেন। ঐ সময় এক হাজার ছয়শত পাউন্ড অর্থ লাভ করে বিজয়ীর বেশে তিনি জার্মানি ফিরে গিয়ে তাঁর পরিবারকে অর্থনৈতিক দুর্দশার হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন। পরের বছর তিনি পুনরায় ইংল্যান্ডে ফিরে যান, কিন্তু সেবার তেমন আশানুরূপ কিছু করতে পারেন নি। ১৮৪৮ সালে নিজের উদ্ভাবিত একটি স্টীম ইঞ্জিন বিক্রি করে ভিলহেল্‌ম চারশত পাউন্ড লাভ করেন। এবং ভবিষ্যতে আরো বিক্রি করার নিশ্চয়তা পেয়ে ইংল্যান্ডেই স্থায়ীভাবে বাস করতে শুরু করেন। এইভাবে আর্থিক নিশ্চয়তা লাভ করায় তাঁকে আর আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে স্বর্ণখনির সন্ধানে যেতে হয় নি। এই বিষয়ে বড় ভাই ভেরনারের মতামত তাঁকে সিদ্ধান্ত নিতে খুবই সাহায্য করেছিল। কারণ তিনি সব সময় বলতেন যে, স্বর্ণ অনুসন্ধানের চেয়ে স্বর্ণ বানানোর চেষ্টা করাই বুদ্ধিমানের কাজ। বড় ভাই ভেরনারের আজীবন লালিত স্বপ্ন ছিল বিরাট একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা এবং সে স্বপ্ন বাস্তবায়নের প্রাথমিক প্রচেষ্টাস্বরূপ তিনি ইলেকট্রিক টেলিগ্রাফ সিস্টেমের উপর কাজ শুরু করেন। ১৮৪২ সালে তৎকালে প্রচলিত হুইটস্টোন টেলিগ্রাফ পদ্ধতিটি পরীক্ষা–নিরীক্ষা করার জন্য বার্লিনে আনা হয়েছিল, এবং ভেরনার এতে সরাসরি জড়িত ছিলেন। এই পদ্ধতিটি পরীক্ষা–নিরীক্ষা করে কিছুদিন পরে তিনি নিজেই একটি পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন এবং একজন ঘড়ি–নির্মাতার সাথে যৌথভাবে উৎপাদন শুরু করেন। দুর্ভাগ্যবশত ১৮৪৬ সালে ঐ যৌথ প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ হয়ে যায়। উদ্যমী ভেরনার এতে হতোদ্যম না হয়ে

কিছুদিন পরেই বুখার ও হালস্কে নামক দুইজন সুদক্ষ কারিগরের সহযোগিতায় আরো উন্নতমানের একটি পদ্ধতির ডিজাইন করেন। তাঁর এই নব আবিষ্কৃত ডিজাইনটি তৎকালীন প্রুশিয়ান টেলিগ্রাফ কমিশন কর্তৃক স্বীকৃতি পেয়ে ১৮৪৭ সালের ৭ অক্টোবর প্রুশিয়ান সরকারের পেটেন্ট লাভে সমর্থ হয়। এই ঘটনার মাত্র ৬ দিন পূর্বে অর্থাৎ ১ অক্টোবর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সিমেন্স অ্যান্ড হালস্কে নামক টেলিগ্রাফ কোম্পানি, যেটা পরবর্তীতে সিমেন্স (জার্মানি) নামে বিশ্ববিখ্যাত হয়েছে। জোহান জর্জ হালস্কে (১৮১৪–১৮৯০) সুদীর্ঘকাল বার্লিন শহরে একজন সুদক্ষ কারিগর হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন। ভেরনারের কৃতিত্বপূর্ণ ডিজাইন ও হালস্কের সুদক্ষ কারিগরি কুশলতা এই দুইয়ের সমবায়ে নবপ্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানটি ধীরে ধীরে উন্নতি ও সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হতে থাকে। প্রাথমিক অবস্থায় ভেরনার তাঁর এক চাচাতো ভাইয়ের কাছে টাকা ধার করে একটি ভাড়াটে বাড়ির নিচতলায় মাত্র দশজন শ্রমিক নিয়ে সিমেন্স কোম্পানির কাজ শুরু করেছিলেন। জর্জ হাল্স্কে ছিলেন অংশীদার ও প্রথম ওয়ার্কস ম্যানেজার।

১৮৪৮ সালে বার্লিনে এক বিপ্লবী সরকারের প্রতিষ্ঠা হলে ঐ বৈপ্লবিক জাতীয় পরিষদের প্রথম অধিবেশন ফ্রাংকফুর্টে অনুষ্ঠিত হয়। ঐ অধিবেশনের জন্য বার্লিন-ফ্রাংকফুর্ট টেলিগ্রাফ লাইন প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব সিমেন্স কোম্পানিকে দেওয়া হয়। এর কিছুদিন পরেই শুরু হয় প্রুশিয়া ও ডেনমার্কের মধ্যে যুদ্ধ। সেনাবাহিনীর সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট হিসেবে ভেরনার যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন। ইতিমধ্যে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র থেকে এসে যায় দ্রুততর টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা মোর্স কোড। এই মোর্স কোড ব্যবস্থা উৎপাদনের সম্পূর্ণ দায়িত্ব সিমেন্স কোম্পানিকে দেওয়া হয়। ১৮৫০ সালে প্রুশিয়ান সরকারের ফায়ার ব্রিগেড ও রেলওয়ের জন্য টেলিগ্রাফ লাইন প্রতিষ্ঠা করে সিমেন্স কোম্পানি বেশ মোটা অংকের টাকা লাভ করেছিল। ইতোমধ্যে শ্রমিকের সংখ্যা দশ হতে বেড়ে বত্রিশে দাঁড়ায়। তখন ভিল্হেল্মকে প্রতিনিধিরূপে ইংল্যান্ডে পাঠানোর পরিকল্পনা করা হয়। ১৮৫১ সালের বিখ্যাত লন্ডন প্রদর্শনীতে সিমেন্স কোম্পানি উৎকৃষ্ট ডিজাইনের জন্য ব্রোঞ্জ পদক লাভ করে, কিন্তু আশানুরূপ ব্যবসায়ের অর্ডার পেতে ব্যর্থ হয়। পরে প্যারিসে নতুন বাজার লাভের চেষ্টা করা হয়, কিন্তু সেখানেও তেমন উল্লেখযোগ্য সফলতা না পাওয়ায় সিমেন্স কোম্পানি খুব শীঘ্রই আর্থিক সংকটে পড়ে। ব্যাংক থেকে ধার নিয়ে শ্রমিকদের বেতন দেওয়া হতে থাকে। এরই মধ্যে আবার কিছু স্থায়ী ও বিখ্যাত ক্রেতা অন্যত্র চলে যাওয়ার ফলে কোম্পানির আর্থিক দুরবস্থা চরমে পৌঁছে। ১৮৫২ সালে কোম্পানির অবস্থার কিছু কিছু উন্নতি হতে থাকে। রাশিয়ার সেন্ট পিটারসবুর্গ (পরবর্তীকালে লেনিনগ্রাদ নামে পরিচিত) শহরের কর্তৃপক্ষ বেশ বড় ধরনের একটা অর্ডার দেওয়ায় কোম্পানিটি এ যাত্রায় বেঁচে যায়।

ইতোমধ্যে একটি দুঃখজনক ঘটনা ঘটে। প্রুশিয়ান সরকার নিম্নমানের প্রযুক্তির অভিযোগ করে কোম্পানির সাথে সম্পাদিত সমস্ত চুক্তি বাতিল ঘোষণা করে। যা হোক, মস্কো–সেন্টপিটারসবুর্গ লাইনের জন্য পঁচাত্তরটি প্রিন্টিং টেলিগ্রাফ মেশিন সরবরাহ করে তাঁরা এ ধাক্কা কোনো রকমে সামলে নিয়েছিলেন। এর পরপরই বড় ধরনের বেশ কিছু অর্ডার পাওয়া যায়, যেমন ফিনল্যান্ড থেকে কৃষ্ণ সাগর পর্যন্ত এবং মস্কো থেকে পোল্যান্ড পর্যন্ত লাইন বসানোর কাজ। যে কোনো ব্যবসায়ে সাময়িক উচ্চ মুনাফা লাভের চেয়ে দীর্ঘমেয়াদি অপেক্ষাকৃত কম মুনাফা ব্যবসায়ের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। মস্কোর সাথে সম্পাদিত দীর্ঘমেয়াদি সরবরাহ চুক্তির ফলে ছোট ভাই কার্ল সেন্ট পিটারসবুর্গেই বসতি স্থাপন করেন এবং পরে একজন রাশিয়ান তরুণীর সাথে পরিণয় বন্ধনে আবদ্ধ হন। ব্যবসায়ে প্রচুর আর্থিক সফলতার কারণে চাচাতো ভাইয়ের কাছ থেকে নেওয়া ধার শোধ করে দিয়ে কার্লকে একজন অংশীদার করে নেওয়া হয়।

এদিকে ইংল্যান্ড একের পর এক রাজ্য জয় করে চলছিল, ফলে বাধ্য হয়ে ইংল্যান্ডের সরকারকে দ্রুত সংবাদ আদান–প্রদান করার জন্য সাবমেরিন কেবল স্থাপনের কথা চিন্তাভাবনা করতে হচ্ছিল। ১৮৫০ সালে ইংলিশ চ্যানেলে সর্বপ্রথম সাবমেরিন–কেবল বসানো হয়েছিলো, কিন্তু একজন জেলে ভুলক্রমে একটি অতিকায় সামুদ্রিক দানব মনে করে কেবলটিকে কেটে নষ্ট করে ফেলে। কেউ কেউ অবশ্য মনে করেন, ঐ জেলেটি ভেবেছিল যে, রবারের আবরণের ভিতর স্বর্ণ লুকানো আছে এই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়েই সে এই কাজটি করেছিল। যাহোক পরের বছর আরেকটি নতুন কেবল স্থাপন করা হয়। এই সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে তাঁরা আটলান্টিক মহাসাগরের বুকে সাবমেরিন কেবল বসানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু নিম্নমানের ইনসুলেটরের কারণে ঐ প্রচেষ্টা পরপর দুবার ব্যর্থ হয়। তৃতীয়বারে এই প্রচেষ্টা সফল হয়। এর পরে সিমেন্স কোম্পানি নিজেরাই কেবল বানানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং নিউওয়েল নামক কোম্পানির সাথে যৌথ উদ্যোগে উৎপাদন শুরু করে। পরে ১৮৫৮ সালে ইংল্যান্ডে উলউইচে হালস্কের সাথে যৌথ উদ্যোগে কেবল উৎপাদন শুরু করা হয়। সাবমেরিন কেবল বসানোর সময় ভিলহেল্‌ম ও তাঁর নবপরিণীতা স্ত্রী পরপর দুবার মারাত্মক দুর্ঘটনা ও জাহাজডুবির কবল থেকে অলৌকিকভাবে বেঁচে যান। এই ঘটনার পরে হালস্কে এইরূপ ঝুঁকিপূর্ণ ও বিপজ্জনক ব্যবসায়ে উৎসাহ হারিয়ে ফেলেন এবং ১৮৬৫ সালে অবসর গ্রহণ করেন। এইভাবে ১৮৬৫ সালে সিমেন্স ও হালস্কে কোম্পানি সিমেন্স ব্রাদার্স নামক ব্রিটিশ সাবসিডিয়ারি কোম্পানি হিসেবে পরিবর্তিত হয়ে যায়। ইংল্যান্ড থেকে ভারতবর্ষ পর্যন্ত একটি টেলিগ্রাফ লাইন বসানোর জন্য ভিলহেল্‌ম

ব্রিটিশ সরকারকে বোঝানোর আপ্রাণ চেষ্টা করে সফলতা লাভ করেন। ফলে ১৮৬৯ সালে লন্ডন থেকে কলকাতা পর্যন্ত এগার হাজার কিলোমিটার দীর্ঘ স্বয়ংক্রিয় টেলিগ্রাফ লাইন বসানোর দুরূহ কাজ শেষ হয়। তৎকালীন বিশ্বে এটা ছিল প্রযুক্তিগত দক্ষতার এক উৎকৃষ্ট নিদর্শন। ঐ লাইনটির বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, ঐ সুদীর্ঘ কেবলে একটিমাত্র ইন্টারকানেকশান ছিল এবং সেটা ছিল তেহরানে। এই পদ্ধতিটি পাঞ্চ পেপারটেপ দ্বারা পরিচালিত হতো। ১৯৩১ সাল পর্যন্ত এই লাইনটি সম্পূর্ণ কার্যক্ষম ছিল এবং আজো এর কিছু কিছু অংশ ব্যবহার করা হচ্ছে। এই ঐতিহাসিক লাইনটি বসানোর কাজ খুবই কঠিন ও দুঃসাধ্য ছিল।

সিমেন্স ভাইদের জীবনী বিস্তারিত লিখতে গেলে তা হয়ে উঠবে এক বিশাল কলেবরের গ্রন্থ। ভেরনার সিমেন্স ছিলেন বিশ্বের খ্যাতনামা আবিষ্কারকদের অন্যতম। তাঁর নামে একটি বৈদ্যুতিক ইউনিটের নামকরণ করা হয়েছে, কনডাকটেন্সের একক– সিমেন্স। ১৯১০ সাল পর্যন্ত বিটিশ সিমেন্স কোম্পানি জার্মান সিমেন্স কোম্পানির চেয়ে অনেক বড় ছিল। পরে বিটিশ সিমেন্স ভেংগে গিয়ে প্রথমে AEI, পরে ইংলিস ইলেকটিক (English Electric) এবং জি–ই–সি (ঐঋউ) নামে বিশ্বখ্যাতি অর্জন করেছে। ১৯৬৬ সালে এটা আবার সিমেন্স কোম্পানি নামে পরিচিতি লাভ করে। সিমেন্স (জার্মানি) একটি বিশ্ববিখ্যাত প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানে বর্তমানে তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার কর্মী নিযুক্ত রয়েছেন। ১৮৪৫ সালে ভেরনার সিমেন্স যে স্বপ্ন দেখেছিলেন বর্তমানে আমরা তাঁর সার্থক রূপায়ন দেখতে পাচ্ছি। ভিলহেল্‌ম সিমেন্সের প্রতিভার স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁর মৃত্যুর পর ১৮৮৩ সালে বৃটিশ সরকার লন্ডনের ওয়েস্টমিনস্টার অ্যাবিতে তাঁর শেষকৃত্য অনুষ্ঠান পূর্ণ রাজকীয় মর্যাদায় করেছিলেন। এটা ছিল একজন জার্মান নাগরিকের জন্য এক দুর্লভ সম্মান, কারণ ঐ অ্যাবিতে শুধুমাত্র ব্রিটিশ রাজপরিবারের সদস্যদের শেষকৃত্য হয়ে থাকে। ভিলহেল্‌মকে ইংল্যান্ডের মাটিতে সমাহিত করার প্রস্তাবও করা হয়েছিল, কিন্তু সেটা বাস্তবায়িত হয় নি। পরে একটি প্রস্তরফলকে তাঁর সম্বন্ধে প্রশংসা–উক্তি লিখে তাঁর স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য ঐ গীর্জায় রাখা হয়েছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হলে শত্রুদেশের লোক হিসেবে সেই স্মৃতিফলকটি নষ্ট করে ফেলা হয়। বর্তমান বিশ্বে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে সিমেন্স ভ্রাতৃত্রয় এক অবিনশ্বর প্রতিভা হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছেন, আর তাঁদের প্রতিষ্ঠিত সিমেন্স কোম্পানি এই ক্ষেত্রে আজো অগ্রণী ভূমিকা পালন করে চলেছে।

উইলিয়াম টমসন (লর্ড কেলভিন)

(১৮২৪–১৯৭০)

অংকশাস্ত্রবিদ, বিজ্ঞানী ও প্রকৌশলী

কিছু কিছু ব্যক্তিত্ব আছে যাঁদের সম্বন্ধে অনেক প্রশংসা করার পরও মনে হয় কিছুই বলা হয় নি। তাঁর সম্বন্ধে আরো কিছু বলা উচিত। তেমনি এক বিশাল ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন ব্রিটিশ বৈজ্ঞানিক, প্রযুক্তিবিদ ও অঙ্কশাস্ত্রবিদ উইলিয়াম টমসন কেলভিন। বিজ্ঞানী মহল অবশ্য তাঁকে লর্ড কেলভিন হিসেবেই জানে। ১৮২৪ সালের ২৬ জুন আয়ারল্যান্ডের বেলফাস্ট নগরীতে টমসনের জন্ম হয়। পিতা ছিলেন জেমস টমসন ও মাতা ছিলেন মার্গারেট টমসন। তিনি ছিলেন পিতামাতার সাত ছেলেমেয়ের মধ্যে চতুর্থ । তাঁর পিতা একজন বিখ্যাত অংকশাস্ত্রবিদ ছিলেন। স্ত্রীর অকালমৃত্যুতে ব্যথিত হৃদয়ে তিনি অবশিষ্ট জীবন শিক্ষকতায় ও ছেলেমেয়েদের মানুষ করার প্রচেষ্টায় নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন। উইলিয়াম টমসনের বয়স যখন সাত বছর তখন তাঁর পিতা গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ে অঙ্কশাস্ত্রের অধ্যাপক হিসেবে নিযুক্তি লাভ করেন। বড়ভাই জেমসের সাথে মাঝে মাঝে তিনি পিতার ক্লাসরুমে উপস্থিত হতেন এবং সেই ছোটবেলাতেই তিনি অংকশাস্ত্রে তাঁর বিস্ময়কর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছিলেন। একদিন ক্লাসে একটি জটিল অংকের সমাধান নিয়ে যখন সবাই ব্যতিব্যস্ত হয়ে খুব মাথা ঘামাচ্ছিল তখন হঠাৎ উইলিয়াম চিৎকার করে বলে উঠেছিল "বাবা, বাবা, আমি পারব"। পরবর্তীকালে দুই ভাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন। মাত্র বার বছর বয়সে ন্যাচারাল ফিলসফি বা প্রাকৃতিক দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়নকালে তিনি ইলেকট্রিসিটির দিকে খুবই আকৃষ্ট হন। পিতা তাঁদের শিখিয়েছিলেন যে, শুধুমাত্র পুঁথিগত বিদ্যাই যথেষ্ট নয়। একটি বিষয় সম্পর্কে পূর্ণজ্ঞান পেতে হলে এর ব্যবহারিক দিকটাও বুঝতে হবে। তখনকার দিনে সব রকম পড়াশুনা পুঁথিগত বা তাত্ত্বিক ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল, ফলে ব্যবহারিক শিক্ষার কোনো সুযোগই ছিল না। বড় ভাই–এর সহযোগিতায় তিনি একটি ঘর্ষণ বিদ্যুৎ–যন্ত্র ও একটি গ্যালভানিক ব্যাটারি তৈরি করেছিলেন। এতে উৎসাহিত হয়ে তিনি হাতের কাছে যা পেতেন তাই দিয়েই নিজের প্রয়োজন মতো এটাসেটা নিজের হাতে তৈরি করে নিতেন। এইভাবে ব্যবহারিক প্রয়োগক্ষেত্রে কুশলতা অর্জনের ফলে তিনি

বিদ্যুৎপ্রযুক্তির তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক উভয় ক্ষেত্রেই কুশলী আবিষ্কারক হিসেবে সাফল্য লাভ করতে পেরেছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের শেষ বর্ষে কুরিয়ারের সূত্রের প্রতি তিনি প্রবল আকর্ষণ অনুভব করেন এবং সেগুলো প্রয়োগ করে তিনি বিদ্যুৎ পরিবহনের ক্ষেত্রে বিরাজমান অনেক সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ফলে তিনি ঐ বিখ্যাত ফরাসি অংকশাস্ত্রবিদের একজন একনিষ্ঠ ভক্তে পরিণত হন। মাত্র ষোল বছর বয়সে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে তিনি তাঁর সহপাঠীদের মধ্যে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন। ১৮৪৫ সালে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করার পর দুই মাস প্যারিসের রেনন্ট ল্যাবরেটরিতে গবেষণা সহকারী হিসেবে কর্মরত থাকাকালে একজন গবেষকরূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার মানসিক ভিত্তি তাঁর রচিত হয়ে যায়। তিনি তৎকালীন বিখ্যাত ফরাসি অংকশাস্ত্রবিদদের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং তাপবিদ্যায় কার্ণোচক্রের (Carnot Cycle) উপর গভীরভাবে অধ্যয়ন করেন। এইভাবে অংকশাস্ত্র ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে থারমোডায়নামিকসের একজন বিস্ময়কর প্রতিভা হিসেবে তাঁর ভবিষ্যৎ ভিত্তি রচিত হয়েছিল। মাত্র বাইশ বছর বয়সে তিনি গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যাচারাল ফিলসফির অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং জীবনের তিপ্পান্নটি বছর একাদিক্রমে ঐ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ঐ পদে নিয়োগের ব্যাপারে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে অনেক ঝানু ও অভিজ্ঞ অধ্যাপক থাকা সত্ত্বেও তিনিই ঐ পদটি লাভ করেছিলেন। তাঁর এই সাফল্যে তাঁর পিতার বুক সেদিন আনন্দে ও গর্বে ফুলে উঠেছিল। পিতা-পুত্র দুইজন একই সাথে অধ্যাপনায় নিয়োজিত ছিলেন, কিন্তু মাত্র দুই বছর যেতে না যেতেই ১৮৪৯ সালে কলেরা মহামারীতে তাঁর মাতা আকস্মিকভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় পিতা ও পুত্র উভয়েই মানসিকভাবে দারুণ বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন।

অত্যন্ত মেধাবী ও তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও একজন শিক্ষক হিসেবে তিনিখুব একটা খ্যাতি অর্জন করতে সক্ষম হন নি, কারণ অধ্যাপনাকালে হঠাৎ কোনো সমস্যার কথা তাঁর মনে উদয় হওয়া মাত্র তিনি অধ্যাপনা ফেলে সেটা নিয়ে গভীরভাবে ডুবে যেতেন। তবু তাঁর সুমধুর ব্যক্তিত্বের জন্য ছাত্ররা তাঁকে খুবই মানতো ও শ্রদ্ধা করতো। শিক্ষকতায় তিনি একটি অনন্যসাধারণ নিয়মের প্রবর্তন করেছিলেন। সেটি হলো ছাত্রদের জন্য ব্যবহারিক ক্লাসের প্রবর্তন করা, অর্থাৎ তিনি যেটা পড়াতেন পরীক্ষাগারে হাতেকলমে ছাত্রদেরকে সেটা করাতেন। এটা ছিল গ্রেট-বৃটেনের ইতিহাসে সর্বপ্রথম ব্যবহারিক পরীক্ষাগার। ১৮৫০ সালে বাড়ির মাটির নিচের ঘরে যেখানে মদ রাখা হতো (Celler) সেই ঘরকে তিনি তাঁর ছাত্রদের জন্য পরীক্ষাগারে রূপান্তরিত করেছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি যখন নিজের নানারূপ পরীক্ষামূলক গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন তখন ঐ ঘরটিকেই ব্যবহার করতেন। ঐ ঘরে

কাজ করেই তিনি সত্তরটি পেটেন্টের অধিকারী হয়েছিলেন। ফলে তিনি কোম্পানির পরিচালক, সম্মান ও প্রচুর অর্থের অধিকারী হয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুর সময় তিনি এক লক্ষ বাষট্টি হাজার পাউন্ড মূল্যের সম্পত্তি রেখে যান, যা ১৯০৭ সালের দিকে সত্যিই বিরাট এক সম্পদ ছিল।

সুদীর্ঘ গবেষণা জীবনে তিনি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উভয় ক্ষেত্রেই অনেক মূল্যবান অবদান রেখে গিয়েছেন। এগুলোর মধ্যে থারমোডায়নামিক্স, ইলেকট্রিক্যাল থিওরি, সাবমেরিন টেলিগ্রাফি, প্রিসিশন ইনস্ট্রুমেন্টস, সিস্টেম অফ ইউনিট এবং মেরিন কম্পাসের উন্নয়ন উল্লেখযোগ্য। তাঁর উন্নয়নকৃত নতুন কম্পাসের মধ্যে তিনি চুম্বক ও নরম লোহা ব্যবহার করে এটার উপর লোহার তৈরি জাহাজের নিজস্ব চুম্বকক্ষেত্রের প্রভাব নিষ্ক্রিয় করতে সক্ষম হয়েছিলেন। প্রথম তৈরি কম্পাসটি দেখতে এত বেশি বিদঘুটে হয়েছিল যে ওটা দেখে তৎকালীন বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী রয়েল মন্তব্য করেছিলেন যে, ঐরূপ আজবযন্ত্র দিয়ে কোনো কাজই করা সম্ভব হবে না। জবাবে তিনি বলেন, "ওটাতো শুধুমাত্র জ্যোতির্বিদ রয়েলের মন্তব্য।" অর্থাৎ তিনি তাঁর নিজস্ব উদ্ভাবিত পদ্ধতির উপর এত বেশি আস্থাশীল ছিলেন যে, কারো বিরূপ মন্তব্যে তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত হতেন না। সমস্ত জীবনের ক্লান্তিহীন সাধনা ও নিরলস পরিশ্রম দ্বারা তিনি থারমোডায়নামিক্সকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অন্যতম মূল স্তম্ভে পরিণত করতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং এই ক্ষেত্রে তাঁর একক অবদান বিশ্ব ইতিহাসের পাতায় তাঁকে অমর করে রাখার জন্য যথেষ্ট ছিল। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক জে.পি. জুল যখন তাঁর আবিষ্কৃত সূত্রের বাস্তব প্রমাণ করতে গিয়ে খুব কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হয়ে বেশ হাবুডুবু খাচ্ছিলেন তখন উইলিয়াম সে সমস্যার সুন্দর সমাধান করে দিয়েছিলেন। বস্তুর শক্তি শূন্য গতিশীলতার (zero energy of motion) একটি নতুন ধারণা দিয়ে তিনি বলেছিলেন যে, ২৭৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় এটা সম্ভব হতে পারে এবং তাই ২৭৩ ডিগ্রি তাপমাত্রাকে পরম শূন্য তাপমাত্রা গণ্য করা যায়। ১৮৫১ সালে তিনি থারমোডায়নামিকসের বিখ্যাত দ্বিতীয় সূত্রটি আবিষ্কার করেছিলেন। তাঁর উদ্ভাবিত ঐ সূত্রটি পরে আর জে.ই. ক্লাসিয়াস কর্তৃক আরো পরিবর্ধিত হয়েছিল। 'এনট্রপি' শব্দটি বিজ্ঞানী ক্লসিয়াসের অবদান। ১৮৫৬ সালের দিকে উইলিয়াম বিশ্ববাসীকে একটি সম্পূর্ণ নতুন শব্দ উপহার দিয়েছিলেন সেটি হলো গতিশক্তি (Kinetic energy)। একজন তরুণ প্রকৌশলী হিসেবেও তাঁর অবদান কোনো অংশে কম ছিল না। বিশেষ করে ইলেকট্রিক্যাল থিওরি ও প্র্যাকটিস এবং সাবমেরিন টেলিগ্রাফির উন্নয়নে তাঁর অবদান অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। ১৮৫০ সালের মাঝামাঝি আটলান্টিক মহাসাগরের মধ্য দিয়ে সাবমেরিন কেবল বসানোর অর্থাৎ ইউরোপ ও আমেরিকার মধ্যে টেলি–

যোগাযোগ ব্যবস্থার সংযোগ সাধনের কথা চিন্তা করা হয়। এটা উনবিংশ শতাব্দীর প্রকৌশলীদের জন্য একটি বিরাট চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছিল, অনেকটা চন্দ্রে মানুষ পাঠানোর মতো চ্যালেঞ্জ। নানা প্রকার প্রযুক্তিগত ও পরিবেশগত বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে ঐ প্রকল্পে যে সাফল্য অর্জিত হয় তাঁর পেছনে টমসনের বিরাট অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ব্রিটিশ সরকার ১৮৬৬ সালে তাঁকে 'নাইট' উপাধিতে ভূষিত করে।

আটলান্টিকের তলদেশ দিয়ে প্রথম সাবমেরিন কেবল বসানোর পরে একটি মারাত্মক অসুবিধা দেখা দিয়েছিল। পানির ভিতরে ডুবেথাকা ইনসুলেটেড কেবলের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত সংকেতের গতিবেগ ভূপৃষ্ঠের উপরে অবস্থিত খোলা কেবলের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত সংকেতের গতিবেগের চেয়ে অপেক্ষাকৃত মন্থর ছিল। তিনি এবং বৈজ্ঞানিক মাইকেল ফ্যারাডে গবেষণা করে এর কারণ নির্ণয় করে বলে ছিলেন যে, কেবলের নিজস্ব অন্তর্নিহিত ক্যাপাসিটেন্স ও রেজিসটেন্সের জন্য এটা হয়ে থাকে। সাবমেরিন কেবলের ভিতর দিয়ে একটি বৈদ্যুতিক পালস পাঠানোর প্রক্রিয়া এবং একটি খুব লম্বা ক্যাপাসিটরকে চার্জিং ও ডিসচার্জিং করার প্রক্রিয়া একইরকম বলে মনে করা যেতে পারে। তিনি বিভিন্ন প্রকার অংক কষে দেখিয়েছিলেন যে, পরিবাহিত পালস এটার সর্বোচ্চ উচ্চতায় (maximum amplitude) উঠতে কিছু সময় নিয়ে থাকে এবং বিলয় (decay) হতেও কিছু সময় নিয়ে থাকে এবং এই সময়ের পরিমাণ কেবলের দৈর্ঘ্যের বর্গের অনুপাতে হয়। কেবলের অন্তর্নিহিত রেজিসটেন্স ও ক্যাপাসিটেন্সের গুণফল অর্থাৎ R X C (time constant) একটি অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। তাই তিনি যখন আটলান্টিক টেলিগ্রাফ কোম্পানির পরিচালক হিসেবে যোগদান করেছিলেন তখন তাঁর প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব ছিল কেবল তৈরিকালে এটার অর্ন্তনিহিত রেজিসটেন্স ও ক্যাপাসিটেন্সের মান যথাসম্ভব কম রাখা। এটা করতে গিয়ে কেবলের তামার পরিমাণ কখনো কখনো শতকরা পঞ্চাশ ভাগ কমাতে হয়েছিল।

তিনি অংকশাস্ত্রে তাঁর অদ্ভুত দক্ষতার সাহায্যে প্রমাণ করেছিলেন যে, আটলান্টিক সাবমেরিন কেবলের সাহায্যে সংবাদ যোগাযোগ ব্যবস্থা কিছুটা মন্থর গতির হলেও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে এটা খুবই লাভজনক হবে। সাধারণভাবে প্রচলিত টেলিগ্রাফ যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা সমীচীন মনে না করায় তিনি নিজেই একটি নতুন ধরনের যন্ত্র তৈরি করেছিলেন, এটাকে বলা হতো মিরর গ্যালভানোমিটার। ১৮৫৮ সালে সমুদ্রতলে কেবল বসানোর সময় এই যন্ত্রটি খুবই সাহায্য করেছিল। কেবলের মধ্যদিয়ে, টেলিগ্রাফ পাঠানো শুরু হলে দেখা গেলো যে নিচু শক্তিসম্পন্ন ট্রান্সমিটার এবং মিরর-গ্যালভানোমিটার তেমন কাজে আসছে না। তখন তিনি নিজেই উদ্যোগী

হয়ে উচ্চশক্তিসম্পন্ন ট্রান্সমিটার (এতে ইনডাকশান কয়েল ব্যবহার করা হয়েছিল) ও নতুন ধরনের টেলিগ্রাফ–ডিটেক্টর তৈরি করেছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, যখনই কেবলের ভিতর দিয়ে দুই কিলোভোল্ট প্রয়োগ করা হয় তখন কেবলের ইনসুলেশন নষ্ট হয়ে যায়। লোহিত সাগরে স্থাপিত কেবলটি নষ্ট হয়ে যাওয়ায় ব্রিটিশ সরকার একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছিলেন। আটলান্টিক মহাসাগরে কেবল বসানোর পরেও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়ে কেবলটি নষ্ট হয়ে যায়। ঐ বিশেষ তদন্ত কমিটির সদস্য হিসেবে টমসন ও বিজ্ঞানী হুইটস্টোন ১৮৬১ সালে তাঁদের রিপোর্ট পেশ করেন। স্থাপিত এগার হাজার মাইল দীর্ঘ কেবলের মধ্যে মাত্র তিন শত মাইল কার্যক্ষম ছিল। ঐ বিশেষ কমিটির তদন্তের ফলে অনেক নতুন তথ্য উদ্‌ঘাটিত হয়, যেমন ইলেকট্রিক্যাল ট্রান্সমিশন বা বিদ্যুৎ–পরিবহণ, তামার পরিবাহিতার উপর খাদের প্রভাব, কেবলের ডিজাইন, সর্বোৎকৃষ্ট প্রক্রিয়ায় কেবল উৎপাদন এবং এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পরিবহণকালে যথাযথভাবে যত্ন নেওয়া ইত্যাদি সম্বন্ধে অনেক অজানা তথ্য জানা সম্ভব হয়েছিল। ১৮৬৫ সালে কেবল বসানোর সময় মাত্র ছয় শত মাইল অবশিষ্ট থাকা অবস্থায় অর্থাৎ দশ হাজার চার শত মাইল কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর ঐ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। পরবর্তী বছরে আরেকটি সম্পূর্ণ নতুন লাইন বসানো হয়েছিল এবং ত্রুটিপূর্ণ পুরনো লাইনটি মেরামত করা হয়, ফলে দুটি কেবলের মাধ্যমে ইউরোপ ও আমেরিকা পরস্পর যুক্ত হয়েছিল এবং আজ পর্যন্ত ঐ কেবল দুটো কাজ করে যাচ্ছে। ১৯৮৯ সালে অবশ্য TAT বা (Transatlantic Transmission) নামে অপটিক্যাল ফাইবারের কেবল বসানো হয়েছে। যা হোক, ঐ কেবল দুটি বসানোর সময় কেলভিন নিজে উপস্থিত থেকে কেবল বসানোর কাজের তদারকি করেছিলেন। সাবমেরিন টেলিগ্রাফির উন্নতিকল্পে তিনি দুটি নতুন যন্ত্র আবিষ্কার করেছিলেন। একটি সম্বন্ধে পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, সেটির নাম মিরর গ্যালভানোমিটার। দ্বিতীয়টি হচ্ছে সাইফন রেকর্ডার। প্রথমটি হচ্ছে ঘূর্ণায়মান লোহার যন্ত্র, যাতে একটি ক্ষুদ্রাকৃতির আয়না একটি খুব সরু ও সূক্ষ্ম ইস্পাতের সূচকের সাথে যুক্ত করা আছে। একত্রে ঐ দুটোর ওজন হচ্ছে মাত্র একশত মিলিগ্রাম। একটি অত্যন্ত সরু আলোর রেখা ঐ আয়নায় প্রতিফলিত হয়ে প্রায় ওজনহীন ও লম্বাকৃতি সূচকের কাজ করতো। ফলে এর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত অত্যন্ত স্বল্প পরিমাণ বিদ্যুতের উপস্থিতিও নির্ণয় করা সম্ভব। লেটিমার ক্লার্ক নামক একজন টেলিগ্রাফ ইঞ্জিনিয়ার আটলান্টিক কেবলের ভিতর দিয়ে খুব নিম্ন শক্তির বিদ্যুৎ সিগনাল প্রেরণ করে অপর প্রান্তে সেটার উপস্থিতি নির্ণয় করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর আবিষ্কৃত দ্বিতীয় যন্ত্রটি ছিল সাইফন রেকর্ডার, যার সাহায্যে ধারণকৃত বার্তা স্থায়ীভাবে রেকর্ড করা যেতো। ১৮৬৭ সালে তিনি

ওটার পেটেন্ট লাভ করেন। একটি ক্যাপিলারি টিউব থেকে নির্গত কালির ঝর্ণাধারার সাহায্যে কাগজের উপর ধারণকৃত সংবাদ রেকর্ড করা হতো। একটি মুভিং কয়েল ডিটেক্টরের সাহায্যে ক্যাপিলারি টিউবটিকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হতো যে, ধারণকৃত সংবাদ ক্যাপিলারি টিউব থেকে নির্গত কালির গতি নিয়ন্ত্রণ করে কাগজের উপর আঁকাবাঁকা লাইনের ছাপ দিয়ে সংবাদটি রেকর্ড করতো। তিনিই সর্বপ্রথম মুভিং আয়রনের বদলে মুভিং কয়েলের প্রবর্তন করেছিলেন। মেজারমেন্ট বা পরিমাপ ব্যবস্থায় তাঁর উৎসাহের ফলে ১৮৬১ সালে ব্রিটিশ এসোসিয়েশন কমিটির প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং বিজ্ঞানী গাউস ও ওয়েবারের রেখে যাওয়া ফলাফলকে গ্রহণ করে ইলেকট্রিক্যাল ও ম্যাগনেটিক প্রযুক্তির ক্ষেত্রে এক নতুন এককের (unit) উদ্ভাবন করা হয়েছিল।

উইলিয়াম টমসন ওরফে লর্ড কেলভিন ছিলেন উনবিংশ শতাব্দীর একজন শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক। ১৮৯২ সালে তাঁকে ব্যারন কেলভিন অফ লার্গ উপাধিতে ভূষিত করা হয়। তাঁর নামে তাপমাত্রার পরম স্কেলের নামকরণ করা হয় (কেলভিন একক)। তিনি রয়্যাল সোসাইটি ও ইনস্টিটিউশন অফ ইঞ্জিনিয়ার্সের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯০২ সালে তিনি ইংল্যান্ডের প্রিভি কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। সারা জীবন বিজ্ঞানের সাধনা করে ও বিভিন্ন বৈপ্লবিক ধারণার প্রবর্তন করে বৃদ্ধ বয়সে তিনি কিছুটা রক্ষণশীল মনোভাবাপন্ন হয়ে পড়েছিলেন। তিনি বিজ্ঞানী ম্যাকসওয়েলের বিদ্যুৎচৌম্বক তত্ত্ব সম্বন্ধে খুবই সন্দিহান ছিলেন এবং এক পর্যায়ে মন্তব্য করেছিলেন, "ঐ তত্ত্ব হচ্ছে নিজের অজ্ঞতাকে অংকের ফর্মূলায় ঢেকে রাখার ব্যর্থ প্রয়াস মাত্র।" তিনি এ.সি. বিদ্যুৎপ্রবাহের চেয়ে ডি.সি. বিদ্যুৎপ্রবাহ ব্যবহারের পক্ষে ছিলেন এবং কম্যুটেটরকে (যেটা এ.সি.কে ডি.সি.তে পরিবর্তিত করে) একটি ভয়াবহ জিনিস বলে উল্লেখ করে গেছেন। অপরদিকে তিনিই সর্বপ্রথম তাঁর বাড়িতে নতুন উদ্ভাবিত বৈদ্যুতিক বালব লাগিয়েছিলেন। ১৮৯৮ সালে উইট দ্বীপের এলান বে নামক স্থানে বিজ্ঞানী মার্কনি কর্তৃক পরীক্ষামূলকভাবে স্থাপিত রেডিও স্টেশন পরিদর্শনকালে তিনি সেই দ্বীপ থেকে মূল ভূখণ্ডে তাঁর সহযোগী ইঞ্জিনিয়ারদের কিছু সংবাদ পাঠিয়েছিলেন এবং ঐ সংবাদ প্রেরণ বাবদ কিছু টাকা জোর করে মার্কনিকে দিয়েছিলেন। নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও মার্কনি সে টাকা গ্রহণ করেন, ফলে মার্কনি কোম্পানির দলিলপত্র অনুযায়ী এটাই ছিল বাণিজ্যিক ভিত্তিতে প্রেরিত সর্বপ্রথম টেলিগ্রাম। অর্থাৎ বিশ্বের সর্বপ্রথম রেডিও টেলিগ্রাম প্রেরণকারী হিসেবে লর্ড কেলভিন ইতিহাসের পাতায় অমর হয়ে আছেন। টেলিগ্রামটি ছিল নিম্নরূপ–

বোর্নমাউথ বিকাল ২টা ৩০ মিনিট গ্রহণ সময় বিকাল ৩টা ৩০ মিনিট ম্যালকম ফিজিক্যাল ল্যাবরেটরি, গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়। "স্মিথকে বলবেন যে এটা বাণিজ্যিক রেডিও স্টেশন থেকে ইথারের মাধ্যমে এলান বে থেকে বোর্নমাউথে এবং পোস্টাল টেলিগ্রামের মারফত বোর্নমাউথ থেকে গ্লাসগোতে পাঠানো হয়েছে।" কেলভিন (মার্কনির কোম্পানির ফাইলে এই টেলিগ্রাম সযত্নে সংরক্ষিত আছে।

১৯০৭ সালে মৃত্যুর পর তাঁকে লন্ডনের ওয়েস্টমিনস্টার অ্যাবিতে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক স্যার আইজাক নিউটনের পাশে সমাহিত করা হয়। খুব কম ইঞ্জিনিয়ারই এরূপ দুর্লভ সম্মানের অধিকারী হতে পেরেছিলেন। একাধারে অংকশাস্ত্রবিদ, বিজ্ঞানী ও প্রকৌশলী উইলিয়াম মাত্র সাত বছর বয়সে যে চমক লাগানো প্রতিভার স্ফুরণ ঘটিয়েছিলেন বাকি জীবন সেই প্রতিভার অমর স্বাক্ষর রেখে গেছেন মানব সভ্যতার ইতিহাসে এক বিশেষ অধ্যায়ের সূচনা করে।

অলিভার হেভিসাইড

(১৮৫০–১৯২৫)

ইনডাকটেন্সের অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিভা

অলিভার হেভিসাইড ছিলেন একজন অসামান্য প্রতিভার অধিকারী বিজ্ঞানী। লোকে তাঁকে নানাভাবে বর্ণনা করতো, যেমন হাস্যরসিক, অদ্ভুত খামখেয়ালী, পাগলাটে মেজাজের অধিকারী, অতি সাধারণ জীবন যাপনকারী একজন বুড়ো ভদ্রলোক, এবং একজন অতি সাধু ব্যক্তি। তিনি ছিলেন সমপূর্ণরূপে নিজের চেষ্টায় গড়ে ওঠা এক বিরল প্রতিভা। একজন অঙ্কশাস্ত্রবিদ ও সেই সাথে একজন পদার্থবিদ হিসেবে তিনি অনন্যসাধারণ দক্ষতার অধিকারী ছিলেন। তাঁর আবিষ্কারের ফলে দূরদূরান্তে টেলিফোনে কথা বলা সম্ভব হয়েছিল। সেই যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ অংকশাস্ত্রবিদেরা ও পদার্থবিদেরা তাঁর রচিত প্রবন্ধ বুঝতে গিয়ে ভীষণ হিমসিম খেতেন। এমনকি প্রকাশকেরা পর্যন্ত তাঁর ঐ সমস্ত সুগভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধগুলি প্রকাশ করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করতেন। তবে প্রযুক্তিবিদদের নিকট তাঁর গবেষণা নিবন্ধগুলো ছিল খুবই বাস্তবসম্মত। তিনি সেই যুগের অঙ্কশাস্ত্রবিদদের (যাদেরকে তিনি গজিয়ে ওঠা ব্যাঙের ছাতা বলতেন) ও পদার্থবিদদের কঠোর সমালোচক ছিলেন। অঙ্কে ব্যবহৃত 4π এককটিকে তিনি বাহুল্য বলে বর্ণনা করেছেন। সম্ভবত তিনিই সর্বপ্রথম নেগেটিভ রেজিসটেন্সের ধারণা দিয়েছিলেন, ভেকটর ক্যালকুলাস ব্যবহারকারী প্রথম সারির ইঞ্জিনিয়ারদের মধ্যে একজন ছিলেন এবং নিজের উদ্ভাবিত ক্যালকুলাসে প্রতীক চিহ্ন (scalar) ব্যবহার করতেন। সর্বপ্রথম তিনিই ধারণা দিয়েছিলেন যে সম্প্রচারিত রেডিও ওয়েভ প্রতিফলনকারী একটি বিশেষ স্তর উর্ধ্বাকাশে প্রাকৃতিকভাবে বিরাজমান রয়েছে এবং তিনিই সর্বপ্রথম স্কিন–এফেকট সম্বন্ধে পরিষ্কার বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি বিজ্ঞানী ম্যাক্সওয়েলের ইলেকট্রোম্যাগনেটিক থিওরির অত্যন্ত কঠিন বিশ্লেষণ বাদ দিয়ে অতি সহজ বিশ্লেষণপদ্ধতির উদ্ভাবন করেছিলেন যা ম্যাক্সওয়েল স্বয়ং বহু চেষ্টা করেও করতে পারেন নি। তবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান হলো যে তিনিই সর্বপ্রথম ধারণা দিয়ে প্রমাণ করেছিলেন যে টেলিফোন যোগাযোগ ব্যবস্থায় ইনডাকটান্সের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তাঁর ব্যতিক্রমধর্মী চিন্তাধারা, সর্বসাধারণের বোধের অগম্য কথাবার্তা এবং বৈপ্লবিক আবিষ্কার ইত্যাদির

সামাজিক স্বীকৃতি পেতে তাঁকে অনেক কষ্ট পেতে হয়েছে। পরে যখন তাঁকে অনেক অনেক সম্মানে ভূষিত করা হচ্ছিল তখন তিনি তাঁর মানসিক প্রতিক্রিয়া এই বলে ব্যক্ত করেছিলেন যে, তাঁকে বোধহয় তাঁর প্রাপ্যের চেয়ে বেশি সম্মান দেয়া হচ্ছে–যত বেশি সম্মান পাওয়া যায় মানুষ হিসেবে তার মূল্য ততখানি কমে যায়। টাকার মূল্যমান কমে যাওয়ার মতো সম্মানও মানুষের মূল্য কমিয়ে দেয়। তাঁর মতে একজন মানুষের প্রতিভার স্বীকৃতিস্বরূপ দুই একটি সম্মানজনক উপাধিই যথেষ্ট, এবং তবু তাঁকে যতগুলো উপাধি দেয়া হয়েছিল তিনি সবকটি গ্রহণ করেছিলেন। এগুলোর মধ্যে ইনস্টিটিউট অফ ইঞ্জিনিয়ার্স প্রদত্ত ফ্যারাডে স্মৃতিপদক পেয়ে তিনি সবচেয়ে বেশি খুশি হয়েছিলেন কারণ ঐ বিশেষ পদকটি সর্বপ্রথম তাঁকেই দেয়া হয়েছিল এবং তাঁকে বিশেষভাবে সম্মানিত করার জন্য ঐ বিশেষ পদকটির প্রচলন করা হয়েছিল। তাঁকে রয়েল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত করা হয়েছিল। তাঁর স্বভাবসিদ্ধ হাস্যকৌতুক করতে গিয়ে তিনি একবার লিখেছিলেন যে, তিনি তাঁর নামের শেষে লেজুড় হিসেবে FRS (Fellow of the Royal Society) আর লিখবেন না, কারণ FRS–এর চেয়ে একটি সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি অনেক ভালো।

লন্ডন শহরের কেমডেন এলাকায় ১৮৫০ সালের ১৮ মে অলিভার হেভিসাইড জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন পিতা টমসন ও মাতা রেকেল এলিজাবেথের চতুর্থ সন্তান। পিতামাতা উভয়েই তাঁদের জীবদ্দশাতেই তাঁদের সন্তানের সাফল্য ও সম্মানের কিছু অংশ দেখে যেতে পেরেছিলেন। তবে তাঁর শৈশব সম্বন্ধে খুব কমই জানা যায়। পারিবারিক ঐতিহ্যের অধিকারী হিসেবে তিনি নিজে ভাল ছবি আঁকতে পারতেন এবং তাঁর বাল্যকালের, সম্ভবত এগার বছর বয়সে, অঙ্কিত একটি চিত্র এখনো রক্ষিত আছে। ছবি তোলার ক্যামেরা আবিষ্কার হওয়ার পর সেটা চিত্রকরদের জীবিকার উপর প্রচণ্ড আঘাত হেনেছিল, ফলে তাঁর গোটা পরিবার পৈতৃক আবাসভূমি ছেড়ে ১৮৪৯ সালে লন্ডন শহরে নতুন করে বসতি স্থাপন করেছিল। স্থানীয় কেমডেন স্কুল থেকে পনের বছর বয়সে পঞ্চম স্থান অধিকার করে তিনি স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন এবং সেই সাথে বিজ্ঞান প্রতিযোগিতায় জয়ী হয়ে ন্যাচারাল সাইন্স পুরস্কার লাভ করেছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করার সৌভাগ্য তাঁর হয় নি। পরবর্তীকালে সম্পূর্ণরূপে নিজের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা, সাধনা ও অধ্যবসায়ের বলে অঙ্কশাস্ত্র, পদার্থবিদ্যা ও ইঞ্জিনিয়ারিং–এ তিনি বিশেষ বুৎপত্তি লাভ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। বিশ বছর বয়সে তাঁর জ্ঞানানুরাগ এত বেশি হয়েছিল যে তিনি তাঁর ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করে দিনরাত শুধু বই নিয়ে পড়াশুনা করতেন। চিলেকোঠায় আলোর অভাবের দরুন তেলের প্রদীপ জ্বালিয়ে দিনের বেলায় পড়তেন। নিরলস পরিশ্রম, কঠিন অধ্যবসায় ও বিরামহীন সাধনার

ফলে তিনি বিরল পাণ্ডিত্যের অধিকারী হয়েছিলেন এবং ইঞ্জিনিয়ারিং–এ তাঁর অমর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন। ১৮৬৬ থেকে ১৮৭৪–এর মাঝামাঝি সময়ে তিনি ডেনিশ কেবল ও গ্রেট নদার্ন টেলিগ্রাফ কোম্পানিতে কর্মরত ছিলেন, পরে তিনি নিউ ক্যাসেল আপন টাইন নামক শহরের সাবমেরিন কেবলের প্রিন্সিপাল অপারেটর নিযুক্ত হন। তাঁর ভাই একই শহরের পোস্ট অফিসের ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। তাঁরা দুই ভাই মিলে তখন ডুপ্লেক্স টেলিগ্রাফির গবেষণা করতেন। তাঁর আত্মকেন্দ্রিক আচরণের কারণ ছিল সম্ভবত এই যে, তিনি বধির ছিলেন এবং তাঁর নাসিকায় ঘ্রাণশক্তি ছিল না। কিছু দিনের জন্য তাঁর এই বধিরতা দূর হয়েছিল, কিন্তু পরে আবার বধির হয়ে যান। ভ্রমণ করা, গান গাওয়া, পাইপের সাহায্যে ধূমপান ও সাইকেলে চড়ে বেড়ানো তাঁর খুব পছন্দের ছিল। মদ্য পান করাকে তিন অত্যন্ত ঘৃণা করতেন। ১৮৮৯ সালে তাঁর পিতা–মাতা ডেভনের পেইংটনে বসতি স্থাপন করেন এবং তাঁদের মৃত্যুর পর তিনি নিউটন অ্যাবোট শহরে একটি ভাড়া বাড়িতে একাকী নির্জনে বাস করতেন। ১৯০৯ থেকে ১৯১৯ সাল পর্যন্ত তিনি ঐ ভাড়াটে বাড়িতেই ছিলেন। বন্ধুবান্ধবেরা তাঁর জন্য ভাল বাড়ির ব্যবস্থা করে দেয়া সত্ত্বেও তিনি এই বাড়িটি ছেড়ে যেতে রাজি হন নি, পরে অবশ্য তিনি এই বাড়িটি কিনে নিয়েছিলেন। সেইখানে তিনি ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়েই তাত্ত্বিক গবেষণা চালিয়ে যেতে থাকেন। তিনি লোকসমাজে মেলামেশা করতেন না। তাঁর খাবার–দাবার ও নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র একজন স্থানীয় পুলিশ কিনে দিতেন। পুলিশটি দরজার ফাঁক দিয়ে বাঁশি বাজিয়ে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন। তাঁর বাড়িটি খুবই সাধারণ ও বাহুল্যবর্জিত আসবাবপত্রে সাজানো ছিল। ধীরে ধীরে তিনি সবার নিকট একজন বিজ্ঞানী গুরু হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। বিভিন্ন দেশের পণ্ডিত, বিজ্ঞানী, গবেষকরা পত্রের মাধ্যমে তাঁর সাথে যোগাযোগ করতেন। এঁদের কয়েকজনের সাথে তাঁর গভীর বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। বিখ্যাত জার্মান বিজ্ঞানী হাইনরিখ হার্স তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানীরা তাঁর বাড়িকে "সাধুর অমর আস্তানা" নাম দিয়েছিলেন। স্থানীয় পোস্ট অফিসও তাঁর এই উপাধিকে খুবই সম্মান করতো এবং চিঠির উপর "সাধুর অমর আস্তানা" কথাটি লেখা থাকলে সেটা যথাসময়ে যথাস্থানে ঠিক ঠিক পৌঁছে দেয়া হতো।

বাইশ বছর বয়সে "দি ইংলিশ মেকানিক" নামক জার্নালে তাঁর প্রথম গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। মাত্র এক বছর পরেই তৎকালীন বিখ্যাত জার্নাল " দি ফিলসফিক্যাল ম্যাগাজিন"–এ হুইটস্টোন প্রিন্সিপলের সর্বাপেক্ষা বাস্তব প্রয়োগ সম্বন্ধে তাঁর একটি নিবন্ধ ছাপা হয়। ঐ নিবন্ধে তিনি হুইটস্টোন ব্রিজের নামকরণ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন এবং অনেকগুলো শব্দের যৌক্তিকতা নিয়ে তাঁর অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছিলেন। এইভাবে নামকরণ নিয়ে তাঁর সযত্ন ও আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ তিনি

পরবর্তীতে অনেক নতুন শব্দের প্রবর্তন করে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং–এর ক্ষেত্রে তাঁর নামকরণের অমর প্রতিভার অনন্য স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ রেজিসটিভিটি কনডাকটেন্স, ইনডাকটেন্স, পারমিটিভিটি, ইমপিডেন্স, এডমিটেন্স, ডিসটরশন ইত্যাদি শব্দ তাঁরই তৈরি। অঙ্কশাস্ত্রে ভেকটর ক্ষেত্রে 'CURL' শব্দটি ব্যবহার করার জন্য বিজ্ঞানী ম্যাক্সওয়েল সুপারিশ করে গিয়েছিলেন। সেটি গ্রহণ করে তিনি আন্তর্জাতিকভাবে এর প্রচলন করেন, যার জন্য বিখ্যাত বিজ্ঞানী লর্ড কেলভিন খুবই দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন কারণ তাঁর ইচ্ছা ছিল 'CURL' শব্দটির পরিবর্তে স্পিন (Spin) অথবা রোটেশন (rotation) ব্যবহার করা হোক। যতই দিন যাচ্ছিল তাঁর লেখা ততই জটিল হতে জটিলতর হচ্ছিল। একজন পত্রিকা সম্পাদক তাঁকে চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন যে তাঁর ভাষা বোঝার ক্ষমতা শুধুমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদেরই আছে, ফলে শুধুমাত্র অধ্যাপক–পাঠকদের উপর নির্ভর করে কোনো বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের পক্ষে পত্রিকা বের করা সম্ভব নয়। সৌভাগ্যবশত "দি ইলেকট্রিশিয়ান" পত্রিকার সম্পাদক দুঃসাহসিক পদক্ষেপ নিয়ে তাঁর প্রবন্ধগুলো গ্রহণ করেছিলেন। ঐ পত্রিকায় ১৮৮২ হতে ১৮৮৭ সাল পর্যন্ত পাঁচশত পৃষ্ঠা কলেবরে তাঁর প্রবন্ধগুলো ছাপা হয়। পরে তাঁর রচিত বিভিন্ন প্রবন্ধের সংকলন গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এরকম একটি সংকলন–গ্রন্থ হলো ১৮৯২ সনে প্রকাশিত "দি ইলেকট্রিক্যাল পেপারস," এটি দুই খণ্ডে প্রকাশিত। আরেকটি হলো ১৮৯৩ থেকে ১৯১২ সালের মধ্যে প্রকাশিত "ইলেকট্রোম্যাগনেটিক থিওরি"। এটি তিন খণ্ডে প্রকাশিত হয়। বিভিন্ন পত্রিকার সম্পাদকেরা তাঁর ভাষাকে একটু সহজবোধ্য করে লেখার জন্য বিনীত অনুরোধ জানাতেন। সম্পাদকেরা তাঁর অঙ্কশাস্ত্রের উপর কোনো প্রকার মন্তব্য করতেন না, কিন্তু ফিজিক্সের বেলায় তাঁদের মন্তব্য ছিল যে ওটা এতোই কঠিন যে সময় সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকেরা পর্যন্ত সেগুলো বুঝতে হিমসিম খেয়ে যেতেন। একজন সম্পাদকের অনুরোধের জবাবে তিনি জানিয়েছিলেন যে, তিনি ভবিষ্যত বংশধরদের জন্য লিখছেন না, বর্তমান অজ্ঞ বংশধরদের জ্ঞানের পরিধির বিস্তৃতির জন্য লিখছেন। এ প্রসঙ্গে বিজ্ঞানী হার্ডস মন্তব্য করেছিলেন যে, হেভিসাইডের চিঠিতে তবুও কিছু বুঝা যায়, কিন্তু তাঁর লেখা বই পড়ে কিছু বুঝা সত্যিই বেশ কঠিন। একজন প্রকৌশলী তাঁকে সহজ সরল ভাষায় একটি বই লেখার জন্য অনুরোধ জানিয়েছিলেন এবং সাথে বইটির একটি নামও প্রস্তাব করেছিলেন–"বোকাদের জন্য"।

১৮৮৯ সালে তিনি তাঁর প্রতিভার প্রথম স্বীকৃতি পেয়েছিলেন। লণ্ডনের সোসাইটি অফ টেলিগ্রাফ ইঞ্জিনিয়ার্স যখন নাম বদলে নতুন নামকরণ করেছিল "ইনস্টিটিউট অফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার্স"। তখন সেই সমাবর্তন উৎসবে লর্ড কেলভিন তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে বলেছিলেন যে, তিনি তাঁর উদ্ভাবিত টেলিগ্রাফ সমীকরণে ইনডাকটেন্সের

ভূমিকা সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করেছিলেন। ফলে ওটা ছিল একটি অসম্পূর্ণ প্রযুক্তি কিন্তু হেভিসাইড সেই ইনডাকটেন্সের ভূমিকা অন্তর্ভুক্ত করে তাঁর সমীকরণকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দিয়েছেন। এইভাবে হেভিসাইড সর্বপ্রথম আন্তর্জাতিক পরিচিতি লাভ করেছিলেন। দীর্ঘ টেলিফোন লাইনের মাধ্যমে বিভিন্ন ফ্রিকোয়েন্সি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে পৌছাঁনোর ফলে অনেক দূরে টেলিযোগাযোগ খুবই সুবিধাজনক হয়ে পড়ে। তিনি প্রমাণ করেছিলেন যে টেলিফোন লাইনের তারের ক্যাপাসিটেন্সের দরুন এই অসুবিধার সৃষ্টি হয়, সুতরাং এই ক্ষতিপূরণ করে দীর্ঘ দূরত্বে সুন্দরভাবে ত্রুটিহীন কথাবার্তা বলা সম্ভব হবে যদি ক্যাপাসিটেন্সের দরুন ক্ষতিগ্রস্ত সিগনালের ক্ষতি ইনডাকটেন্স দ্বারা পুষিয়ে যায়। ইংল্যান্ড এবং বিদেশেও তাঁর এই মতামতকে কোনো মূল্য দেয়া হয় নি, তবে যখন যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানী এস. আই. পিপি ইনডাকটেন্স তত্ত্ব প্রমাণ করে এর সার্থকতা সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন তখন সবার দৃষ্টিভঙ্গি বদলে যায়। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে তাঁকে পদস্থ আমলাদের অনেক অবজ্ঞা সইতে হয়েছিল। জীবন সায়াহ্নে তিনি যখন দুরবর্তী এক গ্রামে নির্জন উপেক্ষিত জীবনযাপন করছিলেন তখন বাহাত্তর বছর বয়সে তাঁকে ফ্যারাডে পদকে ভুষিত করা হয়।

তিনি আজীবন প্রচারের বিরোধী ছিলেন। তাঁর পদকপ্রাপ্তির ঘটনাটি স্মরণীয় করে রাখার জন্য ছবি তোলার প্রস্তাবও তিনি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এই বলে যে, প্রচার মানুষকে অহঙ্কারী করে তোলে। বিজ্ঞানী সি. এফ. শার্লি তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের একজন ছিলেন এবং তাঁকে খুব ভালোভাবে বুঝতে পারতেন। তিনি হেভিসাইড সম্বন্ধে মন্তব্য করেছিলেন এই বলে যে তিনি একজন ব্যতিক্রমধর্মী কিন্তু অত্যন্ত আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন, যার কৌতুকপ্রিয়তার কোনো শেষ ছিল না।

১৯২৫ সনের জানুয়ারি মাসে তিনি হঠাৎ খুব বেশি অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাঁর পুলিশ বন্ধুটি তাঁকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন। সেখানে তিনি কিছুদিন সুস্থ ছিলেন। বিছানায় শুয়ে তিনি নার্সদেরকে হাসিগল্পে মাতিয়ে রাখতেন, ফলে নার্সরা তাঁকে একজন প্রিয় বুড়ো মানুষ হিসেবে খুবই ভালবাসতো। দুর্ভাগ্যবশত তিনি তাঁর সেই অসুস্থতা কাটিয়ে উঠতে পারনে নি এবং ১৯২৫ সনের ৩ ফেব্রুয়ারি মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর অসামান্য প্রতিভার জন্য পদার্থবিদ ও অঙ্কশাস্ত্রবিদদের নিকট হেভিসাইড গুরু হিসেবে পরিচিত ও সম্মানিত ছিলেন। টেলিকম্যুনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারদের নিকট তিনি ছিলেন একজন রূপকথার নায়ক। বিশ্ববিদ্যালয়ে না গিয়ে এবং কোনোরূপ একাডেমিক ডিগ্রির অধিকারী না হয়েও সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় এত জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য অর্জন করা সত্যিই এক অসাধারণ কৃতিত্বের ব্যাপার। বিশ্বদ্যিালয়ের ডিগ্রিজীবনের সব কিছু নয়, মানুষ তার প্রবল ইচ্ছাশক্তি, নিরলস পরিশ্রম ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টার মাধ্যমেও যে অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারে, অলিভার হেভিসাইড তার এক জ্বলন্ত প্রমাণ।

লিও চার্লস থেভেনিন

(১৮৫৭–১৯২৬)

প্রকৌশলী, শিক্ষক ও প্রশাসক

সারা বিশ্বের ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারেরা বিখ্যাত ও অতি প্রয়োজনীয় থেভেনিনের সূত্রটি ব্যবহার করে থাকেন। ১৮৮৩ সনে বিখ্যাত ফরাসি বৈজ্ঞানিক ও প্রকৌশলী লিও চার্লস থেভেনিন এই সূত্রটি প্রকাশ করেন এবং সেই থেকে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সূত্র হিসেবে ইলেকট্রিক সার্কিটের পাঠ্যপুস্তকে জটিল সার্কিটের সমস্যার সমাধানে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

১৮৫৭ সনের ৩০ মার্চ ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিস নগরীর উপকণ্ঠে মিক্স নামক স্থানে থেভেনিন জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৭৭ সনে ইকোলি পলিটেকনিক থেকে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং–এ স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করে তিনি টেলিগ্রাফ ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে ফরাসি টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন বিভাগে যোগদান করেন। প্রথম ২ বছর তাঁকে ইকোলে সুপিরিয়র দ্য টেলিগ্রাফি স্কুলে প্রশিক্ষণ নিতে হয়েছিল। ১৯১৪ সনে প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হওয়ার সময় অবসর গ্রহণ করার পূর্বপর্যন্ত আজীবন তিনি টেলিগ্রাফের উন্নতি ও প্রসারের জন্য সাধনা ও প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন। জীবনের ৩৬টি কর্মমুখর বছরে তিনি নিজেকে একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ টেলিগ্রাফ প্রকৌশলী, প্রশাসক ও সর্বোপরি একজন শিক্ষক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। চাকুরির কর্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণ করার পরেও আমৃত্যু তিনি শিক্ষকতা করেছেন।

কর্মময় জীবনের প্রথম দিকে তাঁকে ভূগর্ভস্থ টেলিগ্রাফ লাইন স্থাপন ও সম্প্রসারণ বিভাগে নিযুক্ত করা হয়, কিন্তু সেখানে তাঁকে বেশি দিন থাকতে হয় নি। কিছুদিনের মধ্যেই কর্তৃপক্ষ তাঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পেয়ে তাঁকে মেটেরিয়ালস ও কনস্ট্রাকশন বিভাগে বদলি করেন। এই বিভাগ বৈদ্যুতিক পাওয়ার লাইন নির্মাণ ও স্থাপনের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল। উক্ত কাজে নিয়োজিত থাকাকালে তিনি বিভিন্ন প্রকার সমস্যার সমাধান করে তাঁর অমর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন। তিনি তাঁর অভিজ্ঞতার আলোকে ওভারহেড পাওয়ার লাইন নির্মাণ ও স্থাপন কাজে যেসব মান প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সেগুলো বহু বছর যাবত ফরাসি ইঞ্জিনিয়ারদের দ্বারা ব্যবহৃত হতো। ১৮৮২ সনে তরুণ ফরাসি প্রকৌশলীদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণদানের জন্য তাঁকে

ইকোলি সুপিরিয়রের দায়িত্বে নিয়োজিত করা হয়। এইভাবে একজন ফিল্ড ইঞ্জিনিয়ার থেকে তিনি শিক্ষকে রূপান্তরিত হন এবং এই শিক্ষকতার পেশাই উত্তরকালে তাঁকে বিখ্যাত থেভেনিন্-সূত্র উদ্ভাবনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়।

একই সময়ে তিনি বিভিন্ন প্রকার বৈদ্যুতিক ইউনিট পরিমাপে উৎসাহী হয়ে ওঠেন এবং তাঁর প্রাক্তন শিক্ষক জুলি রেনোডসের সাথে যৌথভাবে ঐ বিষয়ের উপর লিখিত বিভিন্ন প্রকার বই ইংরেজি ভাষা থেকে ফরাসি ভাষায় অনুবাদ করেন। এরকম বিভিন্ন বিদেশী বই ফরাসি ভাষায় অনুবাদ করা ইকোলি সুপিরিয়র স্কুলের দৈনন্দিন কার্যক্রমের অংশ ছিল। এভাবে বিভিন্ন পাঠ্যপুস্তক অনুবাদ করার সময় বিখ্যাত কিরশ্হফের (Kirchoff's law) সূত্রের উপর খুব আগ্রহী হয়ে উঠেন এবং সূত্রটি গভীরভাবে অধ্যয়ন ও বিশ্লেষণ করে সম্পূর্ণরূপে নিজস্ব চিন্তাভাবনা থেকে একটি নতুন সূত্র উদ্ভাবন করেন। পরবর্তীতে ঐটাই তাঁর নামে নামকরণ করা হয়।

১৮৮৩ সালে 'থেভেনিন্স থিওরি' সর্বপ্রথম তিনটি বিজ্ঞান সাময়িকীতে একই সাথে প্রকাশিত হয়। ঐ নিবন্ধের শিরোনাম ছিল"ওহমের সূত্রের বর্ধিত সংস্করণের প্রয়োগ"। জটিল ইলেকট্রিক সার্কিট–এর গতিশীল বিদ্যুৎপ্রবাহের বিভিন্ন প্রকার সমস্যা সমাধানে এটি একটি নতুন দিগন্তের উন্মোচন করে। এর সাহায্যে অতি সহজেই কোনো সার্কিটে একটি নতুন পরিবাহীর (conductor) ভিতরে প্রবাহিত বিদ্যুতের পরিমাপ করা যায়। বর্তমানে এটাকে কিছুটা পরিবর্তিত আকারে বর্ণনা করা হলেও এর প্রয়োগ–পদ্ধতি একই রকম রয়েছে।

একই বছর তাঁর লিখিত আরো ৩ টি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। প্রথমটি ছিল, কিভাবে থেভেনিন্-সূত্রের সাহায্যে একটি গ্যালভানোমিটার দ্বারা পোটেনশিয়াল বা বিদ্যুৎচাপের পার্থক্যের পরিমাণ নির্ণয় করা যায়। দ্বিতীয়টি ছিল, কিভাবে একটি বিদ্যুৎ-পরিবাহীর রেজিসটেন্স বা বিদ্যুৎপ্রবাহে বাধাদানকারী বৈশিষ্ট্যের পরিমাপ করা যায় এবং তৃতীয়টি ছিল হুইটস্টোন ব্রিজের বিবিধ প্রয়োগ পদ্ধতি। এই নতুন সূত্রটি বিজ্ঞান সাময়িকীতে প্রকাশিত হওয়ার পর পরই খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করে। তিনি নিজেও তাঁর স্কুলের ছাত্রদেরকে এটা শিক্ষা দিতেন। ১৮৮৯ সালের মধ্যে সবাই এটাকে থেভেনিনের থিওরি বলে নামকরণ করে। এটা টেলিগ্রাফ–প্রযুক্তির ক্ষেত্রে একটি ব্যতিক্রমধর্মী উদাহরণ, কেননা টেলিগ্রাফ–প্রযুক্তিতে এটাই ছিল কোনো একজন প্রকৌশলী কর্তৃক প্রথম উদ্ভাবন। পূর্বে যত সূত্রের বা তত্ত্বের উদ্ভাবন হয়েছিল তা তাত্ত্বিক ও গাণিতিক পদার্থবিদদের দ্বারাই হয়েছিল।

থেভেনিন তাঁর উদ্ভাবিত তত্ত্বটি ফ্রান্সের একাডেমী অফ সায়েন্স–এ দাখিল করার পূর্বে তাঁর একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু টেলিগ্রাফ ইঞ্জিনিয়ারকে সেটা দেখালে তিনি সেই

ধারণাটির মধ্যে নতুনত্ব খুঁজে পেয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু সেই সাথে ধারণাটি সঠিক নয় বলে মন্তব্য করেছিলেন। অন্য বিজ্ঞানী ও প্রকৌশলীদের মতামতও অভিন্ন ছিল না। কেউ কেউ একে সঠিক, আবার অনেকে ভুল বলে মন্তব্য করেছিলেন।

১৮৮৩ সালে পর পর তাঁর তিনটি গবেষণা-পত্র প্রকাশিত হওয়ার পর আর কোনো উল্লেখযোগ্য নিবন্ধ প্রকাশিত না হলেও শিক্ষাদান ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা ও গুরুত্ব দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৮৮৫ সালে তাঁকে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ানোর দায়িত্ব দেয়া হয়। ১৮৯১ সালে ন্যাশনাল এগ্রোনোমিক ইনস্টিটিউটে মেকানিক্স ও এপ্লাইড ম্যাথামেটিক্স পড়ানোর দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। ১৮৯৬ সালে তাঁকে টেলিগ্রাফিক ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলের পরিচালক পদে নিযুক্ত করা হয়। এই পদে কাজ করে তিনি অত্যন্ত আত্মতৃপ্তি লাভ করেছিলেন। ১৯০১ সালে তাঁকে চীফ ইঞ্জিনিয়ার পদে উন্নীত করা হয়। ১৯৪৫ সালে ঐ পদ থেকে তিনি অবসর গ্রহণ করেন।

তাঁর উদ্ভাবিত তত্ত্ব ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর পাঠ্যপুস্তকে একটি মৌলিক তত্ত্ব হিসেবে পড়ানো হয় এবং ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক থিওরি উদ্ভাবনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। ১৯২৬ সাল থেকে এটি প্রকৌশলী-বিজ্ঞানী নরটনের উদ্ভাবিত তত্ত্বের পরিপূরক তত্ত্ব হিসেবে পড়ানো হচ্ছে। ১৮৫৩ সালে জার্মান বিজ্ঞানী ও পদার্থবিদ হেল্‌মহেলৎস এই তত্ত্ব দুটো সম্বন্ধে প্রথম ধারণা দিয়েছিলেন।

অকৃতদার থেভেনিন শেষ বয়সে তাঁর এক আত্মীয়ার দুটি সন্তানকে দত্তক পুত্র হিসেবে গ্রহণ করেন। তাঁর প্রিয় শখের মধ্যে অন্যতম ছিল নদীতে বড়শি দিয়ে মাছ ধরা। নৌকায় বসে নিকটবর্তী মারে নদীতে ছিপ দিয়ে মাছ ধরতে তিনি খুব পছন্দ করতেন। তাঁর মাছ ধরা শখের জন্য ছাত্ররা তাকে "এডমিরাল" উপাধি দিয়েছিল। তিনি বেহালা বাজানো পছন্দ করতেন এবং বাড়িতে বন্ধু-বান্ধবদের উপস্থিতিতে বেহালা বাজাতেন।

১৯২৬ সালে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাঁকে প্যারিসে চিকিৎসার জন্যে নেয়া হয়, কিন্তু চিকিৎসকদের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে ২১ সেপ্টেম্বর তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুর পরে তাঁর অন্তিম ইচ্ছা অনুযায়ী অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার শুধুমাত্র তাঁর পরিবারের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁর কবরে তাঁরই বাগান থেকে একটিমাত্র গোলাপফুল দেয়া হয়েছিল। কথাবার্তায় সহজ সরল ও সাধারণ জীবনযাপনে অভ্যস্ত বিজ্ঞানী থেভেনিন প্রযুক্তির ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন।

এডওয়ার্ড লরি নরটন

(১৮৯৮–১৯৮৩)

প্রকৌশলী ও গবেষক

ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর ছাত্ররা থেভেনিন্–থিওরির পরিপূরক হিসেবে নরটন–থিওরি ব্যবহার করে থাকে। নরটনের থিওরিতে যে কোনো ইলেকট্রিক সার্কিটকে একটি ইকুইভেলেন্ট সার্কিটে রূপান্তরিত করা যায় যাতে একটি বিদ্যুৎপ্রবাহের উৎস এবং একটি সমান্তরাল রেজিসটেন্স রয়েছে। এই নতুন থিওরিটি ১৯২৬ সালে প্রকৌশলী–বিজ্ঞানী নরটন কর্তৃক উদ্ভাবিত হয়

১৮৯৮ সালের ২৯ জুলাই বিজ্ঞানী এডওয়ার্ড লরি নরটনের জন্ম হয় যুক্তরাষ্ট্রের রকল্যান্ডের মেইন নামক একটি শহরে। স্থানীয় একটি স্কুলে লেখাপড়া শেষ করে প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হলে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনীতে যোগদান করেন। ১৯২২ সালে বিখ্যাত ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি (MIT) থেকে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং–এ স্নাতক ডিগ্রি লাভ করে ওয়েস্টার্ন ইলেকট্রিক কোম্পানিতে যোগদান করেন। ১৯২৫ সালে ঐ কোম্পানির অনেকগুলো ল্যাবরেটরিকে একীভূত করে একটি বৃহত্তর ল্যাবরেটরিতে রূপান্তরিত করে নতুন নামকরণ করা হয় বেল টেলিফোন ল্যাবরেটরিজ। তিনি ঐ ল্যাবরেটরিজে যোগদান করেন। একই বছর তিনি কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার ডিগ্রি অর্জন করেন। কর্মময় জীবনের বাকি সময়গুলো বেল ল্যাবরেটরিতে কাটিয়ে ১৯৬৩ সালে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। এর পরও খণ্ডকালীন উপদেষ্টা হিসেবে অনেক দিন ঐ ল্যাবরেটরির সাথে যুক্ত ছিলেন।

তাঁর কর্মময় জীবনের কর্মপরিধি অনেক প্রসারিত ছিল। তিনি ইলেকট্রিক্যাল নেটওয়ার্ক থিওরি, মেকানিক্যাল ও একোসটিক্যাল নেটওয়ার্কস রিলে থিওরি, বিমান বিধ্বংসী কামান, বোমারু বিমান ডিটেকটর, গাইডেড মিসাইল (নিয়ন্ত্রিত ক্ষেপণাস্ত্র, এটায় তিনি পেটেন্ট লাভ করেছিলেন), অটোমেশন ডাটা প্রসেসিং, হাই স্পীড ডাটা ট্রান্সমিশন, ইত্যাদি নানাবিধ ক্ষেত্রে কাজ করেছেন। তিনি সর্বমোট ২০টি পেটেন্টের অধিকারী ছিলেন। ১৯৮৩ সালের ২৮ জানুয়ারি নিউজার্সীর চাটহামে ৮৪ বছর বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন।

থেভেনিন ও নরটন দুজনেই তাঁদের উদ্ভাবিত থিওরির মাঝে অমর হয়ে আছেন।

অ্যালান আর্চিবাল্ড ক্যাম্পবেল সুইনটন

(১৮৬৩–১৯৩০)

ইলেক্ট্রনিক টেলিভিশনের প্রথম স্বপ্নদ্রষ্টা

বিজ্ঞানী অ্যালান আর্চিবাল্ড ক্যাম্পবেল সুইনটন অসাধারণ কল্পনাশক্তির অধিকারী ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তিনিই সর্বপ্রথম ইলেক্ট্রনিক্স টেলিভিশন সম্বন্ধে বাস্তব ধারণা দিয়েছিলেন। তাঁর চিন্তাধারা এত বেশি প্রাগ্রসর ছিল যে, সে যুগের লভ্য প্রযুক্তি দিয়ে তাঁর চিন্তাধারাকে বাস্তবায়িত করা সম্ভব হয় নি। ভাগ্যের নির্মম পরিহাসই বলতে হয় যে, সারাটি জীবন যে বিজ্ঞানী বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা–নিরীক্ষা করে খ্যাতি অর্জন করেছেন,তিনি অমর হয়ে আছেন এমন একটি সপ্নের মাঝে যে স্বপ্ন তিনি বাস্তবে রূপায়িত করতে পারেন নি। তাঁর জীবদ্দশায়ও কোনো বিজ্ঞানী সেটা বাস্তবে রূপ দিতে পারেন নি। তাঁর মৃত্যুর পর যুক্তরাষ্ট্রের বেল ল্যাবরেটরিজের বিজ্ঞানী আলেকজান্ডার সোরিকিন ১৯৩০ সালে তাঁর স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করেছিলেন। যাহোক টেলিভিশন প্রযুক্তিবিদেরা তাঁকে ইলেক্ট্রনিক্স টেলিভিশনের প্রথম স্বপ্নদ্রষ্টা হিসেবেই জানেন। উদ্ভাবনার ক্ষেত্রে তাঁর আর একটি অবদান রয়েছে, তা হচ্ছে এক্স–রে ফটোগ্রাফি। তিনিই প্রথম সফলভাবে এক্স–রে ফটোগ্রাফির উদ্ভাবন ও প্রচলন করেন।

১৮৬৩ সালের ১৮ অক্টোবর স্কটল্যান্ডের এডিনবরা শহরে সুইনটনের জন্ম হয়। তাঁরা ছিলেন দুই ভাইবোন। তাঁদের পিতা এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের অধ্যাপক ছিলেন। তাঁদের মায়ের নাম জর্জিনা সিটওয়েল। স্কটল্যান্ডের বিখ্যাত বীর আলফ্রেড ডি. গ্রেটের বংশধর হিসেবে তাঁদের পরিবার খুবই ঐতিহ্যবাহী। সে দেশের বিখ্যাত ও অভিজাত পরিবারের সাথে তাঁদের বৈবাহিক সম্পর্ক ছিল।

মাত্র ছয় বছর বয়সে একটি লেদ মেশিন চালনা শিক্ষা করে তিনি তাঁর উদ্ভাবনী ক্ষমতা ও বাস্তব বুদ্ধির স্বাক্ষর রাখেন। দশ বছর বয়সে তিনি ফটোগ্রাফির উপর বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেন এবং নিজস্ব উদ্ভাবিত পদ্ধতিতে কাগজের উপর ছবি প্রিন্ট ও নিজস্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী ক্যামেরা তৈরি করেন। ফটোগ্রাফি ছিলো তাঁর সারাজীবনের পেশা ও নেশা। তাঁর সর্বপ্রথম প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক গবেষণা–নিবন্ধের শিরোনাম "বহনযোগ্য ডার্করুমের তাঁবু"।

এগার বছর বয়সে তাঁর যথাযথ শিক্ষাজীবন শুরু হয়। বিজ্ঞানী আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেলের টেলিফোন আবিষ্কারের দু' বছর পরে স্কুলে থাকাকালীন সময়ে তিনি টেলিফোনের একটি কার্যকর মডেল বানাতে সক্ষম হয়েছিলেন, কিন্তু স্কুলের কর্তৃপক্ষের নির্দেশে সেটা ভেঙ্গে ফেলতে বাধ্য হন। এই ঘটনার পর তিনি তাঁর পিতামাতাকে বোঝাতে সক্ষম হন যে স্কুলের বাঁধাধরা জীবন তাঁর একেবারেই ভাল লাগে না। ফলে তিনি স্কুল ছেড়ে দেন। এ সম্বন্ধে পরে তিনি মন্তব্য করেছিলেন যে, স্কুলে অধ্যয়নকালে তিনি কোনো পরীক্ষাতেই পাশ করতে পারেন নি কিংবা কোনো প্রকার চেষ্টাও করেন নি। তাঁর মতে পরীক্ষা–পদ্ধতিটি শুধুমাত্র সময়ের অপচয় ব্যতীত আর কিছু নয়

স্কুল জীবনের বাঁধাধরা নিয়ম থেকে মুক্ত হয়ে তিনি ফ্রান্সে চলে যান। সেখানে ৯ মাস অবস্থান করে ফরাসি ভাষা উত্তমরূপে আয়ত্ত করে দেশে ফিরে এসে 'নিউক্যাসেল আপনটাইন' নামক শহরে একটি জাহাজ নির্মাণ কারখানায় শিক্ষানবিস হিসেবে যোগদান করেন। কাজের অবসরে তিনি "প্রিন্সিপল্স অ্যান্ড প্র্যাকটিস অফ ইলেকট্রিক লাইটিং" নামে একটি পুস্তক রচনা করেন। মাত্র ২১ বছর বয়সে ঐ পুস্তকটি প্রকাশ করে তিনি তাঁর জীবনের অগণিত সাফল্যের মধ্যে প্রথম সাফল্যের সূচনা করেন। তাঁর পুস্তকটি প্রকাশিত হওয়ার পরপরই কর্তৃপক্ষ তাঁকে নির্মাণাধীন একটি যুদ্ধ–জাহাজের বৈদ্যুতিক আলোর পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের দায়িত্ব প্রদান করেন। এই কাজটি করার সময় তিনি আরো কিছু কিছু নতুন পদ্ধতির উদ্ভাবন করেন। সেগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে যুদ্ধ জাহাজের কামান দাগানোর সময় কামান–নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি। ৫ বছর ব্যাপী শিক্ষানবিস থাকাকালে তিনি ইলেকট্রিক্যাল ও মেকানিক্যাল যন্ত্রপাতির উদ্ভাবন ও উন্নয়ন সাধন করেন এবং ১৬ টি পেটেন্টের অধিকারী হন।

২৩ বছর বয়সে তিনি লন্ডন শহরে চলে যান এবং নিজেকে একজন বৈদ্যুতিক বিষয়ের শিক্ষক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি চুক্তিভিত্তিতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি সরবরাহ, বৈদুতিক আলোক ব্যবস্থার পরিকল্পনা, প্রণয়ন ও স্থাপন, টেলিফোন–স্থাপন ইত্যাদি কাজ করতেন। একই সময় তিনি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বিদ্যুতের উপর বক্তৃতা প্রদান করতেন এবং বাড়িতে বসে বিভিন্ন প্রকার পরীক্ষা–নিরীক্ষা করতেন। এ সময় তিনি বিখ্যাত সি. এ. পারসন্স কোম্পানির বিক্রয়–প্রতিনিধি নিযুক্ত হন। চার্লস পারসন্স ১৮৮৪ সালে সর্বপ্রথম বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগোপযোগী বাষ্পীয় ইঞ্জিন তৈরি করেছিলেন। চার্লস পারসন্স ও সুইনটন খুব শীঘ্রই পরস্পরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও ব্যবসায়ের অংশীদারে পরিণত হন। তিনি বাষ্পীয় টারবাইনের অনেক পরিবর্তন ও উন্নয়ন বিধানে সক্ষম হন এবং মেরিন স্টীম–টারবাইন কোম্পানির

প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক হিসেবে উক্ত কোম্পানির প্রতিষ্ঠা করেন।

১৮৯৭ সালে নৌবাহিনীর হীরক জয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষে অনুষ্ঠিত নৌ-প্রদর্শনীতে তাঁর ডিজাইনকৃত স্টীম টারবাইনযুক্ত জাহাজটি ৩৪ নটিক্যাল মাইল গতিতে যখন অন্যান্য সমস্ত জাহাজকে অতিক্রম করে যায় তখন উপস্থিত দর্শকেরা আনন্দে হাততালি দিয়ে জাহাজের আরোহী সুইনটনকে অভিনন্দন জানায়। চার্লস পারসন্সের সাথে তাঁর বন্ধুত্ব ক্রমশ গভীরতর হয় এবং তিনি নৌবাহিনীর জন্য টর্পেডো জাহাজ নির্মাণকারী নতুন কোম্পানির ডাইরেক্টর নির্বাচিত হন। ১৯১৮ সালের দিকে পারসন্স যখন কৃত্রিম হীরক তৈরির পদ্ধতির উপর বক্তৃতা প্রদান করেন তখন কৃতজ্ঞ চিত্তে তিনি সুইনটনের সাহায্য ও সহযোগিতার কথা উল্লেখ করতেন। ১৯০৭ সালের দিকে সুইনটন হীরককে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে কোক কয়লায় রূপান্তরিত করে কৃত্রিম হীরক তৈরির পদ্ধতির সূচনা করেছিলেন। পরবর্তীতে তিনি কৃত্রিম রুবী পাথর তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

তাঁর জীবনী থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে, তিনি কখনো একটি বিষয়ের উপর স্থির ছিলেন না, বিভিন্ন সময়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিভিন্ন শাখায় তাঁর আগ্রহ দেখা যায়। তিনি স্টীম-টারবাইন, ইলেকট্রিক্যাল কাজকর্মের ঠিকাদারি, পানিবিদ্যুৎ তৈরি, ইলেকট্রিক আর্ক, হাই ফ্রিকোয়েন্সি ডিসচার্জ ইত্যাদির উপর গবেষণা পরিচালনা ও ১০ কিলোভোল্টের স্টোরেজ ব্যাটারি তৈরি করেন। তিনি হাই ভোল্টেজ ব্যাটারির কানেকটর স্পর্শ না করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। তিনি বাই-সাইকেলের হাতল ডিজাইন করে সেটার পেটেন্টও লাভ করেন। তবে তাঁর জীবনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো এক্স-রে ফটোগ্রাফির প্রবর্তন।

১৮৯৫ সালের নভেম্বরে বিজ্ঞানী ডব্লিউ. কে. রোন্‌ট্‌গেন এক্স-রে আবিষ্কার করেন। উক্ত আবিষ্কারের মাত্র দুই বছর পরে জানুয়ারি মাসে এ সম্বন্ধে একটি রিপোর্ট সুইনটনের চোখে পড়ে এবং রিপোর্টটি পাঠ করে ঐ একই দিনে এক্স-রে দিয়ে ছবি তুলে তিনি সবাইকে অবাক করে দেন। তাঁর ফটোগ্রাফি প্রতিভা ও দক্ষতার কোনো তুলনা ছিল না। তাঁর ঐ সাফল্যের খবর 'দি ইভিনিং স্ট্যান্ডার্ড' পত্রিকার ১০ জানুয়ারির সংখ্যায় সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। এক্স-রে ফটোগ্রাফি উদ্ভাবনের কয়েকদিন পরে সুদীর্ঘ ২০ মিনিট ধরে X-RAY প্রয়োগ করে তিনি নিজে ডানহাতের এক্স-রে ছবি তুলেছিলেন। বিজ্ঞানীরা এ কথা ভেবে অবাক হয়ে যান যে মানবকল্যাণে তিনি কিভাবে নিজের জীবনকে বিপদাপন্ন করেছিলেন। কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর আবিষ্কৃত পদ্ধতিটি জনসাধারণের নিকট প্রকাশ করার মতো অবস্থায় পৌছে এবং ২৩ জানুয়ারি "দি নেচার" পত্রিকায় সেটি প্রকাশিত হয়। লন্ডনের ক্যামেরা ক্লাবের এক অনুষ্ঠানে

তিনি সর্বপ্রথম এ সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন এবং এক্স-রে দিয়ে অনুষ্ঠানের সভাপতির হাতের এক্স-রে করে অনুষ্ঠানকালেই সেটি প্রস্ফুটিত করে উপস্থিত দর্শকদের হতবাক করে দেন। অপর একটি অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করার সময় উপস্থিত প্রধানমন্ত্রী লর্ড স্যালিসবারীর হাতের এক্স-রে করে তাঁকে হতবাক করে দেন। তিনি চিকিৎসাক্ষেত্রে এর গুরুত্ব উপলব্ধি করতে সক্ষম হন এবং অল্পদিনের মধ্যে ভিক্টোরিয়া স্ট্রীটে অবস্থিত তাঁর ল্যাবরেটরিতে ডাক্তারেরা ভিড় জমাতে শুরু করে। তাঁর অনবদ্য এই আবিষ্কারের কারণে এক্স-রে ফটোগ্রাফি টেকনোলজির ক্ষেত্রে তাঁকে সবাই একজন দিকপাল হিসেবে মনে করতো, কিন্তু তিনি এটাকে একটি সাধারণ ব্যবসা হিসেবে মনে করতেন। তাঁর প্রধান ব্যবসা ছিল বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি সরবরাহ। তাঁর ক্রিয়াকলাপ হতে একথা সহজেই অনুমান করা যায়, তিনি কত বেশি কর্মব্যস্ত থাকতেন যার ফলে বিয়ে করার মতো সময় তার জীবনে আর হয়ে উঠে নি।

১৯০৮ সনের ১৮ জুন সংখ্যা বিজ্ঞান পত্রিকা "দি নেচার"-এ তিনি সর্বপ্রথম ইলেকট্রনিক টেলিভিশন সম্বন্ধে তাঁর ধ্যানধারণা প্রকাশ করেন। তাঁর বহু পূর্ব হতেই অবশ্য বিজ্ঞানীদের ধারণায় ছিল, কিভাবে বৈদ্যুতিক সঙ্কেতের সাহায্যে ছবি তৈরি এবং তা অন্যত্র প্রেরণ করা যেতে পারে। সুতরাং সবারই একটি বদ্ধমূল ধারণা হয়ে গিয়েছিল যে, যে কোনো মুহূর্তে ইলেকট্রনিক টেলিভিশন বাস্তব রূপ লাভ করতে পারে, কেননা টেলিভিশন প্রযুক্তির তিনটি মূল অংশ, অর্থাৎ আলোক-সঙ্কেতকে বৈদ্যুতিক সংঙ্কেতে পরিবর্তিত করা, বৈদ্যুতিক সঙ্কেতকে দূরবর্তী স্থানে প্রেরণ করা (১৮৩৭) এবং বৈদ্যুতিক সঙ্কেতকে আলোক-সঙ্কেতে রূপান্তরিত করা (incandescent LAMP,1897) ইতোমধ্যেই উদ্ভাবিত হয়ে গিয়েছিল।

উনবিংশ শতকের শেষের দিকে তিনি অনুভব করেছিলেন যে, সময়ের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। ১৮৯৭ সালে বিজ্ঞানী ফার্ডিনান্ড ব্রান কর্তৃক উদ্ভাবিত অসসিলোস্কোপ সম্বন্ধে তাঁর আগ্রহ তাঁকে টেলিভিশন উদ্ভাবনে আকৃষ্ট করেছিল যদিও তেমন উল্লেখযোগ্য কোনো সাফল্য তিনি অর্জন করতে পারেন নি। ১৯২৬ সালে তিনি বলেছিলেন যে, ১৯০৩-১৯০৪ সালের দিকে টেলিভিশন উদ্ভাবন প্রচেষ্টায় অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা তিনি করেছিলেন। তিনি আলো ও ক্যাথোড রশ্মির সম্মিলিত প্রয়োগ করে সেলিনিয়াম ধাতুর প্রলেপযুক্ত স্থান থেকে ইলেকট্রিক্যাল আউটপুট পাওয়ার অনেক চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু সে প্রচষ্টা সফল হয় নি।

দুজন সহকারীর সাহায্যে বিজ্ঞানী ব্রাউনের তৈরি অসসিলোস্কোপ দিয়ে তিনি ক্যামেরা টিউব বানানোর চেষ্টা করেন। ফ্লোরোসেন্ট পর্দার পরিবর্তে সেলিনিয়ামের প্রলেপযুক্ত ধাতব পাত্রের উপর একটি লেন্সের সাহায্যে আলোক-প্রতিবিম্বকে ফোকাস

করে ক্যাথোড–রশ্মির শেষ প্রান্তকে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক পদ্ধতিতে আপতিত প্রতিবিম্বটির এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত পরিচালনা করা হয়। তিনি একটি ইলেকট্রনিক রিসিভার তৈরি করার পরিকল্পনাও করেছিলেন। বিজ্ঞানী ব্রাউনের উদ্ভাবিত অসসিলোস্কোপ–এ ক্যাথোড–রে টিউব ব্যবহার করে তিনি অপটিক্যাল প্রতিবিম্বকে ধারণ করার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু বাস্তবে সেটা খুবই কঠিন বলে প্রমাণিত হয়। সেই যুগে, যখন ইলেকট্রনিক্সের খুবই শৈশব অবস্থা, তখনই তিনি ক্যাথোড–রে টিউব প্রয়োগ করে টেলিভিশন ক্যামেরায় ও টেলিভিশন রিসিভার যন্ত্রে ইলেকট্রনিক স্ক্যানিং পদ্ধতি ব্যবহার করে ইলকট্রনিক টিভি তৈরি করার প্রস্তাব করেছিলেন। তাঁর উল্লিখিত প্রস্তাবকে ইলেকট্রনিক টেলিভিশন প্রযুক্তির সর্বপ্রথম বাস্তব চিন্তা বলে মনে করে এক্ষেত্রে তাঁকে অগ্রনায়কের সম্মান দেয়া হয়।

১৯০৮ সালে সুইটন বিখ্যাত বিজ্ঞান সাময়িকী "দি নেচার"–এ তাঁর ধ্যান–ধারণার উপর ভিত্তি করে একটি চিঠি লিখেছিলেন। ১৯১১ সালে লন্ডনের রোন্‌ট্‌গেন সোসাইটির সভাপতি হিসেবে বক্তৃতাদানকালে তিনি তাঁর আগের ধ্যানধারণাকে আরো সুন্দভাবে প্রকাশ করেন। এ সময় একটি সার্কিটের নকশা করে সেটা দিয়ে কিভাবে ইলেকট্রনিক–টেলিভিশন তৈরি করা যেতে পারে সে সম্বন্ধে সুপারিশ করেছিলেন। এ সম্বন্ধে তাঁর মতামত ব্যক্ত করে বলেছিলেন যে ঐ প্রস্তাবিত সার্কিটটি প্রকাশ করার একমাত্র উদ্দেশ্য হলো যাতে করে তাঁর ধ্যানধারণা অনুসরণ করে ভবিষ্যতে কোথাও কোনো বিজ্ঞানী বা গবেষক ইলকট্রনিক টেলিভিশন উদ্ভাবনে সফল হতে পারেন।

ইতালিয়ান বিজ্ঞানী মার্কনীর রেডিও–টেলিগ্রাফ আবিষ্কারের ঘটনায় তিনি অত্যন্ত চমৎকৃত হন এবং সেদিকে তাঁর আগ্রহ দেখা দেয়। তিনি নিজে এ সম্বন্ধে নতুন কিছু করার চিন্তাভাবনা শুরু করেন। ১৮৯৬ সালে ইতালি সরকার কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়ে হতাশ মার্কনী যখন লন্ডনে চলে যান এবং সেখানে তাঁর উদ্ভাবিত রেডিও–টেলিগ্রাফি প্রবর্তন করার জন্য অর্থ সংগ্রহের কাজে ব্যস্ত ছিলেন তখন সুইনটনই ছিলেন সর্বপ্রথম ব্যক্তি যিনি মার্কনীর উদ্ভাবিত নতুন যন্ত্রটির ভবিষ্যত সম্ভাবনা ও গুরুত্ব অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। মার্কনীর এক মামা কর্তৃক নিমন্ত্রিত হয়ে তিনি মার্কনীর প্রদর্শনীতে উপস্থিত ছিলেন। উক্ত অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার সাথে সাথে তিনি মার্কনীকে অভিনন্দন জানিয়ে তাঁর কাজের প্রশংসা করে তাঁকে বলেছিলেন যে সত্যিই এটা প্রযুক্তির জগতে এক নতুন দিগন্তের সূচনা করেছে। ব্রিটিশ পোস্ট অফিসের চীফ ইঞ্জিনিয়ার উইলিয়াম প্রীসের নিকট লিখিত একটি পত্রে তিনি মার্কনীকে পরিচয় করিয়ে দিয়ে তাঁর যন্ত্রটি গ্রহণ করার জন্য সুপারিশ করেছিলেন। পরবর্তীকালে মার্কনী বিশ্ববিখ্যাত হয়ে উঠেন এবং

এর পিছনে সুইনটনের বিরাট ব্যক্তিত্ব ও সাহায্য যে অনেকখানি ভূমিকা পালন করেছিল সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই।

এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই যে তাঁর মতো বিরাট প্রতিভাকে, যিনি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এতগুলি শাখায় একসাথে এত গুরুতপূর্ণ অবদান রেখে গিয়েছেন, অনেক সম্মান ও পদকে ভূষিত করা হবে। তিনি একাধারে বিশ্ববিখ্যাত ক্রম্পটন কোম্পানির পরিচালক, ইনস্টিটিউট অফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার্সের ভাইস প্রেসিডেন্ট (IEE,London), ন্যাশনাল ফিজিক্যাল ল্যাবরেটরিজের সদস্য, সিটি অ্যান্ড গিল্ডস কলেজের সভাপতি, মেট্রোপলিটন পুলিশ ও ফ্রিম্যান, লন্ডনের উপদেষ্টা পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯১৫ সালে লন্ডনের রয়্যাল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হয়ে তিনি তাঁর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান লাভ করেছিলেন। ব্রিটেনের যে কোনো বিজ্ঞানীর জন্য এটা হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মানজনক স্বীকৃতি। স্বহস্তে অঙ্কিত একটি চিত্রের সাহায্যে তিনি তাঁর মনের আনন্দ প্রকাশ করেছিলেন। ছবিটি ছিল--একজন দেবদূত FRS পদকের একটি ফুলের মালা নিয়ে উড়ে যাচ্ছে এবং নিচে লেখা আছে "চির আনন্দের গান গাই, আমার জীবনের সাধনার সমাপ্তি হয়েছে, স্বর্গের দ্বারগুলো খুলে গেছে এবং স্বর্গবিজয় সম্পন্ন হয়েছে।" কিন্তু তাঁর জীবনের কর্মব্যস্ততার কখনো সমাপ্তি ঘটে নি। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি গবেষণা ও নতুন চিন্তাভাবনায় ব্যস্ত ছিলেন। ১৯২০ সালের প্রথমদিকে পুনরায় ইলেকট্রনিক টেলিভিশন তৈরি করার চেষ্টা করেছিলেন। 'দি টাইমস' পত্রিকার চিঠিপত্র কলামের মাধ্যমে তিনি এ সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের সাথে মতামত বিনিময় করতেন।

দুঃখের বিষয় যে, সারাটি জীবন বিভিন্ন প্রকার সাফল্যজনক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা সত্বেও তাঁর জীবনের প্রধান স্বপ্নটির বাস্তবে রূপ দান তিনি করে যেতে পারেন নি। তিনি সবসময় নতুন নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা পছন্দ করতেন এবং কোনো সমস্যা দেখা দিলে সেটা সম্বন্ধে চিন্তাভাবনা করে সেটার সমাধান করে খুবই আনন্দ পেতেন। একবার তাঁর বাড়ির পরিচারিকা একটি সমস্যা নিয়ে খুবই বিব্রত ছিল। সমস্যাটি ছিল, বাড়ির পোষা কুকুরটি সবসময় বাড়ির সদর দরজায় প্রস্রাব করে দিতো। সমস্যাটি সুইনটনকে জানালে তিনি কিছু ক্যালসিয়াম ফসফেটের গুড়ো বাড়ির সদর দরজার বাইরে রেখে দেন। কুকুরটি অভ্যাসমতো যখন পুনরায় সদর দরজায় প্রস্রাব করছিল সাথে সাথে পাউডার বিকট শব্দ করে বিস্ফোরিত হয়ে আগুন ধরে যায়। সেই থেকে কুকুর বেচারা আর ঐ অপকর্ম করে নি।

আজীবন অকৃতদার, বিজ্ঞান সাধনায় নিবেদিতপ্রাণ বিজ্ঞানী অ্যালান আর্চিবাল্ড ক্যাম্পবেল সুইনটন ১৯৩০ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক গবেষণায় ব্যস্ত ছিলেন। তাঁর কর্মময় জীবন যে কোনো বিজ্ঞানীর জন্য এক উদ্দীপনাময় উদাহরণ।

হিদেতসুগু ইয়াগী

(১৮৮৬–১৯৭৬)

টেলিভিশন অ্যান্টেনার আবিষ্কারক

আজকাল ঘরে ঘরে যে টেলিভিশন–অ্যান্টেনা ব্যবহার করা হয় সেটার আবিষ্কারকের নাম অনেকেই হয়তো জানেন না। জাপানি অধ্যাপক হিদেতসুগু ইয়াগী ও তাঁর সহযোগী ছাত্র–সহকারী সিনটারো উদা এটি আবিষ্কার করেছিলেন। ১৮৮৬ সালের ২৮ জানুয়ারি জাপানের ওসাকা নগরীতে হিদেতসুগু ইয়াগী জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পরিবারের দ্বিতীয় সন্তান ছিলেন। তাঁর জন্মের মাত্র কয়েকদিন পরে বিখ্যাত জার্মান বিজ্ঞানী হাইনরিখ রেডিও–ওয়েভ বা বেতার তরঙ্গ উৎপাদন, প্রেরণ ও ধারণ করার পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিলেন। ইয়াগীর পিতা ও প্রপিতামহ বংশ পরম্পরায় ওসাকার প্রভাবশালী জমিদারের কর্মচারী হিসেবে কাজ করেছেন। তাঁদের দায়িত্ব ছিল প্রজাদের নিকট থেকে খাজনা বাবদ ধান চাউল সংগ্রহ করে জমিদারের গোলায় পৌছে দেয়া। যদিও কাজটা খুবই দায়িত্বপূর্ণ, কিন্তু পেশাটা খুব একটা সম্মানজনক ছিল না। তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শেয়ার মার্কেটের ব্যবসায়ে ব্যর্থ হওয়ার কারণে পরিবারে অশান্তি নেমে আসে। তখন ইয়াগীকে পরিবারপ্রধানের দায়িত্ব দেয়া হয়। তিনি একজন আদর্শবাদী ও সমাজতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন লোক ছিলেন। পরবর্তী জীবনে তিনি জাপানের আইনসভার সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন, কিন্তু দলীয় নেতার সাথে মতবিরোধের কারণে পদত্যাগ করেন । তাঁর জীবনের আদর্শ তাঁকে জীবনপথে চলার ক্ষেত্রে বৈচিত্র্যময় অভিজ্ঞতা দান করেছিল। তিনি শ্রমিকদের জীবনধারা সম্বন্ধে খুবই উৎসাহী ছিলেন এবং তাদের জীবনমান ও কাজের ধরন সম্বন্ধে চিন্তাভাবনা করতেন। এ বিষয়ের উপর তিনি সংবাদপত্রে অনেক প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তিনি অত্যন্ত বলিষ্ঠ ও সংবেদনশীল একজন লেখক ছিলেন। বিভিন্ন বিষয়ে রচিত তাঁর অনেক প্রবন্ধ রয়েছে। তিনি শুধুমাত্র ইঞ্জিনিয়ারিং বা বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ লিখতেন তা নয়, জনপ্রিয় পত্র–পত্রিকা, দৈনিক সংবাদপত্র, বৈজ্ঞানিক জার্নাল ইত্যাদিতে শিক্ষা, সমাজ, স্বাস্থ্য, বিজ্ঞান ও সমাজের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং ইলেকট্রিক্যাল 'কম্যুনিকেশন ব্যবস্থা ইত্যাদির উপরও তিনি অসংখ্য প্রবন্ধ লিখেছেন।

শৈশবে লেখাপড়া করার সময় বিজ্ঞানের চেয়ে সাহিত্যে তাঁর বেশি মনোযোগ ছিল, কিন্তু বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে বিচিত্র প্রাকৃতিক পরিবেশের নানা ধরনের প্রক্রিয়ার প্রতি তাঁর দৃষ্টি প্রসারিত হতে থাকে। এক শিক্ষক তাঁর এই মনোভাব দেখে তাঁকে সাহিত্য অথবা আইন অধ্যয়ন করার পরামর্শ দিলে উত্তরে তিনি বলেন "মানুষের তৈরি আইন সময় ও দেশের অবস্থার সাথে পরিবর্তিত হয়ে থাকে তাই আমি স্রষ্টার সৃষ্ট প্রাকৃতিক নিয়মাবলী অধ্যয়ন করতে চাই যেটার কোনো পরিবর্তন হয় না।" স্রষ্টার প্রতি তাঁর বিশ্বাস ও ভক্তি ছিল প্রগাঢ় ও অবিচল এবং তিনি মানুষের নশ্বর জীবনের সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধে খুবই সজাগ ছিলেন। তিনি বলতেন যে, কারো কারো ধারণা বিজ্ঞান প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করে কিন্তু একজন সত্যিকার বিজ্ঞানী কখনোই এটা ভাবতে পারে না। তিনি আরো বলতেন যে, বিজ্ঞানকে অবশ্যই শান্তি ও কল্যাণের ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে হবে।

টোকিও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ২৪ বছর বয়সে ইঞ্জিনিয়ারিং–এ স্নাতক ডিগ্রি লাভ করে তিনি সেনদাই ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলে শিক্ষকতা শুরু করেন। সেনদাই হচ্ছে টোকিও থেকে দুইশত মাইল উত্তরে অবস্থিত ১০ লক্ষ অধিবাসী অধ্যুষিত একটি বড় শহর। শিক্ষকতা শুরু করার ৪ বছর পর শিক্ষা মন্ত্রণালয় উচ্চতর ডিগ্রি লাভের জন্য তাঁকে জার্মানীতে প্রেরণ করে। সেখানে ড্রেসডেন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রফেসর হাইনরিখ বার্কহাউজেনের অধীনে তিনি রেজোনেন্স বিষয়ের উপর গবেষণা করেন। প্রফেসর বার্কহাউজেন কয়েক বছর পরে ১৯১৯ সালে ফেরোম্যাগনেটিজমের ক্ষেত্রে ম্যাগনেটিক ডোমেইন এফেক্ট আবিষ্কার করেছিলেন। এটা এখন বার্কহাউজেন এফেকট নামে পরিচিত। ইয়াগী প্রবহমান চুম্বক–তরঙ্গ সৃষ্টির উপর গবেষণা করেছিলেন। তখনকার দিনে ইলেকট্রিক আর্ক দ্বারা উৎপন্ন কম্পন থেকে ক্রমাগত ধারায় বিদ্যুৎ–চুম্বকীয় তরঙ্গ তৈরি করা হতো। ১৯১৪ সালে প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হওয়ার সময় তিনি শিক্ষা ভ্রমণের অংশ হিসেবে অস্ট্রিয়া, সুইজারল্যান্ড এবং ইতালি ভ্রমণ করেছিলেন। সেখান থেকে জার্মানি ফিরে না গিয়ে তিনি ইংল্যাণ্ডে পাড়ি দিয়েছিলেন এবং প্রফেসর জে. এ. ফ্লেমিং–এর সাথে দেখা করে তাঁর অধীনে কাজ করার ইচ্ছা প্রকাশ করায় প্রফেসর ফ্লেমিং তাঁকে সাদরে গ্রহণ করেন। প্রফেসর ফ্লেমিং লন্ডন ইউনিভারসিটি কলেজের ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে অধ্যাপনা করতেন এবং ভ্যাকুয়াম টিউব আবিষ্কার করে একজন আবিষ্কারক হিসেবে বিশ্ববিখ্যাত হয়েছিলেন। সে সময় ফ্লেমিং ৬৫ বছরের বৃদ্ধ। যুদ্ধের কারণে বিভাগে তেমন ছাত্র ছিল না বলে তিনি জাপানি ছাত্রটিকে খুবই আগ্রহ সহকারে গ্রহণ করেন। ইয়াগী তাঁর অধীনে বিদ্যুৎ–চুম্বকীয় তরঙ্গ তৈরি করার গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেন। কথিত আছে

যে, একদিন ইয়াগীর সাফল্যে প্রফেসর ফ্লেমিং এত বেশি উত্তেজিত হয়েছিলেন যে, তিনি সাবাশ, সাবাশ বলে চিৎকার করতে করতে গোটা ল্যাবরেটরি জুড়ে আনন্দে নেচে বেড়িয়েছিলেন। এরপর ইয়াগী তিন বছরের শিক্ষা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করার সময় কিছুদিনের জন্য হার্ভাড বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থান করেন। ১৯১৬ সালে তিনি জাপানে ফিরে যান এবং অধ্যাপনায় নিয়োজিত হন। কিছুদিন পরে ঐ ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলটি টেহোকো বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে যুক্ত হয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং ফ্যাকাল্টি বা অনুষদে রূপান্তরিত হয়। ১৯২১ সালে ইয়াগী তাঁর ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন। ঐ বিভাগ তাঁকে একজন প্রতিষ্ঠাতা হিসেবেই শুধু নয়, বরঞ্চ একজন মৌলিক ও সৃষ্টিধর্মী গবেষক হিসেবে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম প্রতিষ্ঠায় ও সুনাম বজায় রাখার ক্ষেত্রে তাঁর অবদানের কথা এখনো অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করে থাকে।

অধ্যাপনাকালে তিনি প্রচলিত পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ সৃষ্টি করে যাচ্ছিলেন। ১৯২০ সালে তিনি নতুন ও সহজতর পদ্ধতিতে ক্ষুদ্র তরঙ্গদৈর্ঘ্য সৃষ্টি করার পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছিলেন। সে সময় একজন জাপানি নৌবাহিনীর অফিসার যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণ শেষে ফিরে এসে তাঁকে জানালেন যে এলবার্ট হাল নামক যুক্তরাষ্ট্রের একজন বিজ্ঞানী নিউইয়র্কের জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানির ল্যাবরেটরিতে ম্যাগনেট্রন টিউব নামে একটি নতুন যন্ত্র আবিষ্কার করেছেন যেটার সাহায্যে খুব ক্ষুদ্র তরঙ্গদৈর্ঘ্য বিশিষ্ট বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ তৈরি করা যায়। ইয়াগী ও তাঁর অধীন গবেষক ছাত্ররা এই ঘটনার মাত্র কিছুদিন পূর্বেই ম্যাগনেট্রন যন্ত্রটির উপর তাঁদের আইনগত অধিকার লাভ করেছিলেন। ১৯২৭ সালে কিনজিরো ওকাবে নামে এক গবেষক-ছাত্র এক সেন্টিমিটারের দশমাংশের চেয়েও কম দৈর্ঘ্যসম্পন্ন বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ উৎপাদন করতে সক্ষম হয়েছিল এবং আরো শক্তিশালী তরঙ্গদৈর্ঘ্য সৃষ্টি করার লক্ষ্যে ম্যাগনেট্রনের অ্যানোড বা পজিটিভ ইলেকট্রোডিকে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করে নতুন ধরনের এক ম্যাগনেট্রন যন্ত্র আবিষ্কার করার পর ওটার নাম দিয়েছিল স্লিট অ্যানোড ম্যাগনেট্রন। আর একজন ছাত্র ও গবেষণা সহকর্মী সিনটারো উদা সম্পূর্ণরূপে এক নতুন ধরনের অ্যান্টেনা তৈরি করেন যেটা এক বিশেষ দিকে বিশেষ ধরনের রেডিও ওয়েভ বিকিরণ করতে সক্ষম। এটাই বর্তমানে সর্বাধিক প্রচলিত ইয়াদি উদা অ্যান্টেনা।

স্লিট অ্যানোড ম্যাগনেট্রন ও ইয়াদি-উদা অ্যান্টেনার যুক্ত প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট আলট্রা হাই ফ্রিকোয়েন্সির বীমের (VHF Beam) সাহায্যে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ক'রে তিনি পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। গবেষক ছাত্র

নির্বাচন ও তাদের গবেষণা কাজ সঠিক পথে পরিচালনা করার ক্ষেত্রে তিনি খুবই দক্ষ ছিলেন। সিনটারো উদা পরবর্তীতে টেহোকো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর পদে এবং কিনজিরো ওকাবা ওসাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর পদে উন্নীত হয়েছিলেন। ১৯৩০ সালে ইয়াগী ওসাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। ১৯৩৬ সালে সর্বপ্রথম জাপানি রেডার তৈরির ঐতিহাসিক সাফল্যের জন্য ওসাকা বিশ্বদ্যিালয় এখনো গর্ব বোধ করে থাকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানিরা দুই প্রকার রেডার ব্যবহার করতো। একটিতে সর্বক্ষণ প্রবহমান তরঙ্গ সৃষ্টি করে দুটি স্টেশন থেকে একই সাথে বিকিরণ করা হতো এবং এই দুই বীমের মধ্য দিয়ে অতিক্রমকারী উড়ন্ত বিমানের অবস্থান ডপলার এফেক্টের সাহায্যে নির্ণয় করা যেতো। আরেকটি পদ্ধতিতে প্রচলিত প্রথানুযায়ী পাল্‌স টেকনিক ব্যবহার করা হতো। এই প্রথম পদ্ধতিটি ইয়াগী ও ওকারা যৌথভাবে উদ্ভাবন করেছিলেন। এটার সম্বন্ধে স্মৃতিচারণ ক' রে তিনি পরে বলেছিলেন যে, প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে জার্মানিতে থাকাকালে তাঁর মাথায় এ সম্বন্ধে চিন্তার উদয় হয়েছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ব্যবহৃত এই বিশেষ ধরনের রেডারের বিকিরিত সঙ্কেত ৬৫০ কিলোমিটার দূরত্বে উড়ন্ত বিমানের অবস্থান নির্ণয় করতে পারতো। অর্থাৎ তাইওয়ানে বসে মূল চীনা ভূখণ্ডের সাংহাই শহরের উপর উড্ডীয়মান যে কোনো বিমানের অবস্থান নির্ণয় করা সম্ভব ছিল।

ইয়াগী নামেমাত্র বেসামরিক মৌলিক গবেষণাকেন্দ্রের পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি জাপানি সেনাবাহিনীর যুদ্ধ পরিচালনা করার সর্বোচ্চ কমান্ডকে ইক্টেনিক্স গবেষণার ক্ষেত্রে তাঁদের ধীরে চল নীতির জন্য কড়া সমালোচনা করতেন। সে সময় রেডারকে যুদ্ধাস্ত্র হিসেবে বিবেচনা করে বেসামরিক বিজ্ঞানীদের রেডারের উপর কাজ করার সুযোগ দেয়া হতো না। এটার সব কাজকর্ম সম্পূর্ণভাবে সেনাবাহিনী ও নৌ–বাহিনীর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হতো। ১৯২৮ সালে অ্যান্টেনা তৈরি করে ইয়াগী ও তাঁর সহকর্মীরা পাশ্চাত্য জগতে পরিচিতি লাভ করেন। যুক্তরাষ্ট্র সফরকালে তিনি তাঁদের গবেষণা পদ্ধতির উপর বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। তিনি ইনস্টিটিউট অফ রেডিও ইঞ্জিনিয়ার্স (পরবর্তীতে IEEE) এবং জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানির গবেষকদের উপস্থিতিতে বক্তৃতা করেছিলেন। তাঁর লিখিত একটি প্রবন্ধ ১৯২৮ সালে IRE জার্নালে প্রকাশিত হয় এবং ১৯৮৪ সালের মে মাসে এটা পুনর্মুদ্রিত হয়। । এই গবেষণামূলক প্রবন্ধটি পাঠ করে ওয়াশিংটন ব্যুরো অফ স্টান্ডার্ডের রেডিও ডিভিশনের প্রধান জে. এইচ. ডিরিংগার মন্তব্য করেছিলেন "আমি এর পূর্বে আর কখনো এরূপ প্রবন্ধ পাঠ করি নি, এটা পড়ে মনে হলো এটা একটি অতি উচ্চমানের বৈজ্ঞানিক মৌলিক সৃষ্টিধর্মী অনবদ্য রচনা। এটা যেন সৃষ্টি করার জন্যই পূর্ব

থেকে নির্ধারিত ছিল।" তাঁর লিখিত "বীম ট্রান্সমিশন অফ আলট্রাহাই ফ্রিকোয়েন্সি" নামক প্রবন্ধটি দুটি ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগ ইয়াদি উদা অ্যান্টেনার উপর লেখা, এতে ৪.৪ ও ২.৬ মিটার দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ ব্যবহারকারী অ্যান্টেনা সিস্টেম সম্বন্ধে বলা হয়েছে, দ্বিতীয় ভাগে স্পিলট অ্যানোড ম্যাগনেটেন ব্যবহার করে সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ কি করে তৈরি করা যায়, বিশেষ করে ৪০ সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট তরঙ্গ কি করে তৈরি করা যায় সে সম্বন্ধে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। এতে আরো ক্ষুদ্র দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট তরঙ্গ যেমন ১৯, ১২ ও ৮ সেন্টিমিটার পর্যন্ত তরঙ্গদৈর্ঘ্যবিশিষ্ট মাইক্রোওয়েভ কি করে তৈরি করা যায় সে সম্বন্ধেও উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি তাঁর প্রবন্ধে অ্যান্টেনা তৈরির ক্ষেত্রে তাঁর সহযোগী ছাত্র মিনজারো উদার মৌলিক অবদান এবং ম্যাগনেটেন তৈরির ক্ষেত্রে কিনজ্বিরো ওকাবার অবদানকে যতদূর সম্ভব তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। যদিও এটা জাপানি ভাষায় প্রকাশিত হয়েছিল, তিনি তাঁর আমেরিকান শ্রোতাদের আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন যে পরবর্তী সমস্ত সংস্করণের ইংরেজি অনুবাদও প্রকাশ করা হবে।

অ্যান্টেনার উপর তাঁর গবেষণা ছিল বিভিন্ন উচ্চতায় এর কর্মক্ষমতার ফলাফল, প্রতিফলকের প্রয়োজনীয়তা, ডাইরেক্টরগুলোর সংখ্যা, দৈর্ঘ্য ও পাস্পরিক দূরত্বের ভূমিকা (এই ডাইরেক্টরগুলোকে একত্রে তিনি ওয়েভ–ক্যানাল নাম দিয়েছেন) এবং পোলারাইজেশনের অবদান ইত্যাদি। উক্ত প্রবন্ধে সর্বমোট ২২টি চিত্রের সাহায্যে অ্যান্টেনার কার্যকরী ভূমিকার বিশ্লেষণ করা হয়েছিল। অ্যান্টেনার কর্মপদ্ধতি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে এর মূল ভূমিকায় বলা হয় যে, একটি নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের ধাতব দণ্ডের স্বতঃস্ফূর্ত স্পন্দনসীমার উপর নির্ভর করে এটাকে ওয়েভ রিফ্লেকটর হিসেবে অথবা ওয়েভ ডাইরেক্টর হিসেবে ব্যবহার করা সম্ভব কিনা। এইভাবে এক বিশেষ দিকে প্রবাহিত হওয়ার প্রবণতাকে ব্যবহার করে প্রখর তীব্রতা বিশিষ্ট তরঙ্গরশ্মি তৈরি করা সম্ভব বলে মত প্রকাশ করার পর থেকে আজ পর্যন্ত এই পদ্ধতিতেই সমস্ত ডিরেকশনাল অ্যান্টেনা তৈরি করা হচ্ছে।

তিনটি অথবা পাঁচটি দণ্ডের সহযোগে তৈরি অ্যান্টেনার ত্রিভুজকে প্রধান বিকিরণকারী দণ্ডের পিছনে বসালে এটা একটা ত্রিভুজাকার রিফ্লেকটর হিসেবে কাজ করবে। কয়েকটি ডাইরেকটিভ দণ্ডকে প্রধান বিকিরণকারী দণ্ডের সামনে বসাতে হবে। এই ডাইরকটিভ দণ্ডগুলোর পারস্পরিক দূরত্ব এবং তাদের স্বতঃস্ফূর্ত স্পন্দন মাত্রাকে যথাযথ সংস্থাপন করে বিকিরিত তরঙ্গশক্তির অধিকাংশই ডাইরেক্টর–দণ্ডসমূহের বরাবর বিকিরিত করা সম্ভব ।

বিশ্বের অন্যান্য আবিষ্কারকদের মতো তিনিও নানা প্রকার সম্মানজনক পদবি ও পদকে ভূষিত হয়েছিলেন এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কর্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণ করার পর তিনি টোকিও ও টোহুকো বিশ্বদ্যিালয়ের 'প্রফেসর ইমেরিটাস' নিযুক্ত হন। তিনি জাপান একাডেমীর সদস্য ইয়াদি উদা অ্যান্টেনা কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা ও উপদেষ্টা, জাপান টেলিভিশন ব্রডকাষ্টিং নেটওয়ার্ক, টোকিও এক্সপ্রেস ইলেকট্রিক রেলওয়ে, বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক কাউন্সিল ও সরকারি প্রতিষ্ঠানের উপদেষ্টা সদস্য ছিলেন। একজন ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার হওয়া সত্ত্বেও ব্যতিক্রমধর্মী প্রতিভা হিসেবে তিনি জাপানের একটি প্রভাবশালী দৈনিক পত্রিকার বিশেষ প্রতিনিধি ছিলেন এবং বিভিন্ন সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে সরাসরি জড়িত ছিলেন। জাপানের সম্রাট হিরোহিতো কর্তৃক প্রদত্ত "কালচারাল অর্ডার অফ মেরিট" পদকটি তাঁর মৃত্যুর বছর তাঁকে প্রদত্ত হয়।

শুধু একজন আবিষ্কারক হিসেবে নয়, একজন খাঁটি দেশপ্রেমিক হিসেবেও তিনি জাপানিদের অন্তরে চির অম্লান হয়ে আছেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর বিশেষ আন্তর্জাতিক যুদ্ধাপরাধী তদন্ত কমিশনের সম্মুখে যখন তাঁকে যুদ্ধাপরাধী হিসেবে জেরা করা হচ্ছিল তখন তিনি নির্ভীক হৃদয়ে সগর্বে জবাব দিয়েছিলেন "আমেরিকানদের যুদ্ধে পরাজিত করার জন্য আমি আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি, আমি আমার দেশের মানমর্যাদা রক্ষার জন্য আমার সর্বাত্মক প্রয়াস রেখেছি।" তাঁর এই নির্ভীক ও গর্বিত উত্তর শুনে কমিশনের একজন সদস্য তাঁর আসন থেকে উঠে গিয়ে ইয়াগীর সাথে করমর্দন করে তাঁকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন। কারণ এর পূর্বে যত লোককে জেরা করা হয়েছিল তাঁদের সবাই এক বাক্যে যুদ্ধে তাঁদের ভূমিকা অস্বীকার করে যাচ্ছিলেন যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে অন্যান্য জাপানিদের মতো ইয়াগীকেও অনেক দুঃখকষ্ট সইতে হয়েছিল। ১৯৪৫ সালের এপ্রিল মাসে এক আগুনে বোমার আঘাতে তাঁর ঘরবাড়ি জ্বলে পুড়ে তাঁর ত্রিশ বছরের পরিশ্রম ও সাধনার ফসল সমস্ত বৈজ্ঞানিক তথ্যসমৃদ্ধ কাগজপত্র ও সঞ্চিত উপাত্ত ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। ১৯৭৬ সালে নব্বইতম জন্মবার্ষিকী উদযাপনের মাত্র কয়েকদিন পূর্বে জাপানিদের গর্ব বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রদূত মহামতি অধ্যাপক হিদেতসুগু ইয়াগী পরলোক গমন করেন। মহান দেশপ্রেমিক ও নির্ভীকচিত্ত ইয়াগী শুধু জাপানিদের নয় এশিয়ার অন্যান্য দেশের বিজ্ঞানীদের জন্যও এক অনন্য দৃষ্টান্ত ও প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব।

ভ্লাদিমির কোসমা সোরিকিন

(১৮৮৯–১৯৮২)

টেলিভিশনের বিস্ময়কর প্রতিভা

দীর্ঘদিন একইস্থানে পড়ে থাকা একটি পাথর হঠাৎ সরানো হলে পাথরের নিচে অবস্থানকারী পোকামাকড়গুলো যেমন হতচকিত হয়ে যায় ঠিক তেমনি যদি কাউকে প্রশ্ন করা হয় টেলিভিশন কে আবিষ্কার করেছিলেন তখন তিনিও ঠিক একইরকমভাবে হতচকিত হয়ে যাবেন। সে যাহোক, ১৯৮২ সালের ২৯ জুলাই ৯৩তম জন্ম বার্ষিকী পালনের একদিন পূর্বে মৃত্যুবরণ করার পর বিখ্যাত বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদ ভ্লাদিমির কোসমা সোরিকিন সম্বন্ধে সবাই সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিল এই বলে যে, তিনি ছিলেন আধুনিক ইলেক্ট্রনিক্স টেলিভিশন আবিষ্কারকদের অন্যতম প্রধান দিকপাল। বিখ্যাত টাইমস পত্রিকা তাঁর সম্বন্ধে মন্তব্য করেছে যে, সোরিকিনের উদ্ভাবিত কাজকর্মের উপর ভিত্তি করেই পরবর্তীকালে টেলিভিশন প্রযুক্তির সমস্ত উন্নয়ন সাধন সম্ভব হয়েছে। সোরিকিন কিন্তু কখনো নিজকে টেলিভিশনের একক জনক বলে মনে করতেন না। তিনি বলেছিলেন যে, কোনো ব্যক্তি এককভাবে টেলিভিশন আবিষ্কারের কৃতিত্ব দাবি করতে পারেন না। কারণ টেলিভশনকে বর্তমান পর্যায়ে আনতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারের প্রয়োজন হয়েছে এবং এতে অনেকের সমষ্টিগত অবদান রয়েছে। সোরিকিন ব্যক্তিগতভাবে আইকোনোস্কোপ নামে টিভি ক্যামেরা টিউব আবিষ্কারের জন্য বিখ্যাত হয়েছেন। তিনি এর পূর্বে কাইনোস্কোপ নামক টিভি পিকচার টিউব আবিষ্কার করেছিলেন, ফলে ১৯৩০ সালের দিকে উন্নতমানের টিভি তৈরি সম্ভব হয়েছিল।

১৮৮৯ সালের ৩০ জুলাই জার শাসিত রাশিয়ার মস্কো শহর থেকে দক্ষিণপূর্ব দিকে অবস্থিত ওকা নদীর তীরে ছোট একটি শহর মুরোসে ভ্লাদিমির কোসমা সোরিকিনের জন্ম হয়। তাঁর পিতা একটি জাহাজ কোম্পানির মালিক ছিলেন। আট বছর বয়সে পিতার সাথে জাহাজে ভ্রমণকালে তিনি বিদ্যুৎ–প্রকৌশল বা ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং–এর প্রতি আকর্ষণ বোধ করেন। কারণ ঐদিন তিনি দেখেছিলেন যে, একটিমাত্র বোতাম টিপে পিতা কি করে জাহাজের সবার সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলছিলেন। স্কুলের শিক্ষা শেষ করে তিনি সেন্ট পিটারসবুর্গের

BANSDOC Library
Accession No. 18484

ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজিতে অধ্যয়ন করেন এবং ১৯১২ সালে বিদ্যুৎ-প্রকৌশল-এ ডিগ্রি লাভ করেন। এই ইনস্টিটিউটে প্রফেসর বোরিস রোসিং-এর ছাত্র থাকাকালে তিনি তাঁর কাছ থেকে ইলেকট্রনিক্স ও টেলিভিশন সম্বন্ধে যথেষ্ট অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন। টেলিভিশন সম্পর্কে সর্বপ্রথম যাঁরা চিন্তাভাবনা করেছিলেন এই অধ্যাপক ছিলেন তাঁদের অন্যতম। টেলিভিশনের অন্যতম বিখ্যাত পরিকল্পনাকারী যুক্তরাষ্ট্রের বেয়ার্ড. যাঁকে টিভির জনক হিসেবে ধরা হয়ে থাকে, তাঁর বহু পূর্বে এ শতকের গোড়ার দিকে রাশিয়াতে অধ্যাপক রোসিং এবং ইংল্যান্ডে এ. এ. ক্যাম্পবেল উভয়েই ইলেকট্রনিক টেলিভিশন সম্বন্ধে চিন্তাভাবনা শুরু করেছিলেন। ১৯০৮ সালে ও ১৯১৯ সালে বিজ্ঞানী এ. এ. ক্যাম্পবেল সুইনটন ক্যাথোড-রে টিউব ব্যবহার করে ম্যাগনেটিক স্ক্যানিং পদ্ধতিতে টি-ভি ক্যামেরা ও রিসিভার বানানোর পদ্ধতির উপর প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিলেন। এর পরেই সোরিকিনের আবিষ্কৃত টিউব বিষয়ক ভাবনার সাথে সুইনটনের প্রকাশিত চিন্তাধারার হুবহু মিল দেখা যায়। যদিও সুইনটনের চিন্তাধারা সঠিকই ছিল, কিন্তু তিনি তার বাস্তব রূপ দিতে পারেন নি। কিন্তু রাশিয়াতে অধ্যাপক রোসিংই অনেক বাধাবিপত্তি ও প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে ঘূর্ণায়মান আয়নাড্রাম প্রযুক্তি ব্যবহার করে লম্ব ও সমান্তরাল স্ক্যানিং-এ প্রথম সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এক্ষেত্রে তিনি ফটোসেল ব্যবহার করেছিলেন। ম্যাগনেটিক কয়েলের সাহায্যে স্ক্যানিং করে তিনি টিভি ক্যামেরার ছবিকে কোল্ড ক্যাথোড়্-রে টিউবে ছবির আকারে প্রদর্শন করতে সক্ষম হন। সোরিকিন তাঁর স্মৃতিগ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে ১৯১০-১২ সালের দিকে তিনি অধ্যাপক রোসিং-এর সাথে যৌথভাবে কাজ করে একটি স্থিরছবি সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন, কিন্তু ছবিটি খুবই অস্পষ্ট ছিল। এটা দেখতে কখনো কখনো কতকগুলি ভঙ্গুর চক্রাকৃতি ক্ষেত্রবিশিষ্ট, আবার কখনো বা ত্রিভুজাকৃতি ইত্যাদি নানা আকারের হলেও ছবিটি কিন্তু খুবই উজ্জ্বল ছিল। অধ্যাপক রোসিং চলমান ছবি উদ্ভাবন করতে পারেন নি সত্য কিন্তু অনুপ্রেরণা দিয়ে ও শিক্ষা দিয়ে সোরিকিনকে তিনি যোগ্য শিষ্য হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন। সোরিকিনের নিজের ভাষায় "তিনি আমাকে টেলিভিশনের উপর স্বপ্ন দেখতে উৎসাহিত করেছিলেন, ফলে ১৯১৯ সালে যুক্তরাষ্ট্রে পৌছানোর পরেই আমি টেলিভিশনের উপর কাজ করতে পারব এমন একটি স্থান খুঁজেছিলাম।" যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার পূর্বে তিনি প্যারিসে কলেজ দ্যা ফ্রাঁসে এক্স-রে এর উপর অধ্যাপক পল লেঙ্গভনের তত্ত্বাবধানে কাজ করেন, কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়ায় তাঁকে দেশে ফিরে যেতে হয় এবং সেখানে তিনি সেনাবাহিনীর সিগনাল কোরে কাজ করেন। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর পৃথিবীর নানা দেশ ঘুরে তিনি অবশেষে যুক্তরাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে

বসবাসের সিদ্ধান্ত নেন ও ১৯২৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব লাভ করেন। বন্ধুবান্ধবের সহযোগিতায় তিনি প্রথম ওয়েস্টিং হাউজ (Westing House) কোম্পানিতে চাকুরি লাভ করেন এবং ১৯২৯ সাল পর্যন্ত সেখানে কাজ করেন। ১৯২৩ সালে তিনি তাঁর প্রথম উদ্ভাবিত ইলেকট্রনিক টেলিভিশনের পেটেন্টের জন্য আবেদন করেছিলেন। এই আবেদনটি বেশ কয়েক বছর ধরে অনেকভাবে পরিবর্তিত হতে থাকে। ১৯২৫ সালে তিনি আরেকটি নতুন পেটেন্টের জন্য আবেদন করেন। এ বারের আবিষ্কারটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল, কারণ ওটা দিয়েই তিনি পরবর্তীকালে আইকোনোস্কোপ টিউব বানিয়ে ছিলেন। পরবর্তী দু' বছরে তিনি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের ইলেকট্রনিক টেলিভিশন সিস্টেম বানিয়েছিলেন, এতে রিসিভারের কনভারটেভ অসসিলোগ্রাফ টিউব ও ক্যামেরার জন্য একটি বিশেষভাবে তৈরি টিউব ব্যবহার করা হয়েছিল। এটাই ছিল সর্বপ্রথম টি-ভি ক্যামেরা টিউব এবং RCA কোম্পানি কর্তৃক এটা আজও তৈরি হচ্ছে। তিনি তাঁর উদ্ভাবিত নতুন টেলিভিশন পদ্ধতি ওয়েস্টিং হাউজ কর্তৃপক্ষকে দেখিয়েছিলেন, কিন্তু পর্দায় ছবিটি খুবই অস্পষ্ট ছিল, ফলে কর্তৃপক্ষ তাঁকে আরো ভালো কিছু করার জন্য উপদেশ দিয়েছিলেন। ১৯২৬ সালে পিটসবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় তাকে ডক্টরেট উপাধিতে ভূষিত করে। এরপর তিনি ইউরোপ পরিভ্রমণে বের হয়ে জার্মানি, হাঙ্গেরি, বেলজিয়াম, ফ্রান্স ও গ্রেট ব্রিটেন সফর করেন এবং ১৯২৯ সালে RCA কোম্পানিতে রিসার্চ ডাইরেক্টর পদে যোগদান করেন। ইতিমধ্যে অনেক বিজ্ঞানী টেলিভিশন আবিষ্কারের ক্ষেত্রে তাঁদের স্ব স্ব কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে যাচ্ছিলেন। যুক্তরাষ্ট্রের জন লোগী বেয়ার্ড মেকানিক্যাল স্ক্যানিং টেলিভিশন উদ্ভাবন করে এবং আটলান্টিক মহাসাগরের এপার–ওপার ট্রান্সমিশন করে টি-ভি আবিষ্কারের ক্ষেত্রে নিজেকে শীর্ষস্থানে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। সি. এফ. জেনকিনসন নামক একজন বিজ্ঞানী স্বল্প সময়ের জন্য টিভি প্রোগ্রাম সম্প্রচার করতে সক্ষম হন। একই সময়ে ফ্রান্স, জার্মানি ও যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন গবেষকও টেলিভিশনের উদ্ভাবন ও মান উন্নয়নে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। ১৯২৮ সালে যুক্তরাষ্ট্রে ফেরার পথে তাঁর মনে উন্নতমানের ক্যাথোড–রে টিউব তৈরির একটি পরিকল্পনা জাগে এবং যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে এসেই তিনি এ বিষয়ে কাজ শুরু করেন। মাত্র কিছুদিন কাজ করে তাঁর কাজের সাফল্য দেখিয়ে তিনি RCA কোম্পানির একজিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট ডেভিড সারনফকে অভিভূত করতে সক্ষম হন এবং তাঁকে বলেন যে মাত্র দু বছরেরও কম সময়ে একটি সম্পূর্ণ নতুন ধরনের টি-ভি পদ্ধতি উদ্ভাবন করা সম্ভব হবে। সারনফ তাঁকে এগিয়ে যাওয়ার অনুপ্রেরণা দিয়ে সর্বপ্রকার আর্থিক সাহায্যদানের অঙ্গীকার করেন। পরবর্তীকালে সারনফ তাঁকে একজন সফল বিক্রেতা (salesman) হিসেবে

অভিহিত করে বলেছিলেন সোরিকিন তাঁকে বলেছিলেন যে, এই নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবনের জন্য মাত্র এক লক্ষ ডলারের প্রয়োজন হবে। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায় যে RCA কোম্পানিকে ৫ কোটি ডলার খরচ করতে হয়। সোরিকিন তাঁর এই নব উদ্ভাবিত পিকচার টিউবের নাম দিয়েছিলেন কাইনোস্কোপ। এটা অত্যন্ত নিখুঁতভাবে বায়ুশূন্য করা ছিল এবং পরোক্ষভাবে উত্তপ্ত করা যায় এমন একটি ক্যাথোড–রে বীম এবং কারেন্ট মডুলেশন করার জন্য একটি বিশেষ গ্রিড (grid) লাগানো ছিল। ১৯২৯ সালের নভেম্বরে এই বিশেষ ধরনের টিউবটি সম্বন্ধে সর্বপ্রথম সাধারণ ঘোষণা দেয়া হয়। ইতোমধ্যে ১টি ট্রান্সমিটার–স্টেশন ও ৬টি রিসিভার প্রায় তৈরি করা শেষ হয়ে যায়। এর পরে তিনি ক্যামেরার টিউব নতুনভাবে ডিজাইন করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন এবং সাফল্যজনকভাবে এক নতুন ধরনের ক্যামেরা টিউবের উদ্ভাবন করেন। এতে ডাবল সাইডেড টারগেট ও ১২ লাইনবিশিষ্ট ছবি তৈরি করা যেতো। এটার মাধ্যমে প্রতিফলিত আলো দ্বারা সৃষ্ট বৈদ্যুতিক চার্জকে সাময়িকভাবে ধারণ করে রাখার প্রযুক্তিগত সাফল্য অর্জন করা সম্ভব হয়। এই চার্জ ধারণ করে রাখার পদ্ধতির প্রয়োগে আবিষ্কৃত হয় আইকোনোস্কোপ নামক টি-ভি ক্যামেরা টিউব। এর ফলে ক্যামেরা টিউবে বিরাজমান সম্প্রচারকালীন একটি প্রকট সমস্যার চিরস্থায়ী সমাধান করা সম্ভব হয়। আজ পর্যন্ত এই পিকচার টিউবটিই ব্যবহার করা হচ্ছে। তিনি বলেছেন যে, টেলিভিশন প্রযুক্তিতে এটাই ছিল তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান।

এই পদ্ধতি আবিষ্কারের পূর্বে প্রচলিত পদ্ধতিতে একটিমাত্র ফটোসেলের সাহায্যে যে কোনো প্রতিচ্ছবিকে ধীরে ধীরে আংশিকভাবে স্ক্যান করা হতো। ফলে ছবির প্রতিটি অংশ একটিমাত্র ফটোসেল দ্বারা অত্যন্ত কম সময়ের জন্য আলোকিত হতো। এর ফলে খুব কম শক্তির চার্জ সৃষ্টি হতো। বাধ্য হয়ে কার্যক্ষম সিগনাল তৈরির জন্য ছবিটিকে অত্যন্ত উজ্জ্বল আলোকে আলোকিত করার প্রয়োজন হতো। তিনি এই পদ্ধতির পরিবর্তন করে নতুন পদ্ধতিতে ছবিটাকে একটি মাইকা শীটের উপর স্থাপিত অনেকগুলো ফটোসেলের মাঝে প্রতিফলিত করেছিলেন। মাইকা শীটের পিছনে একটি বিদ্যুৎ–পরিবাহী পাত লাগানো ছিল। প্রতিটি ফটোসেল একটি ক্যাপাসিটর হিসেবে কাজ করতো এবং এগুলোর প্রতিটিই একে অন্য থেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করা ছিল। যখন স্ক্যানিং ইলেকট্রন আলোকরশ্মির দ্বারা ক্যাপাসিটরগুলো একের পর এক ডিসচার্জ করা হয় তখন একই সময়ে একটি ভিডিও সিগনালকে কনডাকটিং প্লেটের মধ্যে ইনডিউসড করে প্রবাহিত করা হয়। অনেকগুলো ফটোসেলকে মোজাইকের মতো বিন্যস্ত করে ছবির ধারাবাহিকতা বজায় রাখার পরিকল্পনাটি খুবই জটিল ব্যাপার ছিল। ১৯২৩ সালে সোরিকিন যে পেটেন্টের জন্য আবেদন করেছিলেন সেটাতে এ

সবের কিছুই উল্লেখ ছিল না, কিন্তু ১৯২৫ সালের পেটেন্টে এ সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ করা হয়েছিল, তবে স্টোরেজ কথাটি উল্লেখ করা হয় নি। ১৯২৯ সালে উদ্ভাবিত টিউবে এই মোজাইক ফটোসেলের প্রথম ব্যবহার করা হয়। রিভেটের সাহায্যে পর্দার মধ্যে বিভিন্ন ছিদ্রের ভিতর পিন আপ করে ফটোসেলগুলো বসানো হয়েছিল। ১৯৩১ সালে এটাকে আরো উন্নত করে ডাবল সাইডের পরিবর্তে সিংগেল সাইডেড ইনসুলেটেড টারগেট লাগানো হয় এবং লাইনিং অথবা ইভাপোরেশন পদ্ধতিতে ফটোসেনসিটিভ ধাতব পদার্থের মোজাইক তৈরি করা হয়। এইরূপ জটিল প্রক্রিয়ায় উদ্ভাবিত নতুন পিকচার টিউবটির নামই আইকোনোস্কোপ।

১৯৩১ সালে সোরিকিন ও তাঁর সহকর্মীরা সিংগেল সাইডেড টার্গেট ও লাইনিং এবং ইভাপোরেশন পদ্ধতিতে মোজাইক বানানোর জটিল প্রক্রিয়াজাত কৌশল আবিষ্কার করেন। RCA কোম্পানির একজন রসায়নবিদ মোজাইক ফটোসেল বানানোর উন্নততর ও সহজতর পদ্ধতির উদ্ভাবন করতে সমর্থ হওয়ায় আইকোনোস্কোপ তৈরি করা সহজ হয়ে যায়। এর পরেও আরো আনুষঙ্গিক উন্নয়ন সাধনের পর ১৯৩৩ সালের ২৬ জুলাই সরকারিভাবে আইকোনোস্কোপ উদ্ভাবনের কথা জনসমক্ষে প্রকাশ করা হয়। ইতিমধ্যে গ্রেট ব্রিটেনে EMI-এর বৈজ্ঞানিক জে. ডি. ম্যাকগী এবং ডব্লিউ. এফ. টেডহাম পৃথক পৃথকভাবে ১৯১২ সালে বিজ্ঞানী সুইনটনের দেয়া তত্ত্বের ভিত্তিতে একই ধরনের ক্যামেরা টিউব উদ্ভাবন করেন, কিন্তু তাঁরা যখন এটার পেটেন্টের জন্য আবেদন করেন তখন তাঁদের আবেদন এই বলে বাতিল করে দেয়া হয় যে ইতিমধ্যেই RCA কোম্পানি একই ধরনের পেটেন্টের জন্য আবেদন করে রেখেছে। EMI তাঁদের পেটেন্টের জন্য আবেদন করেছিল ১৯৩২ সালের শেষের দিকে, আর RCA কোম্পানি আবেদন করেছিল ১৯৩১ সালের জুন মাসে এবং প্রথম আবেদনটি জমা দেয়া হয় ১৯২৫ সালে। সুতরাং আইনগতভাবে সোরিকিনই সমস্ত কৃতিত্বের অধিকারী হন। সোরিকিন ও তাঁর সহকর্মীরা নিরলস সাধনা ও অক্লান্ত পরিশ্রম করে এই টিউবটিকে আরো উন্নত করার প্রচেষ্টায় নিয়োজিত থাকেন। এদিকে সোরিকিনের উৎসাহ ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছিল, একই ল্যাবরেটরি থেকে ইলেকট্রনিক মাইক্রোস্কোপ সর্বপ্রথম বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উৎপাদিত হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলাকালে তিনি বিমানের অগ্নিনির্বাপন ব্যবস্থার উন্নয়ন, গাইডেড মিসাইল, স্লিপারস্কোপ এবং রেডারের উপর গবেষণা করেছিলেন। যুদ্ধশেষে হাই স্পীড ইলেকট্রনিক মেমোরি এবং পরবর্তীকালে মেডিকেল ইলেকট্রনিকসে খুবই উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে গবেষণায় নিয়োজিত ছিলেন। ১৯৫৪ সালের ১ অক্টোবর RCA কোম্পানি থেকে অবসর গ্রহণ করেও এই কোম্পানির সাথে তিনি দীর্ঘদিন যুক্ত

ছিলেন। পরে এই কোম্পানির ভাইস পেসিডেন্টও নির্বাচিত হয়েছিলেন। নিউইয়র্কের রকফেলার ফাউন্ডেশনের মেডিকেল ইনস্টিটিউটের পরিচালক হিসেবেও তিনি নিয়োজিত হন। ১৯৮১ সালে নব্বই বছর বয়সেও তিনি নিয়মিতভাবে সকালে অফিসে গিয়ে তাঁর প্রজেকটের কাজ তদারক করতেন, নিয়মিতভাবে বিজ্ঞান সাময়িকী পড়তেন ও সাঁতার কাটতেন। দীর্ঘ কর্মময় জীবনে তিনি মোট ২৭টি পদকে ভূষিত হন, এগুলোর মধ্যে ১৯৬৫ সালে IEE প্রদত্ত ফ্যারাডে মেডেল এবং ১৯৬৬ সালে অ্যামেরিকান ন্যাশনাল মেডেল অফ সাইন্স পদক উল্লেখযোগ্য। ১৯৫৯ সালে সোভিয়েট রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী ক্রুশ্চভ এবং যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ারের মধ্যে সম্পাদিত বৈজ্ঞানিক ও সাংস্কৃতিক সফর বিনিময় কর্মসূচির অংশ হিসেবে তিনি একজন বিশেষ সম্মানিত রাষ্ট্রীয় অতিথি হিসেবে মস্কো সফর করেন।

সবাই তাঁকে একজন অত্যন্ত বন্ধুবৎসল ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন বর্ণনা করতে খুব ভালোবাসতেন। এর মধ্যে একটি ঘটনা তিনি প্রায় উল্লেখ করতেন, সেটি হলো ১৯১৯ সালে সর্বপ্রথম যুক্তরাষ্ট্র যাওয়ার পথে জাহাজে ভ্রমণকালে তাঁর ডিনার স্যুট না থাকায় ডাইনিং রুমে ঢোকার অনুমতি না পেয়ে বাধ্য হয়ে তাঁকে কেবিনে বসে খাবার খেতে হতো। টেলিভিশনে বিভিন্ন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রচারিত টি-ভি অনুষ্ঠানের কর্মসূচির একজন কঠোর সমালোচক হিসেবে তিনি বলতেন যে, আজেবাজে টি-ভি প্রোগ্রাম দর্শকদের উপর, বিশেষ করে শিশুদের মনের উপর, খুবই বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। তাই তিনি আজেবাজে উদ্দেশ্যবিহীন প্রোগ্রামের চেয়ে শিক্ষামূলক ও উদ্দেশ্যমুলক প্রোগ্রাম প্রচারের পক্ষে ছিলেন। ১৯৮২ সালের ৩০ জুলাই ৯৩ বৎসর বয়সে ভ্লাদিমির কোসমা সোরিকিন মৃত্যুবরণ করেন। তিনি স্ত্রী, কন্যা ও সাতজন নাতি–নাতিনী রেখে গিয়েছেন।

টেলিভিশন সেটের সামনে বসে কোটি কোটি দর্শক যখন আনন্দ উপভোগ করে, তাঁরা কিন্তু মুহূর্তের জন্যও সোরিকিনের কথা মনে করে না, কিন্তু যাঁরা টেলিভিশন সেট তৈরি, সম্প্রচার ইত্যাদির সাথে জড়িত তাঁরা প্রতি মুহূর্তেই অনুভব করে থাকেন যে আইকোনোস্কোপ, ভিডিকন টিউব না থাকলে তাঁদের কতই না কষ্ট হতো। "ঘরে বসে ছবি দেখা ও কথা শোনা" মানুষের অনেক দিনের এই স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করে সোরিকিন ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন।

এডউইন হাওয়ার্ড আর্মস্ট্রং

(১৮৯০—১৯৫৪)

রেডিওর বিস্ময়কর প্রতিভা

ছাত্র অবস্থাতেই গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার করে কৃতিত্বের অধিকারী হওয়ার মতো সৌভাগ্য খুব কম বিজ্ঞানীর ভাগ্যেই ঘটেছে। কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থাকাকালে একটি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারসহ মোট তিনটি বড় রকমের উদ্ভাবন করে বিখ্যাত বিজ্ঞানী এডউইন হাওয়ার্ড আমস্ট্রং রাতারাতি খ্যাতি ও সম্মানের শীর্ষে উঠেছিলেন। এগুলো তাঁকে যেমন সম্মান ও প্রাচুর্য দিয়েছিল, তেমনি তাঁকে এর জন্য অনেক বিপদেও পড়তে হয়েছিল। ১৮৯০ সালে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরে রেডিও–প্রযুক্তির বিস্ময়কর প্রতিভা আমস্ট্রং জন্মগ্রহণ করেন। তাঁকে যেমন সম্মান ও প্রাচুর্য দিয়েছিল, তেমনি তাঁকে এর জন্য অনেক বিপদেও পড়তে হয়েছিল। তাঁর পিতা ছিলেন বিশ্ববিখ্যাত অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস নামক একটি আন্তর্জাতিক প্রকাশনা সংস্থার যুক্তরাষ্ট্রস্থ প্রতিনিধি। তাঁর পিতা তাঁকে চৌদ্দ বছর বয়সে "বালকদের জন্য আবিষ্কারের কাহনী" নামক একটি বই পড়তে দিয়েছিলেন। ঐ বইটা পড়ে তিনি আবিষ্কারকদের সম্বন্ধে এত বেশি আগ্রহী হয়েছিলেন যে, তিনিও তখন মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, ভবিষ্যতে তিনিও একজন নামকরা আবিষ্কারক হবেন। এই তীব্র আকাঙ্ক্ষা মনে পোষণ করে তিনি বিজ্ঞানী মার্কনীর উদ্ভাবিত রেডিওটেলিগ্রাফির উপর পড়াশুনা শরু করেন এবং বাড়ির চিলেকোঠাটিকে তাঁর ল্যাবরেটরিতে পরিণত করে নানা প্রকার ইলেকট্রনিকস যন্ত্রাংশ দিয়ে প্রায় ভরে তোলেন। কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার পর তিনি অধ্যাপক মাইকেল পাপিনের ছাত্র হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন। অধ্যাপক পাপিন নিজে একজন নামকরা বিজ্ঞানী ছিলেন ও লোডিং কয়েলের উপর পেটেন্টের অধিকারী ছিলেন। এই লোডিং কয়েল সেই সময় দূরবর্তী স্থানে টেলিগ্রাফি ও টেলিফোন পদ্ধতিতে ব্যবহৃত হতো। ১৯১৩ সালে গ্রাজুয়েশন লাভের পর তিনি কলাম্বিয়া বিশ্বদ্যিালয়ে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন এবং অধ্যাপক পাপিনের আরো ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য লাভে সমর্থ হন। ইতিমধ্যে তিনি তাঁর সাড়া জাগানো আবিষ্কারটি ক'রে ফেলেছিলেন। সেটি হলো বিখ্যাত রিজেনারেটিভ বা 'ফিডব্যাক' (Feedback) সার্কিট। ১৯০৪ সালে

ইংল্যাণ্ডের বিজ্ঞানী জে.এ. ফ্লেমিং ডায়োড ভাল্‌ব আবিষ্কার করেছিলেন। এটি প্রধানত রেডিও ওয়েভ ডিটেকটর হিসেবে ব্যবহৃত হতো। এর কয়েক বছর পর যুক্তরাষ্ট্রের লি–ডি ফরেস্ট একটি ট্রেটড ভাল্‌ব আবিষ্কার করেন এবং এটি খুব দ্রুত জনপ্রিয়তা লাভ করে। কিন্তু এটি শুধু ডিটেকটর হিসেবে ব্যবহৃত হতো। ১৯১২ সালে একটি অধিকার প্রতিষ্ঠার আইনগত মামলায় এটিকে একটা বাজে জিনিস বলে অভিহিত করা হয়। ১৯১২ কিংবা ১৯১৩ সালের দিকে আর্মস্ট্রং ট্রায়োডের ব্যবহার সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করেন। তিনি একে আরো ব্যাপকতর ক্ষেত্রে প্রয়োগের ব্যাপারে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করে এবং নানা পরীক্ষা–নিরীক্ষা করে আবিষ্কার করেন যে যদি এই ভাল্‌বের অ্যানোডের (Anode) আউটপুটের সামান্য অংশকে ফিডব্যাক করে অর্থাৎ পুনরায় ঘুরিয়ে এনে ইনপুটে পাঠিয়ে দেয়া হয়, তবে এই সামান্য ফিডব্যাক অংশের সাহায্যে ট্রায়োড সার্কিটটি একটি খুব ভালো অ্যামপ্লিফায়ার বা বিবর্ধক হিসেবে কাজ করে এবং যদি ফিডব্যাক কারেন্টের পরিমাণ ধীরে ধীরে বাড়ানো যায়, তবে একটি বিশেষ অবস্থায় এসে গোটা সার্কিটটির কার্যকর ভূমিকার আমূল পরিবর্তন হয়ে যায়। এটি তখন বিবর্ধক হিসেবে কাজ না করে একটি অসসিলেটর বা স্পন্দক হিসেবে কাজ করে, ফলে এটি দিয়ে খুব সুন্দরভাবে নিখুঁত সাইন ওয়েভ তৈরি করা সম্ভব, যা রেডিও ওয়েভ বা টেলিফোন ওয়েভের বাহক হিসেবে কাজ করবে। এই চমৎকার পরিকল্পনাযুক্ত সাড়া জাগানো আবিষ্কারের ফলে অতি অল্প সময়ে তিনি সবার নিকট "ফিডব্যাক আর্মস্ট্রং" নামে পরিচিতি লাভ করেন। এই আবিষ্কার ইলেকট্রনিক্স প্রযুক্তির ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। ফলে এটির পেটেন্টের অধিকারী হওয়া একটি খুবই গরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আর্মস্ট্রং যখন পেটেন্টের জন্য আবেদন করেন ঠিক একই সাথে অন্য আবিষ্কারকেরাও একই পদ্ধতির পেটেন্টের জন্য আবেদন করে বসেন। এঁদের মধ্যে লি.ডি. ফরেস্ট ছিলেন অন্যতম, যিনি ইতিমধ্যেই তাঁর আবিষ্কৃত কয়েকটি পেটেন্ট বিক্রি করে প্রচুর টাকা উপার্জন করেছিলেন। GEC কোম্পানির আরভিং ল্যাংমুয়ের এবং জার্মানির বিজ্ঞানী আলেকজান্ডার মেসনারও একই দাবি করে বসেন।

ছোটবেলার সেই "বালকদের জন্য আবিষ্কারের কাহিনী" পড়ে উজ্জীবিত হয়ে আবিষ্কারক হওয়ার পর আর্মস্ট্রং বুঝতে পেরেছিলেন যে, আবিষ্কারক হওয়ার যাতনা যত না কঠিন তার চেয়ে অনেক বেশি কঠিন হলো সেই আবিষ্কারের অধিকার ধরে রাখা। মাত্র বাইশ বছর বয়সে পেটেন্টের অধিকারের আবেদন দাখিল করার পর পরই তাঁকে লি.ডি. ফরেস্টের সাথে অধিকার আদায়ের মামলায় জড়িয়ে পড়তে হয়

এবং সুদীর্ঘ বিশ বছর ধরে এ মামলা চলতে থাকে। একজন ঐতিহাসিক এই ঘটনায় দুঃখ করে লিখেছিলেন যে, ঐ মামলার পিছনে যে টাকা ব্যয় হয়েছে সে টাকাটা যদি ইলেকট্রনিক্সের উন্নতির পিছনে ব্যয় করা হতো তবে ইলেকট্রনিক্স আরো দ্রুত উন্নতির পথে এগিয়ে যেতো।

AIRE বা আমেরিকান ইনস্টিটিউট অফ রেডিও ইঞ্জিনিয়ার্স থেকে ১৯১৭ সালে তিনি Medal of Honour পদক লাভ করেছিলেন। ১৯৩৪ সালে যখন যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আদালত লি. ডি. ফরেস্টের পক্ষে রায় দিয়েছিল তিনি তখন ঐ পদকটি ফেরৎ দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু AIRE বলেছিল যে, তাঁদের মতে আর্মস্ট্রংই হচ্ছেন সত্যিকারের আবিষ্কারক, সর্বোচ্চ আদালত যাই বলুক না কেন। এই তিক্ত অভিজ্ঞতার কারণেই তিনি মৃত্যুর পূর্বে কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়কে পঞ্চাশ হাজার ডলার দান করে এই ইচ্ছা ব্যক্ত করে গিয়েছেন যে, যদি কোনো বিজ্ঞানী পেটেন্টের জন্য কোনো আইনগত ঝামেলায় পড়ে তবে ঐ টাকা দিয়ে যেন সেটার ব্যবস্থা করা হয়।

যুক্তরাষ্ট্র প্রথম মহাযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। তিনি সেনাবাহিনীর সিগনাল কোরের একজন অফিসার হিসেবে যোগদান করেন। তাঁকে ফ্রান্সে পাঠানো হয়। সেখানে একটি বিশেষ সমস্যা তাঁকে গভীর চিন্তায় নিমগ্ন করে। সমস্যা হলো, কি করে শত্রুপক্ষের বিমানের অবস্থান নির্ণয় করা যেতে পারে। তিনি এটির সমাধান হিসেবে চিন্তা করেন যে, যদি বিমানের ইগনিশন সিস্টেম থেকে সৃষ্ট উচ্চ–কম্পনবিশিষ্ট শব্দতরঙ্গকে কোনোভাবে সনাক্ত করা সম্ভব হয় তবে হয়তো এটির অবস্থান বহুদূরে থাকতেই নির্ণয় করা সম্ভব হতে পারে। কিন্তু তিনি ভেবে পাচ্ছিলেন না, কিভাবে এত উচ্চ–কম্পনমাত্রার শব্দকে বিবর্ধন করা যেতে পারে। যা হোক, অনেক চিন্তাভাবনার পর তিনি একটা সমাধান খুঁজে পেয়েছিলেন, যাকে বলা হয় হেটারোডাইন পদ্ধতি প্রয়োগ। এই পদ্ধতিটি ১৯০৩ সালে বিজ্ঞানী আর.এ. ফেসেনডেন কর্তৃক উদ্ভাবিত হয়েছিলো এবং রেডিও রিসিভারে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছিল। আর্মস্ট্রং চিন্তাভাবনা করে ধারণকৃত উচ্চমাত্রার কম্পনবিশিষ্ট শব্দসঙ্কেতকে দুবার হেটারোডাইন করার পরিকল্পনা করেন। প্রথমবার খুবই অস্পষ্ট শব্দ কম্পনের সাথে মিশিয়ে সেটাকে বর্দ্ধিত করা (ইন্টারমিডিয়েট ফ্রিকোয়েন্সি, IF) এবং দ্বিতীয়বার নিম্ন–কম্পনবিশিষ্ট শব্দের সাথে মিশিয়ে দেয়া। তিনি তাঁর এই নবোদ্ভাবিত সার্কিটের নামকরণ করেন সুপার হেটারোডাইন প্রিন্সিপল, যা আজকাল 'সুপারহেট' নামে সমধিক পরিচিত। যদিও এটি পরবর্তীতে বিমানের দূর অবস্থান নির্ণয়ে ব্যবহৃত হয় নি, কিন্তু রেডিও রিসিভারের স্থায়িত্ব এবং সংবেদনশীলতা বৃদ্ধিতে অনেক সাহায্য করেছিল। আধুনিক সমস্ত

রেডিও–রিসিভার এই সুপারহেট প্রিন্সিপলের উপর ভিত্তি করে তৈরি হচ্ছে। ১৯২০ সালে তিনি সুপারহেট পদ্ধতির পেটেন্ট গ্রহণ করেছিলেন, এবার কিন্তু কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী তাঁকে চ্যালেঞ্জ করেন নি, কারণ এটি ছিল নিঃসন্দেহে সম্পূর্ণরূপে তাঁর নিজস্ব উদ্ভাবন।

ওয়েস্টিং হাউজ কোম্পানির নিকট মাত্র তিন লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার ডলারের বিনিময়ে তিনি সুপারহেট, রিজেনারেটিভ/ ফিডব্যাক ও অন্যান্য সার্কিটের পেটেন্ট স্বত্ব বিক্রি করে ঐ টাকা দিয়ে তাঁর আইনজীবীর ঋণ শোধ করেছিলেন। সমালোচকেরা বলে থাকেন যে, মাত্র তিন লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার ডলারে এতো মূল্যবান কয়েকটি পেটেন্টের স্বত্ব লাভ করায় ওয়েস্টিং হাউজকে নেহায়েতই ভাগ্যবান বলা চলে, যদিও এতে তাঁর জন্য কিছু রয়্যালটির ব্যবস্থা হয়েছিল। পরবর্তী বছরে তিনি আরো একটি নতুন উদ্ভাবনের জন্য পেটেন্টের আবেদন করেন, এটি সুপার রিজেনারেশন পদ্ধতি। ঐটাতে রিজেনারেটিভ সার্কিটে বিদ্যমান একটি অত্যন্ত ক্ষতিকারক সমস্যার সমাধান ছিল। একটি নির্দিষ্ট ফ্রিকোয়েন্সি মাত্রা অতিক্রম করার সাথে সাথে অ্যামপ্লিফায়ারটিতে অবস্থিত অসসিলেশন শুরু হতো। এবার RCA কোম্পানি তাঁর পেটেন্টটি লুফে নেয়, কারণ RCA কোম্পানির জেনারেল ম্যানেজার সুপারহেট সার্কিটের পেটেন্ট নেয়ার প্রতিযোগিতার কারণে RCA কোম্পানির শেয়ারের বিরাট একটা অংশ তাঁর হাতে চলে আসে, ফলে তিনি রাতারাতি লক্ষপতি হয়ে যান। RCA এই সময় ব্যবসায়ে অসামান্য সাফল্য অর্জন করে। কারণ পারস্পরিক বিনিময় চুক্তির বলে তারা ওয়েস্টিং হাউজের নিকট থেকে সুপারহেট পেটেন্টটি পেয়েছিল। রাতারাতি লক্ষপতি বনে যাওয়ায় তিনি RCA কোম্পানির মালিকের সেক্রেটারিকে বিয়ে করে নিজের ভাগ্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। রিজেনারেটিভ সার্কিটের পেটেন্ট স্বত্ব নিয়ে মামলায় ব্যস্ততার মাঝে তিনি রেডিওর ক্ষেত্রে আরো একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় নতুন প্রযুক্তির উদ্ভাবন করেন, সেটি হলো ফ্রিকোয়েন্সি মডুলেশন। প্রথমদিককার রেডিওগুলোতে স্ট্যাটিক সমস্যা বলে একটি প্রকট সমস্যা বিদ্যমান ছিলো, যার ফলে ধারণকৃত রেডিও সিগনালের উচ্চতার পরিবর্তন হতো। যে কোনো ধরনের অ্যামপ্লিচিউড মডুলেশনের রিসিভারে এই অত্যন্ত বিরক্তিকর স্ট্যাটিক ইন্টারফিয়ারেন্স সমস্যাটি জড়িত ছিল এবং এটি দূর করার জন্য অনেক প্রযুক্তিবিদ চেষ্টা করেছিলেন। এই সমস্যাটি সম্বন্ধে অধ্যাপক পাপিন মন্তব্য করেছিলেন যে, স্রষ্টা মানুষকে রেডিও দান করেছেন, আর শয়তান স্ট্যাটিক ইন্টারফিয়ারেন্স সৃষ্টি করেছে। ছাত্রাবস্থায় আর্মস্ট্রং অধ্যাপক পাপিনের সাথে এই সমস্যাটি নিয়ে কিছু আলাপ–আলোচনা ও চিন্তাভাবনা করেছিলেন। ১৯২০ সালের দিকে তিনি এটিকে একটি বিরাট সমস্যা বলে উল্লেখ করে

বলেছিলেন যে, যতগুলো সমস্যার সম্মুখীন তিনি হয়েছিলেন সেগুলোর মধ্যে এটাই ছিল সবচেয়ে প্রকট এবং যে দিক দিয়েই এটিকে ভেদ করতে চেয়েছেন সেই দিকটাই দুর্ভেদ্য পাথরের দেওয়ালের মতো মনে হয়েছে। অবশেষে দীর্ঘকাল কঠোর পরিশ্রম ও সাধনার বলে তিনি এ সমস্যার সমাধান করে ইলেকট্রনিক্স-প্রযুক্তিতে এক নবদিগন্তের সূচনা করেছিলেন ঠিকই, কিন্তু এটির জন্য পরে তাঁর জীবনটা দুঃখ, কষ্ট ও যাতনায় ভরে উঠেছিল এবং পরিণামে তিনি আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছিলেন। তাঁর উদ্ভাবিত ফ্রিকোয়েন্সি মডুলেশন সম্বন্ধে পূর্বেও লোকের ধারণা ছিল। ১৯০২ ও ১৯২০ সালে এটির উপর কিছু কাজকর্ম ও প্রচেষ্টা চালানো হয়, কিন্তু অ্যামপ্লিচিউড মডুলেশনের মতো ততটা গুরুত্ব দেয়া হয় নি। এটির ব্যান্ড-ব্যাপ্তি বা ফ্রিকুয়েন্সিকে যথাসম্ভব কম রাখা হতো, যাতে এটির ভিতর দিয়ে ইন্টারফিয়ারেন্স প্রবাহিত হতে না পারে, অথচ সিগনাল অতি সহজেই চলে যেতে পারে। এইভাবে চিন্তাভাবনা করার কারণে এটির বাস্তব প্রয়োগ কোনো দিনই সম্ভব হয় নি। ফলে এটি বর্জন করা হয়েছিল। তদুপরি এটির গাণিতিক সমাধানও এতো বেশি জটিল ও দুরূহ ছিল যে, এটিকে সবাই সম্পূর্ণরূপে নিষ্প্রয়োজনীয় বলে মনে করতেন। আর্মস্ট্রং কিন্তু এই জিনিসটিকে সম্পূর্ণভাবে নতুন এক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার-বিশ্লেষণ করে ঘোষণা করেন যে, সবাই এটিকে যেভাবে ব্যবহার করতে যেয়ে ব্যর্থ হয়েছে তিনি তা থেকে ভিন্নভাবে অগ্রসর হয়ে এটির যথার্থতা প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি বলেছিলেন যে, ফ্রিকোয়েন্সি মডুলের গাণিতিক সমাধানের সম্পূর্ণ বিপরীত চিন্তাধারায় অগ্রসর হয়ে তিনি ইন্টারফিয়ারেন্স বা নয়েজের পরিমাণ কয়েক হাজার গুণ কমাতে সক্ষম হয়েছেন এবং এতে ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ড কমে না যেয়ে বরঞ্চ আরো বেড়ে গিয়েছিল। তাঁর এই মতবাদ প্রমাণ করার জন্য তিনি সম্পূর্ণ নিজের খরচে ১৯৩৫ সালের নভেম্বর মাসে একটি ট্রান্সমিটার ও একটি রিসিভার তৈরি করে ১১০ মেগাহার্ৎস ফ্রিকোয়েন্সিতে সর্বপ্রথম পরীক্ষামূলক অনুষ্ঠান সম্প্রচার করেন। এতে সিগনাল নয়েজের অনুপাত ছিল ১০০ ঃ ১। তৎকালীন সর্বশ্রেষ্ঠ অ্যামপ্লিচিউড মডুলেশনের সম্প্রচারকৃত রেডিও স্টেশনের সিগনাল নয়েজ অনুপাত ছিল ৩০ ঃ ১। যা হোক, এর পরের ঘটনা অত্যন্ত করুণ। রেডিও প্রস্তুতকারী বিভিন্ন কোম্পানি তাঁর নবোদ্ভাবিত পদ্ধতি গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানায়, কারণ এটির জন্য সম্পূর্ণ নতুন ধরনের ট্রান্সমিটার স্টেশন ও রিসিভার সেট বানাতে হতো। এটির বিপক্ষে এই বলে যুক্তি দেখানো হয়েছিল যে, উর্ধ্বাকাশে এটি ভালোমতো কাজ করবে না, কিন্তু একই ফ্রিকোয়েন্সিতে অ্যামপ্লিচিউড মডুলেশন খুব ভালোভাবে কাজ করবে। প্রথমে RCA কোম্পানির নিকট তিনি তাঁর নবোদ্ভাবিত পদ্ধতিটি প্রদর্শন করেছিলেন, কিন্তু তারা সেটি গ্রহণে অস্বীকৃতি

জানায় এবং ইলেকট্রনিক টেলিভিশন সম্বন্ধে তাদের উৎসাহ প্রকাশ করে। এতে বিন্দুমাত্র নিরুৎসাহিত না হয়ে তিনি তাঁর কোম্পানির শেয়ারের বিরাট একটি অংশ বিক্রি করে সেই টাকা দিয়ে নিউইয়র্ক শহরের বাইরে একটি নতুন রেডিও স্টেশন তৈরি করেন এবং ১৯৩৯ সালের জুলাই মাসে সেখান থেকে ফ্রিকোয়েন্সি মডুলেটেড (FM) বেতার অনুষ্ঠান প্রচার করে প্রমাণ করেছিলেন যে, FM পদ্ধতি AM পদ্ধতি থেকে অনেক অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ। সে সময় নিউ ইংল্যান্ডে অবস্থিত একটি বেতার স্টেশন খুব খারাপভাবে স্ট্যাটিক সমস্যায় ভুগছিল। তাঁরা FM পদ্ধতিতে সেই সমস্যা থেকে মুক্ত হওয়ার ফলে এটির প্রয়োজনীয়তা প্রমাণিত হয়। ১৯৪০ সালের জানুয়ারির মধ্যে কমবেশি দেড়শতাধিক রেডিও স্টেশন FM সিস্টেম বসানোর পরিকল্পনা করে এবং কুড়িটিরও অধিক প্রতিষ্ঠান তাদের স্টেশন থেকে FM পদ্ধতিতে অনুষ্ঠান সম্প্রচার শুরু করে। এই সাফল্য দেখে উৎসাহিত হয়ে ওয়েস্টিং হাউজ, জেনারেল ইলেকট্রিক এবং জেনিথের মতো বৃহৎ বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহ রিসিভার সেট বানানোর অধিকার পাওয়ার আশায় তাঁর দাবিকৃত রয়্যালটি দিতে স্বীকৃত হয় এবং RCA কোম্পানি এককভাবে দশ লক্ষ ডলারের বিনিময়ে পেটেন্ট স্বত্ব কিনতে গভীর আগ্রহ প্রকাশ করে, কিন্তু তিন তাতে রাজি হন নি। এর পরে আরো সমস্যা দেখা দেয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়ায় সবকিছু পিছিয়ে যায় এবং যুদ্ধশেষে ফেডারেল কম্যুনিকেশন কমিশন (FCC) ফ্রিকোয়েন্সির নতুন মাত্রা (limitation) নির্ধারণ করায় এবং ট্রান্সমিশন স্টেশনগুলোর ক্ষমতা এক–দশমাংশে কমানোর আদেশ জারি করায় প্রায় পঞ্চাশটি রিসিভার বন্ধ ও পাঁচ লক্ষ রিসিভার অকেজো হয়ে যায়। ইতিমধ্যে RCA কোম্পানি এই নতুন পদ্ধতির উপর তাঁর পেটেন্ট অধিকার অস্বীকার করে তাঁকে তার প্রাপ্য পাওনা ও সম্মান থেকে বঞ্চিত করে এবং RCA কোম্পানির দেখাদেখি অন্যান্য ছোট ছোট প্রতিষ্ঠানগুলোও একই পথ অনুসরণ করতে থাকে। বাধ্য হয়ে ১৯৪৮ সালে তিনি RCA কোম্পানির বিরুদ্ধে মানহানি ও বিশ্বাসভঙ্গের অভিযোগ করে মামলা দায়ের করেন। বেশ কয়েক বছর এই মামলা চলতে থাকে। ইতিমধ্যে আরো কুড়িটি কোম্পানির বিরুদ্ধে একই অভিযোগে মামলা দায়ের করা হয়। পাঁচ বছর পরেও কোনো মামলার নিষ্পত্তি হয় নি বা হওয়ার কোনো লক্ষণও দেখা যায় নি। এইরূপে নানাভাবে প্রতারিত ও আশাহত হয়ে তিনি মানসিক দিক দিয়ে এত বেশি বিপর্যস্ত হয়ে যান যে, ১৯৫৪ সালের জানুয়ারিতে এক প্রচণ্ড শীতের রাতে তাঁর নিউইয়র্কের ফ্লাটের ত্রয়োদশতম তলা থেকে ওভারকোট পরিহিত অবস্থায় জানালা দিয়ে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেন। তাঁর এই করুণ ও দুঃখজনক মৃত্যুতে তৎকালে রেডিও প্রস্তুতকারক কোম্পানিগুলোর নিষ্ঠুর ও জঘন্য মানসিকতার প্রতিফলন

ঘটেছিল। রেডিও প্রযুক্তির এক বিরল প্রতিভার প্রতি ব্যবসায়ীদের ধিক্কারজনক ব্যবহার বিশ্বের সমস্ত বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদদের অন্তরে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল। তাঁর মৃত্যুর ষোল মাস পরে বিশ্ববিখ্যাত BBC তাঁদের নতুন প্রোগ্রাম ব্যান্ডে প্রচার করা শুরু করে। তাঁর সুযোগ্য সহধর্মিনী মারিয়া অসমাপ্ত কাজকে সমাপ্ত করার দৃঢ় সংকল্প নিয়ে শত দুঃখকষ্টের মাঝেও আইনগত অধিকার পাওয়ার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখেন। তিনি RCA কোম্পানির সাথে এক সমঝোতায় উপনীত হয়ে স্বামী কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত দশ লক্ষ ডলার গ্রহণ করে সেই টাকা দিয়ে মামলা পরিচালনা করে যেতে থাকেন। স্বামীর মৃত্যুর সুদীর্ঘ তের বছর পর তিনি মামলায় জয়লাভ করে এক কোটি ডলারের ক্ষতিপূরণসহ পরলোকগত স্বামীর অধিকার আদায় করতে সমর্থ হন। এইভাবে সুদীর্ঘ সংগ্রামের পর প্রয়াত বিজ্ঞানী আমস্ট্রং তাঁর অধিকার ফিরে পেয়েছিলেন এবং ঐ পদ্ধতির উদ্ভাবক হিসেবে তাঁর দাবির সত্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়। শত দুঃখকষ্টের মাঝেও সত্যের প্রতিষ্ঠার জন্য নিজ দাবি আদায়ের জন্য তিনি যে সংগ্রাম করে গিয়েছিলেন সেটার ফলস্বরূপ আজ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ বিজ্ঞানীদের প্রতারিত করার মানসিকতা পরিহার করেছে এবং বিজ্ঞানীদের দাবির প্রতি বিশ্বজনমত গড়ে উঠেছে। আধুনিক রেডিওর বিরল প্রতিভা বিজ্ঞানী এডউইন হাওয়ার্ড আর্মস্ট্রং সুপারহেট রিসিভার, ফিডব্যাক সার্কিট ও ফ্রিকোয়েন্সি মডুলেটেড রেডিও স্টেশনের আবিষ্কারের জন্য অমর হয়ে আছেন।

এলেক হারলে রিভ্‌স

(১৯০২–১৯৭১)

পাল্‌স্‌ কোড মডুলেশনের আবিষ্কারক

আধুনিক টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থায় পালস কোড মডুলেশন (পি.সি.এম.) পদ্ধতি একটি অন্যতম প্রধান প্রযুক্তি। কোনো স্টেশন থেকে সম্প্রচারিত সঙ্কেতে নয়েজ (noise) বা বৈদ্যুতিক শোর নিরসনে এর জুড়ি নেই। এটির সাহায্যেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন কর্তৃক নিক্ষিপ্ত কৃত্রিম উপগ্রহ মঙ্গলগ্রহের ছবি ও উপাত্ত ভূ-পৃষ্ঠে প্রেরণ করেছিল। এই পি.সি.এম. পদ্ধতির আবিষ্কারক ব্রিটিশ বিজ্ঞানী এলেক হারলে রিভ্‌স। ইংল্যান্ডের সারে এলাকার রেডহিল নামক স্থানে ১৯০২ সালের ১০ মার্চ তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ১৯২১ সালে লন্ডনের ইম্পিরিয়াল কলেজ থেকে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করে ইন্টারন্যাশনাল ওয়েস্টার্ন ইলেকট্রিক কোম্পানিতে যোগদান করেন। এটি ছিল ইন্টারন্যাশনাল টেলিগ্রাফ এণ্ড টেলিফোন (ITT) কোম্পানির সহযোগী প্রতিষ্ঠান যা পরবর্তীকালে স্ট্যান্ডার্ড টেলিফোন ল্যাবরেটরিজ (STL) নাম গ্রহণ করে। এই STL পরবর্তীতে অনেক ঐতিহাসিক আবিষ্কারের জন্য বিখ্যাত হয়েছে। এই ল্যাবরেটরিতে কর্মরত অবস্থায় রিভ্‌স প্রথমদিকে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পরিচালিত আন্তঃআটলান্টিক টেলিফোন যোগাযোগ ব্যবস্থার সার্কিট উন্নয়নের উপর কাজ করেন। ১৯২৭ সালে ITT প্যারিসে তাদের নতুন ল্যাবরেটরি উদ্বোধন করে তাঁকে সেখানে বদলি করে দেয় এবং ১৯৪০ সালে জার্মানি কর্তৃক অধিকৃত হওয়া পর্যন্ত তিনি সেখানে কর্মরত থাকেন।

প্যারিস ল্যাবরেটরিতে ITT কর্তৃপক্ষ ও গবেষকরা 'সুপার হাই ফ্রিকোয়েন্সি' (SHF) এবং 'আলট্রা হাই ফ্রিকোয়েন্সি' (UHF) ব্যান্ড ব্যবহার করে টেলিফোন যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের কথা চিন্তাভাবনা করছিলেন। কিন্তু এই ব্যবস্থায় বিরাট একটি সমস্যা বর্তমান ছিল, আর তা হলো 'নয়েজ' বা বৈদ্যুতিক শোর তথা অবাঞ্ছিত সিগনালের উপস্থিতি। আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেল কর্তৃক উদ্ভাবিত টেলিফোন ব্যবস্থায় অ্যানালগ সার্কিট ব্যবহৃত হতো। ফ্রিকোয়েন্সি ডিভিশন মাল্টিপ্লেক্সিং (FDM) ব্যবস্থার উদ্ভাবন হওয়ার ফলে একসাথে অনেকগুলো চ্যানেলে ট্রান্সমিশন বা সম্প্রচার

ব্যবস্থা চালু হয়েছিল। কিন্তু রিভ্‌সের চিন্তা ভাবনা ছিল টেলিগ্রাফ পদ্ধতির মতো পাল্‌স্‌ টেকনিক ব্যবস্থা এবং সে সাথে টাইম ডিভিশন মাল্টিপ্লেকসিং ব্যবহার করে অ্যানালগ ব্যবস্থার পরিবর্তে নতুন একটি কার্যকর পদ্ধতির উদ্ভাবন করা যায় কি না তার চেষ্টা করা। অনেক চিন্তাভাবনা করে তিনি পাল্‌স্‌ অ্যামপ্লিচিউড মডুলেশন (PAM) পদ্ধতির সাহায্যে একটি কার্যকর পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছিলেন ঠিকই, কিন্তু যেহেতু এই পদ্ধতিতে পাল্‌সের উচ্চতার উঠানামা হতো তাই এটাতেও প্রচলিত অ্যানালগ পদ্ধতির মতো অবাঞ্ছিত সিগনালের ঝামেলা বিদ্যমান ছিল। ১৯৩৭ সালের দিকে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, উচ্চতার পরিবর্তনীয় পাল্‌স্‌ ব্যবহার না করে অপরিবর্তনীয় উচ্চতাসম্পন্ন অর্থাৎ একই উচ্চতাবিশিষ্ট পাল্‌স্‌ অর্থাৎ পুরাতন টেলিগ্রাফ ব্যবস্থার মতো পাল্‌স্‌ ব্যবহার করতে হবে। এই পাল্‌সের বৈশিষ্ট্য হলো এগুলোর সাথে অবাঞ্ছিত সিগনাল যুক্ত হলেও সিগনাল প্রেরণে কোনো প্রকার অসুবিধে হয় না, এগুলো 'একবার আছে আরেকবার নেই' অর্থাৎ ডিজিটাল পদ্ধতির বাইনারি কোডের মতো শূন্য (নেই) ও এক (আছে) এইভাবে প্রবাহিত হয়। অন্যকথায়, তিনি ডিজিটাল পদ্ধতির টেলিফোন ব্যবস্থা উদ্ভাবনে সংকল্পবদ্ধ হন।

আজকাল ডিজিটাল টেকনিকের ব্যাপক প্রয়োগ দেখে কোনোভাবেই বোঝা সম্ভব নয় যে, আজ থেকে পঞ্চাশ বৎসর আগে ডিজিটাল পদ্ধতির উদ্ভাবন করতে গিয়ে তাঁকে কি ধরনের মানসিক পরিশ্রম করতে হয়েছিল। তিনি প্রথম পাল্‌সের প্রস্থকে সিগনালের উচ্চতা হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন। এটিকে এখন পাল্‌স্‌ উইড্‌থ মডুলেশন (পি.ডব্লিউ.এম.) বলা হয়। কিছু দিন পরেই তিনি উপলব্ধি করেন যে, পাল্‌সের প্রথমাংশ ও শেষাংশকে ছোট ছোট পাল্‌সের দ্বারা উপস্থাপন করা সম্ভব। অথবা একটি নির্দিষ্ট মেয়াদি বা ক্ষণস্থায়ী পাল্‌স্‌ ব্যবহার করা যায়, যার অবস্থান একটি নির্দিষ্ট সময়ের সাথে আপেক্ষিকভাবে ঐ মুহূর্তে যে কোনো সঙ্কেতের উচ্চতার পরিমাপ হিসেবে প্রকাশ করা সম্ভব। এই পদ্ধতিকে পাল্‌স্‌ ডিউরেশন মডুলেশন (PDM) এবং পাল্‌স্‌ পজিশন মডুলেশন (PPM) বলা হয়। এই পদ্ধতি প্রাথমিক যুগে সুপার হাই ফ্রিকোয়েন্সি রেডিও যোগাযোগ ব্যবস্থায় ব্যবহৃত হতো। পাল্‌স্‌ ডিউরেশন মডুলেশন ব্যবস্থা ছিল নিঃসন্দেহে একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার। কিন্তু একটিমাত্র সমস্যার কারণে এটির ব্যবহার জনপ্রিয়তা লাভ করে নি। সেটি হলো এই ব্যবস্থায় অবাঞ্ছিত সিগনালের উপস্থিতি সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত করা সম্ভব হয় নি, ফলে সঙ্কেত পাল্‌সের অবস্থানের পরিবর্তনের কারণে সঙ্কেতের বিকৃতি ঘটতো। এটি বহুগুণে বেড়ে যায় যখন সিগনালটি বেশ কয়েকটি রিপিটার স্টেশনের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত

হয়। এই সমস্যার স্থায়ী একটা সমাধান করার পরিকল্পনা হিসেবেই তিনি অনেক ভেবেচিন্তে টেলিগ্রাফ পদ্ধতির মতো পাল্‌স্ ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, যেটির প্রবাহ–পদ্ধতি একবার থাকে (১) আর একবার থাকে না (০)। এর জন্য শুধু সিগনালের নমুনা নিলেই চলবে না। ঐ নমুনার উচ্চতাকে টেলিগ্রাফ পদ্ধতির মতো আছে–নাই (০–১) অর্থাৎ বাইনারি (binary) পাল্‌সে পরিবর্তিত করতে হবে। তিনি নিজস্ব ডিজাইনকৃত কাউন্টারের সাহায্যে দুই পাল্‌সের মধ্যবর্তী সময়ের পরিমাপ করে অ্যানালগ সিগনালকে ডিজিটাল সিগনালে পরিবর্তিত করার পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। আবার এটিকে অ্যানালগে পরিবর্তন করার সার্কিটও উদ্ভাবন করেন। ১৯৩৮ সালে পেটেন্ট সার্কিটে তিনি নমুনা সঙ্কেতের কম্পনমাত্রা (Sampling Frequency) আট (৮) কিলোহার্ৎস এবং একই উচ্চতাবিশিষ্ট ৩২ পাল্‌স্ ব্যবহার করার প্রস্তাব করেছিলেন। তাঁর প্রস্তাবিত পাল্‌স–কোড মডুলেশন পদ্ধতিতে যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রায় সকল সমস্যার সমাধান নিহিত ছিল। কিন্তু একটি মাত্র অসুবিধা তখন ছিল এবং তা হলো ঐ যুগের প্রচলিত প্রযুক্তির সাহায্যে এটিকে বাস্তবে রূপদান করা। অনেক বছর পরে ট্রানজিসটর ও ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট আবিষ্কার হওয়ার ফলে এটিকে বাস্তবে রূপদান করা সম্ভব হয় এবং এটি ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়। কিন্তু এত দীর্ঘ সময় পার হওয়ার ফলে STL কর্তৃক পেটেন্টকৃত পদ্ধতিটির মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ায় তাঁরা এটি থেকে কোনো প্রকার আর্থিক সাফল্য লাভ করতে পারে নি।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর পি.সি.এম. সম্বন্ধে বিভিন্ন দেশে যথেষ্ট উৎসাহ দেখা দেয় এবং অনেকে এটি নিয়ে বেশ চিন্তাভাবনা শুরু করে। বিশেষ করে ১৯৪৭–৪৮ সালের দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নেগেটিভ ফিডব্যাক পদ্ধতির উদ্ভাবক ডক্টর হ্যারল্ড এস. ব্লাকের নেতৃত্বে এর উপর জোর গবেষণা চলতে থাকে।

১৯৪০ সালে রিভ্‌স জার্মান অধিকৃত ফ্রান্স থেকে পালিয়ে ইংল্যান্ডে চলে যান ও রয়্যাল এয়ারক্রাফট প্রতিষ্ঠানে যোগদান করেন। সেখানে একসঙ্গে কয়েকটি গ্রুপের গবেষণায় তিনি নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তন্মধ্যে ১৭–এ নামক একটি গ্রুপের দায়িত্ব ছিল দূর পাল্লার বোমারু বিমানের জন্য একটি নিখুঁত বোমাবর্ষণ পদ্ধতি উদ্ভাবন করা। এই পরিকল্পনাটিও তিনিই প্রথম করেছিলেন এবং এটির সাঙ্কেতিক নাম দিয়েছিলেন OBOE। আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধাস্ত্র তৈরির উপর প্রথম দিকে তাঁর খুবই দ্বিধা ও সংশয় ছিল, কিন্তু ধীরে ধীরে সেটি থেকে মুক্ত হয়ে তিনি গভীরভাবে এ কাজে মনোনিবেশ করেন। এই OBOE–এর কার্যকর পদ্ধতির পরিকল্পনা করেছিলেন বিজ্ঞানী এফ.ই. জোন্‌স্। রিভ্‌সের পরামর্শ ও সাহায্য নিয়েই তিনি এটি করেছিলেন। ১৯৪১ সালের এপ্রিল/মে

মাসের দিকে এটির পরিকল্পনা চূড়ান্ত রূপ লাভ করে এবং সেপ্টেম্বর মাসে বোমারু বিমানে স্থাপন করে এটির বাস্তব কার্যকারিতা পরীক্ষা করা হয়। অত্যন্ত সাফল্যজনকভাবে এর কার্যকারিতা প্রমাণিত হয়। প্রচুর পরিশ্রম ও অর্থব্যয়ে OBOE পদ্ধতিটি উদ্ভাবন ও প্রয়োগ করা হয়েছিল। এই পদ্ধতি উদ্ভাবনের ফলে বোমারু বিমানের সৈনিকেরা বোমা বর্ষণের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি লাভ করে। এই দায়িত্ব অর্পিত হয় বোমা বর্ষণের লক্ষ্যস্থল থেকে শত শত মাইল দূরে অবস্থিত রেডার স্টেশনের অপারেটরের উপর। এটি করা হতো পরস্পর থেকে বেশ দূরে ভূমিতে অবস্থিত দুটি রেডার স্টেশনের সাহায্যে। বোমারু বিমান ও লক্ষ্যস্থল এই দুটোর দূরত্ব অত্যন্ত নিখুঁতভাবে নিরূপণ করার ফলে অব্যর্থ বোমার আঘাতে অক্ষ–শক্তির দফারফা হয়ে গিয়েছিল। OBOE পদ্ধতিতে যখন কোনো বোমারু বিমান লক্ষ্যবস্তুর কাছাকাছি পৌঁছে যেতো তখন বিমানটি রেডার স্টেশন থেকে একটি নির্দিষ্ট দূরত্বে চক্রাকারে বৃত্তাকার পথে আবর্তিত হতে থাকতো, তাই এটি নিশ্চিতভাবে বলা সম্ভব হতো যে, বিমানটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যবস্তুর উপর দিয়েই ঘুরছে কিম্বা খুব কাছাকাছি অবস্থান করছে, যার ফলে ৩০ হাজার ফুট উপর থেকে লক্ষ্যবস্তুর উপর নিখুঁতভাবে আঘাত হানা সম্ভব হতো। প্রথম রেডার স্টেশন থেকে অপারেটর বিমানের পাইলটকে বলে দিতো যে, বিমানটি লক্ষ্যবস্তুর ঠিক উপরে কিম্বা ডাইনে অথবা বাঁয়ে রয়েছে। দ্বিতীয় স্টেশন থেকে বোমারু বিমানের গতিপথ অনুসরণ করে বিমানটি যখন ঠিক লক্ষ্যবস্তুর উপর অবস্থান করতো তখনি বোমা ফেলার সঙ্কেত দেয়া হতো। এই পদ্ধতিটি প্রথম ওয়েলস ও স্টোনবায়ার নামক স্থানে অবস্থিত রেডার স্টেশনের সাহায্যে ২৫০ মাইল দূরত্বে পরীক্ষা করা হয়েছিল। "মসকুইটো" নামক বোমারু বিমান ৩০ হাজার ফুট উপর থেকে নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রার ১৫০ গজের মধ্যে বোমা বর্ষণ করতে সক্ষম হয়। ১৯৪২ সালের ২০ ডিসেম্বর এই পদ্ধতির সাহায্যে সর্বপ্রথম বেলজিয়ামের ফ্লোরেস নগরীতে নিখুঁতভাবে বোমাবর্ষণের মাধ্যমে এর সাফল্য প্রমাণিত হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হওয়া পর্যন্ত তিন বৎসরে সর্বমোট ১০ হাজার বার OBOE নিয়ন্ত্রিত পদ্ধতিতে বোমাবর্ষণ করা হয়। এটি ছিল এক লক্ষ বিশ হাজার বোমারু বিমানের সম্মিলিত বোমা বর্ষণের সমান। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিমান বাহিনীও এই একই পদ্ধতি ব্যবহার করে এক হাজার ছয়শত বার শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে বোমা বর্ষণ করে।

পরবর্তীকালে ব্রিটিশ বিমান বাহিনী প্রধান এয়ার মার্শাল হ্যারিস এই পদ্ধতির উপর মন্তব্য করে বলেছিলেন যে, এমন এক প্রয়োজনীয় মুহূর্তে এটির উদ্ভাবন হয়েছিল যার অবদান কোনো দিনই ভোলা সম্ভব নয়। এয়ার মার্শাল হ্যারিসকে তাঁর কৃতিত্বের

জন্য "বোমাবাজ" উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছিল। অথচ যখন প্রাথমিক পর্যায়ে OBOE সম্বন্ধে চিন্তাভাবনা করা হচ্ছিল তখন বিমান বাহিনীর সদর দফতরের জনৈক উর্ধ্বতন কর্মকর্তা তাঁর ফাইলে মন্তব্য লিখেছিলেন, "যদি আমার ক্ষমতা থাকতো তবে এই OBOE পদ্ধতির উদ্ভাবককে খুঁজে বের করে তাঁকে চাকুরি থেকে বরখাস্ত করতাম যাতে সে এই রকম অবাস্তব ও কাল্পনিক একটি পরিকল্পনা দিয়ে অযথা সময় নষ্ট না করতে পারে অথবা আমাদেরও সময়ের অপচয় না হয়।" ঐ উর্ধ্বতন কর্মকর্তার ধারণা হয়েছিল যে, OBOE–তে যে ট্রান্সমিটার পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছিল সেটি থেকে প্রেরিত সিগনাল শত্রুপক্ষ অতি সহজেই ধরতে সক্ষম হবে এবং ঐ বোমারু বিমানের বারোটা বাজিয়ে দেবে। তাঁর ঐ ধারণা যে কতখানি ভিত্তিহীন ছিল সেটি পরে বোঝা গিয়েছিল। যা হোক, এই অনন্য আবিষ্কারের জন্য চাকুরিচ্যুত না হয়ে বরঞ্চ ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক সর্বোচ্চ বেসামরিক খেতাব Order of the British Empire (OBE)–এ ভূষিত হয়েছিলেন বিজ্ঞানী এলেক রিভ্স।

যুদ্ধশেষে তিনি পুনরায় তাঁর পুরাতন কর্মস্থল STL–এ ফিরে যান এবং ১৯৭০ সালে অবসর গ্রহণ করা পর্যন্ত সেখানেই কর্মরত ছিলেন। চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণ করার পর তিনি একটি কনসালটিং কোম্পানি খুলেছিলেন এবং ব্রিটিশ পোস্ট অফিসের জন্য অপটিক্যাল কম্যুনিকেশন সিস্টেমের উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছিলেন। ১৯৭১ সালে ১৩ অক্টোবর এসেক্সের হারলোতে তিনি পরলোকগমন করেন। তাঁর কোনো সন্তান–সন্ততি নেই।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে তাঁর অবদানের মধ্যে একশতটি পেটেন্ট, তন্মধ্যে পি.সি.এম. এবং ডিজিটাল টেলিফোন সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য, যা তাঁকে ইতিহাসের পাতায় অমর করে রেখেছে। তিনি স্পেন ও দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যে সর্বপ্রথম শর্ট ওয়েভের সাহায্যে রেডিও যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করেন। সহকর্মীরা তাঁর সুমধুর ব্যবহারের জন্য তাঁকে সেইন্ট (saint) বলে ডাকতো। তাঁর সহকর্মী অধ্যাপক কে.ডব্লিউ. কেটারমল তাঁর সম্পর্কে লিখেছেন, যে কেউ তাঁর সংস্পর্শে একবার এসেছে সেই তাঁকে একজন হৃদয়বান ব্যক্তি হিসেবে চিনেছে। তিনি একজন অত্যন্ত সহজ সরল প্রাণবন্ত ব্যক্তিত্ব ছিলেন। সমাজসেবক হিসেবেও তিনি খুবই বিখ্যাত হয়ে উঠেছিলেন। সমাজের যুবক–অপরাধীদের চরিত্র সংশোধন ও সমাজে পুনর্বাসন কাজে তিনি অর্থ, সম্পদ, সময় দিয়ে এবং মনের সম্পূর্ণ আবেগ ঢেলে চেষ্টা করে গেছেন যাতে যুবক–অপরাধীরা তাঁদের মনের বিশ্বাস হারিয়ে না ফেলে। কারণ তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন যে, একমাত্র সঠিক চিন্তার মাধ্যমেই মানুষ সঠিক কর্ম করতে পারে। তিনি নিজে একজন দক্ষ পর্বতারোহী ছিলেন এবং যুবকদেরও খেলাধুলায় খুবই উৎসাহ যোগাতেন।

১৯৭১ সালে জীবন সায়াহ্নে ইঞ্জিনিয়ার ও ম্যানেজারদের এক সম্মেলনে তাঁদের উপদেশ দিয়ে বলেছিলেন, "হয় খুবই দক্ষ হও নতুবা বিলীন হয়ে যাও" অর্থাৎ আগামী পঞ্চাশ বছরে ইলেকট্রনিক্স প্রযুক্তি এত বেশি প্রতিযোগিতামূলক হবে যে, যথাযথভাবে দক্ষতা অর্জন করতে না পারলে ঐ ক্ষেত্রে টিকে থাকাই অসম্ভব হবে। টেলিফোন যোগাযোগ ব্যবস্থায় তাঁর তীক্ষ্ণ দূরদর্শিতার আরেকটি উদাহরণ হলো, ১৯৬০ সালে অপটিক্যাল ফাইবার ও অপটিক্যাল ওয়েভ বা আলোক তরঙ্গ ব্যবহার করার উপর গবেষণারত একটি দলের তিনি নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে লেসার রশ্মির ও অপটিক্যাল ফাইবারের আবিষ্কার তাঁর এই দূরদর্শিতার স্বাক্ষর বহন করে। অপটিক্যাল ফাইবার কেবলের আবিষ্কারক বিজ্ঞানী চার্লস কুয়েন কাও একই ল্যাবরেটরিতে কর্মরত ছিলেন। তিনি তাঁর জীবন–কথায় বিভিন্ন সহকর্মীর কথা উল্লেখ করতে গিয়ে এলেক রিভ্‌স্ সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। এলেক রিভ্‌স্ তাঁর জীবদ্দশাতেই আগামী পঞ্চাশ বছরে ইলেকট্রনিক্স প্রযুক্তির কি কি উন্নতি ও উদ্ভাবন হবে সে সম্বন্ধে পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করে গিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা এতই উন্নত হবে যে বিশ্বের যে কোনো দেশের লোক যে কোনো স্থান থেকে বাড়ি, অফিস, গাড়ি, ট্রেন, প্লেন, জাহাজ অর্থাৎ বিশ্বের যে কোনো স্থানের লোকদের সাথে যোগাযোগ করতে পারবে। অপটো–ইলেকট্রনিক্স পদ্ধতিতে সাতশত চ্যানেলবিশিষ্ট রঙিন ছবি ও স্টেরিও সাউন্ড পদ্ধতিসহ টেলিফোন ব্যবস্থা চালু হবে। ইনফরমেশন স্টোরেজের নতুন পদ্ধতি সম্বন্ধে তিনি বলেছিলেন যে, একসাথে অনেক ইনফরমেশন সঞ্চয় করে রাখা যাবে এবং প্রতি ঘন সেন্টিমিটার স্থানে $১০^{১২}$ অর্থাৎ দশ হাজার কোটি বিট (BIT) তথ্য সঞ্চয় করা সম্ভব হতে পারে। ফলে ১ ঘন্টার একটি রঙিন টেলিভিশন প্রোগ্রাম ১ ঘন সেন্টিমিটার বস্তুর ভিতর ধরে রাখা সম্ভব হবে। সর্বশেষ লক্ষ্য হবে প্রতি অ্যাটমে একটি করে বিট সঞ্চয় করা, অর্থাৎ প্রতি ঘন সেন্টিমিটারে $১০^{২৩}$ বিট তথ্য সঞ্চয় করা থেকেই বোঝা যায়, চিন্তার রাজ্যে তিনি কোথায় অবস্থান করতেন। উল্লেখ্য, তাঁর কথাগুলো এর মধ্যেই যথার্থ বলে প্রমাণিত হয়েছে। তাঁর প্রস্তাবগুলো বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির জগতে এক বিরাট বিপ্লবের সূচনা করেছে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এই মহান সাধককে বহু পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। এর মধ্যে 'কমান্ডার অফ দি ব্রিটিশ এমপায়ার' উপাধি, যুক্তরাষ্ট্রের IEEE কর্তৃক বিশেষ সম্মান, জার্মানির ফ্রাঙ্কলিন ইনস্টিটিউট প্রদত্ত সম্মান এবং ITT কর্তৃক প্রদত্ত বিশেষ একটি ট্রফি ও মোটা অঙ্কের পুরস্কার অন্যতম। তাঁর জীবনের সবচেয়ে দুর্লভ সম্মান হচ্ছে, ১৯৬৯ সালে ব্রিটিশ পোস্ট অফিস কর্তৃক তাঁর সম্মানার্থে একটি বিশেষ স্মারক ডাকটিকেট প্রকাশ এবং তাঁকে পাল্‌স্ কোড মডুলেশনের আবিষ্কারক হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে বিশ্বের অন্যতম সেরা আবিষ্কারক বলে বর্ণনা করা।

উইলিয়াম ব্র্যাডফোর্ড শক্‌লি
জন বারডিন
ওয়ালটার হার্ডসার ব্রাটেইন
ট্রানজিস্টরের আবিষ্কারক

যুগে যুগে বৈজ্ঞানিকদের বিশেষ বিশেষ আবিষ্কার মানবসভ্যতাকে রাতারাতি এক পর্যায় থেকে আরেক পর্যায়ে উন্নীত করেছে, যাকে সাধারণ ভাষায় বলা হয় বৈপ্লবিক পরিবর্তন। তেমনি ট্রানজিস্টরের আবিষ্কারও বিশ্ব ইলেকট্রনিক্স প্রযুক্তিতে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা করেছে। তৎকালীন প্রচলিত ভালভ-প্রযুক্তি বদলে গিয়ে ট্রানজিস্টরের যুগে প্রবেশ করে ইলেকট্রনিক্স-প্রযুক্তিকে সহজলভ্যই শুধু করে নি, এই প্রযুক্তিতে নতুন নতুন দিগন্তের উন্মোচন করেছে, যা ট্রানজিস্টর আবিষ্কার না হলে কোনোদিনই সম্ভবপর হতো না। এই আবিষ্কারের কৃতিত্ব একক কোনো ব্যক্তির নয়। এই আবিষ্কারের পিছনে রয়েছে তিনজন বিজ্ঞানীর নিরলস প্রচেষ্টা ও অক্লান্ত সাধনা। এরা হলেন উইলিয়াম ব্র্যাড্‌ফোর্ড শক্‌লি, জন বারডিন এবং ওয়ালটার হার্ডসার ব্রাটেইন। তাঁরা সবাই যুক্তরাষ্ট্রের বেল ল্যাবরেটরিজ-এ কর্মরত থাকা অবস্থায় এই আবিষ্কার করেছিলেন। তাঁদের এই আবিষ্কারের গুরুত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯৫৬ সালে তাঁদেরকে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। ট্রানজিস্টরকে বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার বলে মনে করা হয়। যোগাযোগ, বিনোদন, চিকিৎসা, শিক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প-কারখানা, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে এর অবদান অকল্পনীয়। শত শত বছরে মানবসভ্যতা যতটা না সমৃদ্ধ হয়েছে, মাত্র গত চল্লিশ-পঞ্চাশ বছরে তার চেয়ে অনেক বেশি সমৃদ্ধ হয়েছে শুধুমাত্র ট্রানজিস্টরের কল্যাণে। ১৯৪৭ সালের ১২ ডিসেম্বর বেল ল্যাবরেটরিতে সর্বপ্রথম সাফল্যজনকভাবে এর পরীক্ষা করা হয় এবং এটি প্রথমে ছিল কনটাক্‌ট্ টাইপের। পরে ১৯৫০ সালে জাংক্‌শান ট্রানজিস্টর আবিষ্কৃত হয়। ১৯২৫ সালে "ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকেরা সেমিকনডাক্টর থিওরি আবিষ্কার করার পর থেকে এর বাস্তব প্রয়োগের চেষ্টা চলতে থাকে। কিছুদিন পরেই শুরু হয় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। তখন স্থলপথে যুদ্ধের চেয়ে আকাশ পথে যুদ্ধ বেশি গুরুত্ব লাভ করে। জার্মানির ভি-২ উড়ন্ত বোমার আঘাতে ক্ষতবিক্ষত ইউরোপ উন্নতমানের

রেডার (RADAR) আবিষ্কারে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়। এই প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে জারমেনিয়াম ও সিলিকনের (silicon) বিশেষ গুণাবলির জন্য এই দুটো মৌলিক ধাতু সেমিকন্ডাক্টর প্রযুক্তির মূল উপাদান হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। গোটা দুনিয়ার পদার্থবিদ, রসায়নবিদ ও ধাতুবিদ্যা বিশারদেরা একত্রে প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকেন, যার ফলে পি-এন জাংক্শন (P-N Junction) ডায়োড উদ্ভাবিত হয়। ১৯৪১ সালে বেল ল্যাবরেটরির বৈজ্ঞানিক আর.এস. ওহ্ল এটি আবিষ্কার করেন, যদিও ১৯৩৮ সালে রুশ পদার্থবিদ ডেভিডোভ এ সম্বন্ধে ভবিষদ্বাণী করেছিলেন। ১৯৪৫ সালের জুলাই মাসে বেল ল্যাবরেটরিজের কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, এখন থেকে তাঁরা টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে নতুন ধরনের বিভিন্ন কম্পোনেন্ট আবিষ্কারের চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করবেন। সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিভিন্ন কর্মসূচি নেয়া হয়, যার ফলে মাত্র তিন বছরেরও কম সময়ে সাড়া জাগানো ট্রানজিস্টর আবিষ্কৃত হয়।

ডক্টর ওয়ালটার হার্ডসার ব্রাটেইন (১৯০২–১৯৮৭)

তিনজন আবিষ্কারকের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ এবং সর্বপ্রথম বেল ল্যাবরেটরিজ-এ যোগদানকারী বিজ্ঞানী হলেন ডক্টর ওয়ালটার হার্ডসার ব্রাটেইন। ১৯০২ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি চীন দেশের আময় (Amoy) শহরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা সে সময় একটি প্রাইভেট স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। পরে তাঁরা পুনরায় যুক্তরাষ্ট্রে প্রত্যাবর্তন করে ওয়াশিংটন স্টেটে বসবাস শুরু করেন। ছাত্রাবস্থায় তিনি একজন কুশলী টেকনিশিয়ান হিসেবে সুনাম অর্জন করেন। স্কুলের নিজস্ব বৈদ্যুতিক জেনারেটর বিকল হলে তিনি সেটি মেরামত করে দিতেন। তাঁর এই দক্ষতা পরবর্তীকালে ট্রানজিসটর আবিষ্কারে যথেষ্ট সহায়ক হয়েছিল। ওয়াশিংটনের হুইটম্যান কলেজ থেকে তিনি পদার্থবিদ্যায় স্নাতক ডিগ্রি এবং ১৯২৯ সালে মিনাসোটা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন। ডক্টরেট ডিগ্রি করার সময় তাঁর সুপারভাইজার ছিলেন জন টেটে। এই জন টেটে বার্লিনে বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক হাইনরিখ হার্ৎসের ছাত্র ছিলেন। ডিগ্রি পাওয়ার পর প্রথমে তিনি বেল ল্যাবরেটরিজ-এ চাকুরির চেষ্টা করেন, কিন্তু ব্যর্থ হয়ে ন্যাশনাল ব্যুরো অফ স্ট্যান্ডার্ডের রেডিও বিভাগে সপ্তাহে পঞ্চাশ ডলার বেতনে চাকুরি গ্রহণ করেন। কিছুদিন পরে পুনরায় বেল ল্যাবরেটরিজ-এ চাকুরির চেষ্টা করে সফলকাম হন এবং অবসর গ্রহণ না করা পর্যন্ত সেখানেই কর্মরত ছিলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলাকালে কিছুদিনের জন্য কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে

সাবমেরিন ডিটেকশন প্রযুক্তির উপর কাজ করেন। ১৯৬৭ সালে বেল ল্যাবরেটরিজ থেকে অবসর গ্রহণ করে হুইটম্যান কলেজে ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবে কর্মরত ছিলেন। ১৯৮৭ সালের অক্টোবর মাসে পঁচাশি বছর বয়সে তিনি পরলোক- গমন করেন।

ডক্টর উইলিয়াম শক্‌লি (১৯১০–১৯৮৯)

১৯১০ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি উইলিয়াম শক্‌লি লন্ডনে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন একজন আমেরিকান। বয়সে তিনি ব্রাটেইনের চেয়ে আট বছরের ছোট ছিলেন। পাঁচ বছর বয়সে তিনি পিতামাতার সাথে যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে আসেন এবং সানফ্রানসিসকো শহরের কাছে সান্টাক্লারাতে বসবাস শুরু করেন। ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি থেকে স্নাতক ডিগ্রি এবং ১৯৩৬ সালে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করার পর সরাসরি বেল ল্যাবরেটরিতে যোগদান করেন। তিনি সেমিকনডাক্টর ফিজিক্সের উপর থিসিস করেছিলেন। বেল ল্যাবরেটরিতে তিনি সি.জে. ডেভিডসনের সাথে কাজ করেন। ডেভিডসন ১৯৫২ সালে এল. গারমারের সাথে যুক্তভাবে নোবেল প্রাইজ লাভ করেছিলেন। তিন বছরের জন্য শক্‌লি অন্য একটি বিভাগে ভাল্‌ভ– প্রযুক্তির উন্নয়নের উপর কাজ করেছিলেন। ১৯৩৯ সালে পুনরায় ব্রাটেইনের সাথে সেমিকনডাক্টর ট্রায়োড অর্থাৎ ট্রানজিস্টার উদ্ভাবনের প্রয়াস পান। ইতোমধ্যে বিশ্বের অনেক দেশে সেমিকনডাক্টর ট্রায়োড তৈরির প্রচেষ্টা চলছিল। আমেরিকান নাগরিক জে.ই. লিলেনফিল্ড ১৯২০ সালে এবং ব্রিটিশ নাগরিক হেইল ১৯৩৫ সালে দুটো পেটেন্ট লাভ করেন, ১৯৩৮ সালে বৈজ্ঞানিক আর. হিলস এবং বিজ্ঞানী আর.ডব্লিউ. গল ট্রানজিসটর তৈরির কাছাকাছি পৌছে যান, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁদের প্রচষ্টা বাস্তবে রূপ লাভ করতে পারে নি।

বেল ল্যাবরেটরিজ–এ যোগদানের পরেই ল্যাবরেটরির পরিচালক ডক্টর সারভিন কেলি তাঁকে টেলিফোন এক্সচেঞ্জের মেকানিক্যাল সুইচের পরিবর্তে ইলেকট্রনিক সুইচ উদ্ভাবনের জন্য খুবই উৎসাহ প্রদান করেন, ফলে তিনি ইলেকট্রনিক্সের দিকে ঝুঁকে পড়েন। ১৯৩৯ ও ১৯৪০ সালে শক্‌লি ও ব্রাটেইনের যৌথ প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়, কিন্তু তাঁরা এতে হতাশ না হয়ে ঐ প্রচেষ্টার নাম দেন "সৃষ্টিধর্মী ব্যর্থতা"। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় রেডার প্রযুক্তির উন্নয়নে কাজ করে শক্‌লি সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ "অর্ডার অফ মেরিট" সম্মানে ভূষিত হন। ১৯৪৫ সালে যুদ্ধ শেষ হলে পুনরায় বেল ল্যাবরেটরিতে ফিরে এসে সেমিকনডাক্টর কমপোনেন্টের উপর বিশেষ গবেষকদলের দলনেতা হিসেবে কাজ শুরু করেন। তাঁর দলে ছিলেন ব্রাটেইন, জেরাল্ড পারসন,

রবার্ট গিব্‌নি এবং তরুণ প্রতিভাবান বিজ্ঞানী জন রারডিন। ১৯৫৫ সালে অবসর গ্রহণ করে কেবমেন ইনস্‌ট্রুমেন্টের সহযোগিতায় শক্‌লি নিজ বাসভূমি পাওলো আলটো শহরে "উইলিয়াম শক্‌লি সেমিকনডাক্টর ল্যাবরেটরি" নামক একটি প্রতিষ্ঠানের পত্তন করেন। এই পাওলো আলটো শহরটিই বর্তমানে সারা বিশ্বে "সিলিকন ভ্যালি" (Silicon Valley) নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। তাঁর প্রতিষ্ঠিত ল্যাবরেটরিটি পৃথিবীর বিখ্যাত সেমিকনডাক্টর পণ্ডিত ও বিশেষজ্ঞদের মিলনকেন্দ্রে পরিণত হয়। পরবর্তীকালে এই ল্যাবরেটরির নাম বদলে "শক্‌লি ট্রানজিস্টর" রাখা হয়। এখানে গবেষণার চেয়ে কমপোনেন্ট তৈরিতে অধিক মনোনিবেশ করা হয়। ব্যবসায়ে অভিজ্ঞতা না থাকার কারণে ১৯৬৯ সালে কোম্পানিটি বন্ধ হয়ে যায়। তাঁর প্রতিষ্ঠিত ফ্যাক্টরি থেকে বেরিয়ে এসে আটজন বিশেষজ্ঞ "ফেয়ারচাইল্ড সেমিকনডাক্টর" নামক প্রতিষ্ঠানের সূচনা করেন এবং বর্তমানে এটি বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কোম্পানি হিসেবে পরিচিত। পরে সেখান থেকে সৃষ্ট আরো কিছু বিশেষজ্ঞ আরেকটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। এইভাবে ছোট শান্ত শহরটি বিশ্বের সর্বাপেক্ষা কর্মমুখর সেমিকনডাক্টর প্রযুক্তির শিল্প–নগরীতে রূপান্তরিত হয়। সিলিকন ভ্যালি একটি ঐতিহাসিক পরিচিতি লাভ করেছে। শেষ জীবনে ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে ১৯৮৯ সনের ১২ আগস্ট, শনিবার উইলিয়াম শক্‌লি স্ট্যানফোর্ড শহরে পরলোকগমন করেন।

ডক্টর জন বারডিন (১৯০৮)

যুক্তরাষ্ট্রের উইসকিনসন স্টেটের মেডিসন শহরে ১৯০৮ সালের ২৩ মে বারডিন জন্ম গ্রহণ করেন। ১৯২৮ সালে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং–এ ডিগ্রি এবং ১৯২৯ সালে মাস্টার ডিগ্রি প্রাপ্ত হন। পিতা ছিলেন মেডিকেল কলেজের প্রফেসর। বারডিনের জীবন বিচিত্র অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ। প্রথমে 'গালফ অয়েল' নামক একটি তেল উৎপাদন কেম্পানিতে জিওফিজিসিস্ট হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন, যার সাথে সেমিকনডাক্টরের কোনোই সম্পর্ক ছিল না। তিন বছর পরে তিনি গাণিতিক পদার্থবিজ্ঞানে ডক্টরেট অর্জন করেন এবং সর্বপ্রথম সলিড স্টেট ফিজিক্সের সংস্পর্শে আসেন। হার্ভার্ডে কিছুদিন ফেলো হিসেবে কাজ করে পরে মিনোসোটা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার পেশায় নিয়োজিত হন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হলে ওয়াশিংটনে অবস্থিত নৌবাহিনীর গবেষণাগারে তাঁকে কাজ করতে হয়েছিল। ১৯৪৫ সালে যুদ্ধ শেষ হলে তিনি বেল ল্যাবরেটরিতে শক্‌লির নেতৃত্বে গঠিত সলিড স্টেট ফিজিক্স গবেষণা দলে যোগদান করেন।

প্রথম থেকেই তিনি একটি সলিড স্টেট অ্যামপ্লিফায়ার কি করে বানানো যায় সে সম্বন্ধে চিন্তাভাবনা করছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন যে, ফিল্ড এফেকট প্রযুক্তি দিয়ে একটি সেমিকনডাক্টরের পাতলা পাত ও ধাতব পদার্থের তৈরি পাতলা পাত উভয়কে সমান্তরালভাবে স্থাপন করে প্যারালাল প্লেট ক্যাপাসিটর বানিয়ে একটি প্লেটের ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত করা হলে এটি অন্য প্লেটটির উপর চার্জ ইনডিউস করবেই। প্রথম প্লেটটি যদি ধাতব হয় তবে দ্বিতীয় সেমিকন্ডাক্টর প্লেটটির কনডাকশন প্রক্রিয়াকে অতি সহজেই নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে। এর মানে হল, যদি ধাতব প্লেটের ভিতর দিয়ে কোনো সিগনাল প্রবাহিত হয় তবে ঐ প্রবাহিত সিগনাল সেমিকনডাক্টর প্লেটের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত কারেন্ট বা বিদ্যুৎকে মডুলেট করবে এবং এটি একটি অ্যামপ্লিফায়ার হিসেবে কাজ করবে। এই তত্ত্বটি একটি খুবই সুন্দর তত্ত্ব ছিল এবং পরবর্তীকালে এর উপর ভিত্তি করেই ফিল্ড এফেকট ট্রানজিস্টার তৈরি হয়েছে। কিন্তু ১৯৪৫ সালে উইলিয়াম শক্‌লি যখন তত্ত্বটিকে বাস্তবে প্রয়োগ করার প্রচেষ্টা নেন তখন এটি কাজ করে নি। সেমিকনডাক্টর প্লেটের মধ্যে কোনো প্রকার ইনডিউস্‌ড চার্জ ছিলই না বলা চলে। এই ব্যর্থতার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখা গেল যে, তাত্ত্বিকভাবে পাওয়া ফলাফলের চেয়ে বাস্তবে পাওয়া ফলাফল অর্থাৎ ইনডিউস্‌ড চার্জের পরিমাণ এক হাজার পাঁচশত গুণ কম। শক্‌লি তাঁর এই ফলাফল বারডিনকে দেখালে দুজনেই তখন খুব হতবুদ্ধি হয়ে যান। দীর্ঘ নয় মাস পরে ১৯৪৬ সালে ৯ মার্চ বারডিন ঐ ব্যর্থতার কারণ খুঁজে বের করতে সমর্থ হন। তাঁর এই সফলতাকে শক্‌লি সেমিকনডাক্টর প্রযুক্তির গবেষণাক্ষেত্রে এক অনন্য অবদান বলে উল্লেখ করেছেন। বারডিনের খুঁজে পাওয়া কারণটি ছিল এরকম : যে সারফেস চার্জকে অবলম্বন করে তাঁরা অ্যামপ্লিফিকেশন আশা করেছিলেন সেই সারফেস চার্জগুলো "সারফেস স্টেট্‌সের" ভিতর আবদ্ধ হয়ে পড়ছিল, ফলে অ্যামপ্লিফিকেশন হতে পারে নি। অতঃপর এই "সারফেস স্টেট" এফেকটি গবেষকদের চিন্তভাবনার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। ইতোমধ্যে শক্‌লি প্রস্তাব করেন যে, একের পর আরেকটি স্তরবিশিষ্ট এন ও পি টাইপ সিলিকনের সাহায্যে নির্মিত বিদ্যুৎচৌম্বকরোধক তৈরি করা হলে হয়তো সমস্যার সমাধান হতে পারে। এই পরিকল্পনাটি কিন্তু জাংকশন ট্রানজিস্টর তৈরি করার খুব কাছাকাছি চিন্তাভাবনা ছিল অর্থাৎ আর মাত্র একটি ধাপ এগুলেই ট্রানজিস্টর তৈরি হয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু তাঁরা তখন পি–এন জাংকশন মতবাদের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে ব্যস্ত ছিলেন। জুন মাসের শেষের দিকে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বৈজ্ঞানিক সম্মেলনে যোগ দিতে তাঁরা দুমাস ইউরোপে অতিবাহিত করেন ও বৃস্টল এবং আমস্টারডামে বিভিন্ন বিজ্ঞানীর সাথে দেখা করেন ও বিভিন্ন গবেষণাকেন্দ্র পরিদর্শন করেন।

এইভাবে তাঁদের জ্ঞানের পরিধি আরো বিস্তৃত করে সেপ্টেম্বরে বেল ল্যাবরেটরিতে ফিরে এসে নতুন উদ্যম নিয়ে কাজকর্ম শুরু করে 'এন–পি–এন' –এর গঠনস্তর ব্যবহার করে এটিকে নেগেটিভ রেজিসটেন্স হিসেবে ব্যবহার করার উপায় খুঁজতে থাকেন। এইভাবে তিনি পুনরায় ট্রানজিস্টর তত্ত্বের একেবারে কাছাকাছি পর্যায়ে পৌঁছে যান। নভেম্বরে যখন ফটোভোল্টেজ সম্বন্ধে পরীক্ষা–নিরীক্ষা করছিলেন তখন ব্রাটেইন এবং গিবৃনি (ফিজিক্যাল কেমিস্ট) সারফেস এফেকটের প্রতিরোধমূলক সমস্যার সামাধান করতে সক্ষম হন। তাঁরা ধাতব ও সেমিকডাক্টর উভয় পাতকে ইলেকট্রোলাইটে ডুবিয়ে রেখে এ সমস্যার সুন্দর সমাধান করেন। এই সাফল্যে উৎসাহী হয়ে গোটা দলটাই পূর্ণোদ্যমে কাজ করে যেতে থাকে এবং ফিল্ড এফেক্ট কৃস্টাল ট্রায়োড (ট্রানজিস্টর) সম্বন্ধে সবাই খুব আশাবাদী হয়ে উঠেন। ইলেকট্রোলাইট ব্যবহার করার ফলে সামান্য কিছু অ্যামপ্লিফিকেশন হলো বটে, কিন্তু ফ্রিকোয়েন্সি ছিল খুবই কম। ব্রাটেইন ও বারডিন স্বর্ণপাতকে বাষ্পীভূত করে এন–টাইপ জারমেনিয়ামের উপর হালকা আস্তর দিয়ে এটির অ্যামপ্লিফিকেশন ক্ষমতা বাড়ানোর চেষ্টা করেন। এই সময় খুবই আশ্চর্যজনকভাবে তাঁরা দেখতে পান যে, স্বর্ণপাত থেকে পজিটিভ বায়াসযুক্ত রন্ধ্রগুলো জারমেনিয়ামের দিকে অতি স্বাভাবিকভাবে অগ্রসর হয়ে এটির পরিচালন ক্ষমতার পরিবর্তন সাধন করতে সক্ষম হয়েছে। এতে ফিল্ড–এফেক্ট প্রক্রিয়ার কোনো প্রয়োজনই হলো না। এর ফলে বিশ্বের সর্বপ্রথম ট্রানজিস্টরের মেকানিজম বা কার্যপ্রণালী দেখার সৌভাগ্য বিজ্ঞানীদের হলো সত্য, কিন্তু সেটি এতই দুর্বল ছিল যে, কোনো প্রকার অ্যামপ্লিফিকেশন করা এটির পক্ষে সম্ভব ছিল না। এর পরে তাঁরা বুদ্ধি করে এন–টাইপ জারমেনিয়াম ব্যবহার করে দুটো পয়েন্ট কনটাক্টের মধ্যে ০.০৫ মিলিমিটার ব্যবধান রেখে এটিকে ট্রানজিস্টর হিসেবে কাজ করানোর সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। স্বর্ণকে বাষ্পীভূত করে একটি পলিস্টিরিন গোঁজের শেষ মাথায় সঞ্চিত করে সেটি রেজর ব্লেডের সাহায্যে চেঁছে নিয়ে পয়েন্ট–কনটাক্ট তৈরি করা হয়। এইভাবে সর্বপ্রথম পয়েন্ট–কনটাক্ট ট্রানজিস্টরের জন্ম হয় এবং ফিল্ড এফেক্ট ট্রানজিস্টর তৈরি করতে গিয়ে বাইপোলার উদ্ভাবিত হয়। শক্লির বর্ণনাতে তারিখটি ছিল ১৯৪৭ সালে ১৬ ডিসেম্বর, কিন্তু ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে ২৩ ডিসেম্বর। কারণ ঐদিন আনুষ্ঠানিকভাবে বেল ল্যাবরেটরিজ–এর কর্তৃপক্ষকে ট্রানজিস্টরটি প্রথম প্রদর্শন করা হয়েছিল। বিশ্ববাসী কিন্তু ঘটনাটি জেনেছিল ১৯৪৮ সালের ১ জুলাই। এই বাইপোলার ফিল্ড এফেক্ট ট্রানজিস্টর আবিষ্কারের খবরটি ছিল ১৯৪৭ সালে খ্রিষ্টমাস উৎসবের সর্বশ্রেষ্ঠ উপহার। এই ঘটনার কিছুদিন পরেই অর্থাৎ ২০ জানুয়ারি শক্লি জাংকশান ট্রানজিস্টর আবিষ্কার করে নববর্ষের আরেকটি উপহার

দিয়েছিলেন। ১৯৫১ সালে সাফল্যজনকভাবে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে জাংকশান ট্রানজিস্টর তৈরি শুরু হওয়ার ফলে পয়েন্ট কনটাক্ট্ ট্রানজিস্টর তৈরি বন্ধ করে দেয়া হয়। ১৯৫১ সালে বারডিন অবসর গ্রহণ করে ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রফেসর হিসেবে নতুন কর্মজীবন শুরু করেন এবং ১৯৭৫ সালে প্রফেসর ইমেরিটাস হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন। ১৯৫৬ সালে শক্‌লি এবং ব্রাটেইনের সঙ্গে একত্রে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হওয়ার সুদীর্ঘ ষোল বছর পরে একদিন খুব ভোরবেলা সুইডেন থেকে টেলিফোনে তাঁকে পুনরায় নোবেল প্রাইজ দেয়ার আনন্দময় ঘোষণাটি জানানো হয়। এবার প্রফেসর এল.পি. কুপার ও প্রফেসর জে.আর শ্রিফারের সাথে যৌথভাবে সুপারকনডাকটিভিটি থিওরির জন্য তাঁকে পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। সেদিন অসংখ্য টেলিফোনের অভিনন্দনের জওয়াব দিতে গিয়ে তিনি সকালের নাশতা খেতে পারেন নি, এক পর্যায়ে বাধ্য হয়ে টেলিফোনের রিসিভার তুলে রেখেছিলেন। সেই দিন সকালে বাইরে বেরোবার সময় গ্যারেজের দরজা খোলা যাচ্ছিল না। সবাই মজা করে বলছিল যে, গ্যারেজের দরজার কন্ট্রোল সার্কিটের ট্রানজিস্টর খারাপ হওয়ার দরুন এটি ঘটেছে। আসলে কিন্তু সেটি নয়, সুইচটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। যা হোক, এ গল্পটি শোনার পর বারডিন প্রাণ খুলে হেসেছিলেন। জীবনে পর পর দুটো নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হয়ে তিনি এক অসাধারণ ইতিহাস সৃষ্টি করে বেঁচে আছেন।

ট্রানজিস্টরের কল্যাণে ইলেকট্রনিক্স আজ বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং প্রয়োজনীয় একটি নাম। সিলিকন ভ্যালি ও সিলিকন চিপস আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রতীক হিসেবে বিরাজমান। তিন প্রতিভাবান বিজ্ঞানী বেল ল্যাবরেটরিতে যে প্রযুক্তির সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তা পৃথিবীতে ক্রমপ্রসারমান, এর লক্ষ্য আরো সুদূরপ্রসারী।

জন ভন নিউম্যান

(১৯৩০–১৯৫৭)

কমপিউটার প্রযুক্তির অমর প্রতিভা

বিজ্ঞানী জন ভন নিউম্যান বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ অঙ্কশাস্ত্রবিদ হিসেবে বিখ্যাত হয়েছিলেন। তাঁর সম্বন্ধে যতটুকু জানা সম্ভব হয়েছে তাতে অতি সহজেই বোঝা যায় যে, তিনি এক বিরল প্রতিভা ও অসাধারণ মেধাশক্তির অধিকারী ছিলেন। যে সমস্যার সমাধান করতে অন্যদের যুগের পর যুগ প্রয়োজন হতো সেটি তিনি এক পলকে সমাধান করে দিতেন। বিদ্যুৎগতিতে মনে মনে অঙ্কের সামাধান করতে তাঁর জুড়ি ছিল না এবং বিগত দিনের হাজারো স্মৃতি থেকে যে কোনোটি মুহূর্তের মধ্যে তিনি স্মরণ করতে পারতেন। বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখায় তাঁর অদ্ভুত মেধাশক্তির প্রমাণ পেয়ে বিজ্ঞানীরা তাঁর সম্বন্ধে মন্তব্য করতেন যে, তিনি মানুষের মানসিক শক্তির প্রসারের ক্ষেত্রে এক নতুন সম্ভাবনার উজ্জ্বল প্রতীক হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

১৯০৩ সালের ২৮ ডিসেম্বর হাংগেরির বুদাপেস্ট নগরীতে এক ধনাঢ্য ব্যাংক ব্যবসায়ী ইহুদি পিতার ঘরে ভন নিউম্যানের জন্ম হয়। তিন ভাইবোনের মধ্যে তিনি ছিলেন সর্বজ্যেষ্ঠ। প্রথমে তাঁকে একটি প্রাইভেট স্কুলে ভর্তি করানো হয়। ১৯১৪ সালে যখন তাঁকে সেকেণ্ডারি স্কুলে ভর্তি করানো হয় তখন স্কুলের শিক্ষক তাঁর অসাধারণ মেধার পরিচয় পেয়ে তাঁর সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নেন যে, স্কুলের গতানুগতিক অঙ্ক শেখানো তাঁর জন্য সময়ের অপচয় ব্যতীত আর কিছু নয়। তাই তখনই তাঁকে একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের নিকট অঙ্কশাস্ত্র শেখার জন্য পাঠানো হয়। মাত্র ১৯ বছর বয়সে তিনি অঙ্কশাস্ত্রে একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন এবং তাঁর প্রথম গবেষণা নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। ১৯২১ থেকে ১৯২৩ এ দু' বছর বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং ১৯২৩ থেকে ১৯২৫—দু' বছর জুরিখের পলিটেকনিকে অধ্যয়ন করে ১৯২৬ সালে বুদাপেস্ট বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন। গ্যোটিংগেন বিশ্ববিদ্যালয়ে কোয়ান্টাম মেকানিকসে কিছুদিন গবেষণা করার পর প্রথমে বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয় ও পরে হামবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে লেকচারার হিসেবে কর্মরত ছিলেন। ১৯৩০ সালে তিনি যুক্তরাষ্ট্রে চলে যান। এ সম্বন্ধে তিনি পরে মন্তব্য

করেছিলেন যে, যুক্তরাষ্ট্রের মতো একটি বৃহৎ গণতান্ত্রিক দেশ, যেখানে বিজ্ঞান গবেষণার প্রচুর সুযোগ–সুবিধা বর্তমান, সেখানে যেতে পারা যে কোনো বিজ্ঞানীর জন্য সৌভাগ্যই বলা যায়। যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার পর তিনি মেরেটি কোবেসির সাথে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। ১৯৩৫ সালে তাঁদের একমাত্র কন্যা মেরিনা জন্মগ্রহণ করে। ১৯৩০ থেকে ১৯৩৩ পর্যন্ত তিনি প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ে গাণিতিক পদার্থবিদ্যার ভ্রাম্যমাণ অধ্যাপক হিসেবে কাজ করেন। এরপর পরই নবগঠিত ইনস্টিটিউট অফ এডভান্সড্ স্টাডিজে (IAS) তাঁকে নিযুক্ত করা হয়। সেখানে তিনি ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ তরুণ সদস্য, ফলে লোকে তাঁকে ছাত্র বলে প্রায়ই ভুল করে বসতো। ঐ ইনস্টিটিউটে তৎকালীন বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভাধর বিজ্ঞানীদের সমাবেশ ঘটেছিল। উল্লেখ্য, সে সময় সৌভাগ্যক্রমে বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইনও সেখানে ছিলেন।

এত অসাধারণ মেধার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তিনি লেকচারার হিসেবে তেমন দক্ষতা অর্জন করতে পারেন নি, কারণ তাঁর বক্তৃতার বিষয়বস্তু এতো বেশি উচ্চমানের হতো যে, সাধারণ ছাত্রদের পক্ষে সেটি বুঝে উঠা খুবই মুস্কিল হতো। ক্লাশে বক্তৃতা দেয়ার সময় তিনি ব্লাকবোর্ডে খুব দ্রুত লিখতেন এবং কোনো সমস্যার সামাধান করার সময় কিছুদূর পর্যন্ত লিখে সেটি মুছে ফেলতেন, এবং নতুন করে পুনরায় সেটাকে লিখতেন অর্থাৎ ক্লাশের ভিতরই তিনি সে সমস্যার সমাধান করে ফেলতেন, যা সাধারণ ছাত্ররা কিছুতেই বুঝতে পারতো না। ছাত্ররা তাঁর নাম দিয়েছিল "ব্লাকবোর্ড মুছতে মুছতে সমাধান।"

তাঁর অসীম জ্ঞানভাণ্ডার ও অসাধারণ প্রতিভা সম্বন্ধে হাজারো গল্প প্রচলিত রয়েছে। তিনি সর্বদা খুব ধোপদুরস্ত পোশাক পরতেন এবং খুব স্মার্টভাবে চলাফেরা করতেন। এজন্য সহকর্মীরা তাঁকে ঠাট্টা করে বলতো, "জনি, তুমি তোমার চকচকে পোশাকে কিছু চকের গুড়ো লাগিয়ে নিও, তাতে তোমাকে আমাদের মতো মনে হবে।" তিনি দামি ও সুস্বাদু খাবার খুব পছন্দ করতেন, কিন্তু ব্যায়াম করা তাঁর একেবারে পছন্দ ছিল না। গানবাজনার প্রতিও তাঁর বিশেষ আকর্ষণ ছিল না, তবে আনুষ্ঠানিক ভোজসভা তাঁর খুব প্রিয় ছিল। এখানে একটি ব্যতিক্রমধর্মী বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যেতো যে, এত অসাধারণ মেধাবী হওয়া সত্ত্বেও তিনি পার্টিতে উপস্থিত লোকজনের অর্থাৎ মেহমানদের নাম স্মরণ রাখতে পারতেন না। নিজের অসীম ধী–শক্তির উপর তাঁর খুব আত্মবিশ্বাস ও গর্ব ছিল। তিনি তাঁর লেখা ও কাজকর্ম সম্বন্ধে মন্তব্য করতেন যে, ওগুলো নিখুঁত এবং সঠিকই শুধু নয়, উপরন্তু অত্যন্ত উচ্চ গাণিতিক মানসম্পন্ন ও বৈজ্ঞানিক পরিভাষা–সমৃদ্ধ, তাই খুব কম লোকের পক্ষেই তা বুঝে উঠা সম্ভব।

১৯৩৭ সালে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব এবং একাডেমী অফ সাইন্সের সদস্য-পদ লাভ করেন। একই বছর প্রথমা স্ত্রীর সাথে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে এবং পরবর্তী বছর বুদাপেস্টে বেড়াতে যেয়ে ক্লারা ডেন নামক এক মহিলার সাথে প্রথমে পরিচয় ও পরে বিবাহ হয়। তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত এই বিবাহ স্থায়ী ছিল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হলে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিরক্ষামূলক গবেষণা সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার লাভ করে। দূর পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র, সাবমেরিন বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র কর্মসূচি থেকে শুরু করে পারমাণবিক বোমা তৈরি কর্মসূচি ইত্যাদির সাথে তিনি জড়িত ছিলেন। পারমাণবিক বোমা তৈরিতে তিনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হলে তিনি পুনরায় দ্রুতগতিসম্পন্ন কম্পিউটার প্রকল্পে কাজ শুরু করেন। হাইড্রোজেনবোমা তৈরির ক্ষেত্রেও তিনি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন। দ্রুতগতিসম্পন্ন কমপিউটারের উপর কাজ করার সময় একই সাথে আরো নানা প্রকার সমস্যার সমাধানে তাঁকে ব্যস্ত থাকতে হতো। ১৯৫৪ সালের অক্টোবর মাসে প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ার তাঁকে যুক্তরাষ্ট্রের পরমাণু শক্তি কমিশনের সদস্য নিয়োগ করেন। এই পদে নিযুক্ত হওয়ার মাত্র ৬ মাস পরে তাঁর কাঁধে তীব্র ব্যথা অনুভূত হতে থাকে। ডাক্তারেরা ভালোভাবে পরীক্ষা করে তাঁর ক্যান্সার হয়েছে বলে অভিমত দেন এবং তাঁর আয়ু আর বেশি দিন নেই বলে জানিয়ে দেন। এই দুরারোগ্য ব্যাধি বহন করে তিনি একই সাথে পরমাণু শক্তি কমিশনের সদস্য ও বিমান বাহিনীর ব্যালিস্টিক মিসাইল উদ্ভাবন কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছিলেন। এছাড়াও একই সাথে ব্যক্তিগত প্রকল্প হিসেবে কমপিউটার নিয়ে গবেষণা করেন। তিনি মনে করতেন, মানুষের মস্তিস্কের নিগূঢ় রহস্যের সমাধান জানা সম্ভব হলে আরো উন্নত মানের কম্পিউটার তৈরি করা সম্ভব হবে।

আধুনিক কম্পিউটারের সঙ্গে বিজ্ঞানী জন ভন নিউম্যানের নাম ওতপ্রোতভাবে জড়িত। অনেক বিজ্ঞানী ও প্রকৌশলী আধুনিক কম্পিউটারকে ভন নিউম্যানের যন্ত্র হিসেবে আখ্যায়িত করে থাকেন। এর প্রধান কারণ হচ্ছে যে, আধুনিক কম্পিউটারের যেটি প্রধান বৈশিষ্ট্য, কম্পিউটারের মেমোরি বা স্মৃতিতে প্রোগ্রাম সঞ্চয় করে রাখার পদ্ধতি, এটির চিন্তাভাবনা ও পরিকল্পনা তাঁর মাথায়ই প্রথম এসেছিল। আজকাল আমাদের নিকট এটি তেমন গুরুত্বপূর্ণ মনে না হতে পারে, কিন্তু এটি সত্যি যে, তার ঐ চিন্তা ও পরিকল্পনার ফলেই আজ আধুনিক কম্পিউটার তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। তাঁর এই অনন্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ শুধু যে আধুনিক কম্পিউটার তাঁর নামে নামকরণ হয়েছে তা নয়, প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি অধ্যাপকের পদ এবং একটি কম্পিউটার

সেন্টার তাঁর নামে রাখা হয়েছে। এমনকি সুদূর চাঁদেও তাঁর নামে একটি আগ্নেয় গহ্বরের নামকরণ করা হয়েছে। এক সময় একটি রাস্তার মোড় তাঁর নামে রাখা হয়েছিল, কারণ প্রায়শই তিনি ঐ মোড়ে গাড়ির দুর্ঘটনা ঘটাতেন। তিনি এত বেগে গাড়ি চালাতেন যে, তাঁর কোনো গাড়িই এক বছরের বেশি অক্ষত থাকে নি।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির তিনটি শাখায় তিনি বিশেষ মৌলিক অবদান রেখে বিশ্বব্যাপী খ্যাতির অধিকারী হয়েছেন। প্রথমটি হচ্ছে অঙ্কশাস্ত্র। এই শাস্ত্রের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক উভয় ক্ষেত্রে তাঁকে একজন অসাধারণ পণ্ডিত মনে করা হয়। তিনি অঙ্কশাস্ত্রে এক নতুন শাখার উদ্ভাবন করেছেন, এটিকে বলা হয় গেম থিওরি বা ক্রীড়া তত্ত্ব। নাম শুনে মনে হবে এটি বুঝিবা চিত্তবিনোদনমূলক কিছু একটা হবে। আসলে কিন্তু তা নয়। সামাজিক, অর্থনৈতিক এমনকি যুদ্ধক্ষেত্রে সমর পরিকল্পনায়ও এটি ব্যবহৃত হয়।

তাঁর দ্বিতীয় অবদান হচ্ছে কোয়ানটাম তত্ত্ব। এই ক্ষেত্রে তিনি মাত্র ২৩ বছর বয়সে অনেক অবদান রেখেছেন। পারমাণবিক বোমার উদ্ভাবন–প্রকল্পে তিনি অংশগ্রহণ করেছেন এবং যুক্তরাষ্ট্রের পরমাণু–শক্তি কমিশনের সদস্য হিসেবে অবসর গ্রহণ করেছেন। ১৯৫৪ সালে তিনি মন্তব্য করেছিলেন যে, পরমাণু–শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহার শুরু হতে অনেক সময়ের প্রয়োজন হবে।

তাঁর তৃতীয় অবদান হচ্ছে ইলেকট্রনিক কম্পিউটার। এ জন্য তিনি সারা বিশ্বের কম্পিউটার–বিজ্ঞানী ও প্রকৌশলীদের নিকট পরম শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে আছেন। বিশ্ববিখ্যাত "নিউইয়র্ক টাইমস" পত্রিকা তাঁকে দ্রুতগতিসম্পন্ন কম্পিউটার উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভা বলে বর্ণনা করেছেন। বহু বছর ধরে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক সংস্থার প্রতিষ্ঠা ও উন্নতিকল্পে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন এবং একই সাথে বিজ্ঞানের উন্নতি ও প্রসারের জন্য কাজ করে গেছেন। থিওরি অফ গেমস এর যুগ্ম লেখক বিজ্ঞানী অসকার মরগেনস্টার্ন তাঁর সম্বন্ধে মন্তব্য করে বলেছেন, "তাঁর মনের প্রসারতার জন্য সবাই তাঁকে খুব পছন্দ করতো। তিনি বিজ্ঞানের বাইরেও অন্যান্য বিষয়ে অনেক পড়াশুনা করেছেন, যার ফলে তাঁর বিজ্ঞান বিষয়ক লেখাগুলো সাহিত্য–রসে সমৃদ্ধ। হৃদয়গ্রাহী এসব রচনা পাঠকের মন কেড়ে নিতো। হাস্য–কৌতুকেও তাঁর জুড়ি ছিল না। এমন কোনো বিষয় ছিল না যেটি তিনি অধ্যয়ন করেন নি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, ফ্রান্সের ইতিহাসখ্যাত দেশপ্রেমিক মহীয়সী যোয়ান অফ আর্কের বিচিত্র বিচার কাহিনী, তুরস্কের বাইজেন্টাইন সম্রাটদের বংশানুক্রমিক পরিচয় অথবা ঐতিহাসিক যুদ্ধসমূহের বিচিত্র বিবরণ ইত্যাদি, তাঁর

অধ্যয়ন–তালিকার অর্ন্তভুক্ত ছিল। কবিতা ছিল তাঁর অন্যতম প্রিয় বিষয়। তিনি বহু ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। বিশেষ করে ৭টি ভাষায় তিনি অনর্গল কথা বলতেন এবং এমন বিশুদ্ধ উচ্চারণসহ যে, ঐ বিশেষ ভাষাভাষী ব্যক্তিরা পর্যন্ত অবাক হয়ে যেতেন।

১৯৪৪ সালে পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন মূয়র তড়িৎকৌশল অনুষদের একটি দলের সাথে তিনি EDVAC নামক কম্পিউটার উদ্ভাবনে প্রথম অংশগ্রহণ করেন। সেটি ছিল সর্বসাধারণের ব্যবহারযোগ্য সর্বপ্রথম ইলেকট্রনিক কম্পিউটার।

কম্পিউটারের প্রথমদিকে কম্পিউটার প্রোগ্রামকে সাধারণত সচ্ছিদ্র কাগজের ফিতার মধ্যে প্লাগ বোর্ডে অথবা ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Calculator)–এর মতো যন্ত্রের সাহায্যে বিভিন্ন সংযোগকারী তারের ভিতর সঞ্চয় করে রাখা হতো। উদ্ভাবনকারী বিজ্ঞানীরা যখন আরো শক্তিশালী এবং দ্রুতগতিসম্পন্ন দ্বিতীয় ENIAC–এর ডিজাইন করার পরিকল্পনা নিয়েছিলেন তখনই সর্বপ্রথম চিন্তাভাবনা করা হয়, সচ্ছিদ্র কাগজের ফিতা সম্বলিত প্রচলিত পদ্ধতির পরিবর্তে ইলেকট্রনিক মেমোরিতে কম্পিউটার প্রোগ্রাম সঞ্চয় করে রাখা সম্ভব হবে কি না। যার ফলে অনেক প্রোগ্রামের মধ্যে কোনটি কোন পোগ্রামের আগে পরে হবে এ সম্বন্ধে লজিক্যাল সিদ্ধান্ত যন্ত্রটি নিজে নিজেই নিতে পারবে। এই সঞ্চয়ী প্রোগ্রামযুক্ত কম্পিউটারের ধারণাটি তখনকার দিনে সম্পূর্ণ নতুন এক প্রযুক্তির সূচনা করছিল। এ সম্পর্কে সর্বপ্রথম কৃতিত্ব যদি কাউকে দিতে হয় তবে তা সর্বাগ্রে এবং নির্দ্বিধায় জন ভন নিউম্যান ও তাঁর সহকর্মীদের প্রাপ্য। তাঁর উদ্ভাবিত নতুন প্রযুক্তিসম্পন্ন কম্পিউটারটির নামকরণ করা হয় EDVAC (Electronic Discrete Variable Automatic Computer) এবং এটির একটি প্রোটোটাইপ তৈরি করা হয়। এই সর্বাধুনিক কম্পিউটারটির লজিক ডিজাইন সম্পূর্ণভাবে তিনি একাই করেছিলেন। ১৯৪৫ সালের ৩০ জুন এক রিপোর্টে তিনি প্রথম এই উদ্ভাবন সম্বন্ধে উল্লেখ করেন। ঐ রিপোর্টের শিরোনাম ছিল EDVAC–এর উপর রিপোর্টের প্রথম খসড়া। রিপোর্টটি ছিল সঞ্চয়ী প্রোগ্রামযুক্ত কম্পিউটারের উপর প্রথম দলিল। EDVAC লজিক্যাল ডিজাইনের ধারণা প্রকাশিত হওয়া মাত্র বৈজ্ঞানিক মহলে খুবই আগ্রহের সৃষ্টি হয়। বিশেষ করে কম্পিউটার প্রযুক্তির উন্নয়নে ও ডিজাইনের ক্ষেত্রে কর্মরত বিজ্ঞানী ও প্রকৌশলীদের দ্বারা তা বিপুলভাবে সমাদৃত হয়। ১৯৪৬ সালের গ্রীষ্মকালে মূয়র তড়িৎ–প্রকৌশল বিভাগ কম্পিউটার ডিজাইনের উপর একটি বিশেষ কোর্সের আয়োজন করে। যুক্তরাষ্ট্র, ইংল্যান্ড ও জার্মানি থেকে বিজ্ঞানীরা এতে অংশগ্রহণ করেন। ইংল্যান্ডের কেমব্রিজ

বিশ্ববিদ্যালয় সর্বপ্রথম EDVAC ধারণার উপর ভিত্তি করে একটি কার্যকর মডেল বানাতে সক্ষম হয় এবং এটির নামকরণ করা হয় EDSAC (Electronic Disrcete Storage Automatic Computer)।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর তিনি প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অফ এডভান্সড স্টাডিজ–এ (IAS) যোগদান করেন। সেখানে তাঁর পুরানো সহকর্মীরাও যোগদান করেন। এ সময় তাঁরা সবাই একসাথে মিলেমিশে একটি নতুন কম্পিউটার তৈরি করে ওটার নামকরণ করেন কম্পিউটার। এ সময় IAS–এর নীতি ছিল যে, তাঁরা কম্পিউটারের উপর পরীক্ষামূলক কোনো প্রকার কাজকর্ম করবেন না। কিন্তু ১৯৪৫ সালের হেমন্তে একটি ব্যতিক্রমধর্মী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ভন নিউম্যান ও তাঁর সহকর্মীদের নতুন প্রযুক্তিসম্পন্ন কম্পিউটার উন্নয়নের জন্য কাজ করার অনুমতি প্রদান করা হয়। এ সময় তিনি এক নিবন্ধে বলেছিলেন যে, অদূর ভবিষ্যতে দ্রুতগতিসম্পন্ন কম্পিউটার তৈরি প্রযুক্তিতে যে পরিবর্তনের সূচনা হবে তাতে বর্তমানে লব্ধ অভিজ্ঞতার অবশ্যই প্রয়োজন হবে। পরবর্তীকালে তৈরি তাঁর অন্যান্য রিপোর্ট আজও কম্পিউটার প্রযুক্তির প্রাথমিক যুগের অত্যন্ত মূল্যবান দলিল বলে বিবেচনা করা হয়। ঐ সমস্ত রিপোর্টের নোটেশনের উপর ভিত্তি করে বর্তমানে প্রচলিত কম্পিউটার 'ফ্লো–চার্ট' উদ্ভাবন করা হয়েছে।

ভন নিউম্যান বহু পূর্বেই একথা ভালোভাবে হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন যে, অদূরভবিষ্যতে ব্যবসা–বাণিজ্যেও কম্পিউটার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে এবং এজন্য তিনি বাছাইকরণ পদ্ধতির (SORTING) উপর একটি প্রোগ্রাম তৈরি করেছিলেন। তিনি আরো একটি বিশেষ ক্ষেত্রে কম্পিউটারের প্রয়োগ সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে, আবহাওয়ার পূর্বাভাস প্রদানের জন্য মডেল তৈরির ক্ষেত্রে এটি ব্যবহার করা যাবে। ১৯৪৬ সালের প্রথম দিকে তিনি তাঁর দলের পক্ষ থেকে এরূপ একটি মডেল তৈরির আগাম ঘোষণা দিয়েছিলেন। ১৯৫০ সালে তিনি ও তাঁর দল EINAC–এর সাহায্যে ২৪ ঘন্টাব্যাপী আবহাওয়ার পূর্বাভাস নিরূপনে সফলতা অর্জন করেন। কম্পিউটারের অন্যান্য সম্ভাব্য প্রয়োগক্ষেত্র সম্বন্ধেও অনেক চিন্তাভাবনা এবং পরিকল্পনা করা হয়। ১৯৩৭ সালে তাঁর উদ্ভাবিত থিওরি অফ গেমসের সাহায্যে একটি সাবমেরিন ও ডেস্ট্রয়ারের মধ্যে দ্বৈত যুদ্ধের মহড়ার মডেল নির্মাণ তৈরি করা হয়।

কম্পিউটারকে আরো বিস্তৃততর ক্ষেত্রে প্রয়োগ সম্পর্কিত তাঁর পরিকল্পনাসমূহের মধ্যে অন্যতম ছিল সাইবারনেটিকস (Cybernatics) অর্থাৎ স্বয়ংক্রিয় মেশিন

ডিজাইন করা ও তৈরি করা এবং তা অটোমাটা (Automata) সূত্র উদ্ভাবনে প্রয়োগ করা হয়। স্বয়ংক্রিয় মেশিন ডিজাইনের বাস্তব প্রয়োগ করার জন্য তিনি এক পর্যায়ে একটি সুন্দর খেলনা তৈরি করে তাঁর এক সহকর্মীর ছেলেকে উপহার দেন। এ সময় দ্বিমাত্রিক পদ্ধতিতে যন্ত্রের ডিজাইন করার পরিকল্পনাও তাঁর চিন্তায় এসেছিল।

১৯৬৫ সালের দিকে হাঁটাচলা তাঁর পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। তখন তাঁকে একটি হুইল চেয়ারে চলাফেরা করতে হতো। এ সময় তাঁকে বিভিন্ন প্রকার পদক ও সম্মানে ভূষিত করা হতে থাকে। তাঁকে যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ সম্মান ইউ.এস. মেডাল অফ ফ্রিডম পদকে ভূষিত করা হয়। বিশ্বের বিজ্ঞানী সমাজ তাঁর জীবিত অবস্থায় যতটুকু তাঁর নিকট থেকে গ্রহণ করা যায় সে সম্বন্ধে সচেষ্ট হয়ে উঠে। ১৯৬৫ সালের এপ্রিল মাসে তাঁকে স্থায়ীভাবে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তাঁর পরিবারের সদস্যরা বিশেষ করে দুই ভাই তাঁকে সুস্থ করে তোলার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করতে থাকেন। একই সময় তাঁদের ৭৬ বছর বয়স্কা বৃদ্ধা মাতাও ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। ডাক্তারেরা ৬–৭ মাসের মধ্যেই ভন নিউম্যানের মৃত্যু হবে বলে অভিমত ব্যক্ত করা সত্ত্বেও তিনি আরো অনেক দিন শয্যাশায়ী থাকার পর ১৯৫৭ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি মাত্র ৫৩ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যুতে বিশ্ববাসী একজন অসাধারণ মেধাবী কর্মবীরকে হারিয়েছে। তাঁর মৃত্যুতে বিশ্ব মানবসমাজের যে অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে সে ক্ষতি পূরণ করা অদূর ভবিষ্যতে কোনো বিজ্ঞানীর পক্ষে সহসা সম্ভব হবে না।

গ্রেস মারে হুপার

(১৯০৬)

প্রথম প্রবর্তক

বিশ্বের সর্বপ্রথম মহিলা রিয়াল অ্যাডমিরাল (নৌবাহিনীর সেনাপতি) গ্রেস মারে হুপারের নাম অনেকেই জানেন না। এমনকি যুক্তরাষ্ট্রের অনেকেই তাঁর নাম পর্যন্ত শোনে নি। তিনিই বিশ্বের প্রথম মহিলা যিনি নৌবাহিনীর সর্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। অ্যাডমিরাল গ্রেস অনেকের কাছে অপরিচিত হলেও কম্পিউটার প্রোগ্রামারদের নিকট গ্রেস একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় নাম। তিনিই COBOL নামে পরিচিত কম্পিউটার-প্রোগ্রামিং ভাষার উদ্ভাবক। কম্পিউটার তৈরির শুরু থেকেই একটি মাত্র চিন্তাই তাঁর মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিলো এবং তা হলো কম্পিউটারের ব্যবহারকে কিভাবে অনায়াসসাধ্য করা যায়। যারা মেশিন কোড (Machine Code)-এর মাধ্যমে প্রোগ্রামিং করে থাকেন তাঁদের নিকট গ্রেস-এর কোনো মূল্য নেই, কিন্তু যাঁরা মনে করেন যে, কম্পিউটারের ভাষা মানুষের মুখের ভাষার মতোই সহজবোধ্য হতে হবে তাঁরা তাঁকে এক অনন্যসাধারণ প্রতিভা হিসেবেই গণ্য করেন।

১৯০৬ সালের ৯ ডিসেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরে গ্রেস বিউস্টার মারে হুপারের জন্ম হয়। পিতামাতার তিন সন্তানের মধ্যে তিনি সবার বড় ছিলেন। তাঁর পিতা ছিলেন একটি বীমা কোম্পানির প্রতিনিধি এবং নিউহ্যাম্পশায়ারে তাঁর একটি অবকাশযাপনের বাড়ি ছিল। তিনি পর্দাথবিজ্ঞান, রসায়নশাস্ত্র ও প্রকৌশলবিদ্যা অধ্যয়ন করে ১৯২৮ সালে ডিগ্রি লাভ করেন এবং ১৯৩০ সালে স্নাতকোত্তর ও ১৯৩৪ সালে অঙ্কশাস্ত্রে ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করেন। সে সময় ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রতি বছর মাত্র ২ জন ছাত্রকে ডক্টরেট ডিগ্রি প্রদান করা হতো। ১৯৩৪ সালে সেই দুইজনের একজন হয়ে তিনি তাঁর অসাধারণ মেধার পরিচয় দিয়েছিলেন।

১৯৩০ সালে ভিনসেন্ট ফস্টার হুপার নামক এক ভদ্রলোকের সাথে বিয়ে হওয়ার পর তিনি ভাসার কলেজে অঙ্কের প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন এবং ১৯৪৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনীর রিজার্ভ ফোর্সে যোগদান করা পর্যন্ত ঐ পদে কর্মরত ছিলেন। নৌবাহিনীতে যোগদান করার পর তাঁর জীবনে এক আমূল পরিবর্তনের সূচনা হয়।

সেখানে নৌবাহিনীর জন্য কাজ করা এবং বিশেষভাবে নৌবাহিনীর জন্য নেভাল কম্পিউটার প্রোগ্রাম বাছাই করা তাঁর জীবনের একমাত্র ব্রত হয়ে দাঁড়ায়। তাঁর প্রতিভা বিকাশের ভিত সেখানেই গড়ে ওঠে। নৌবাহিনীতে যোগদান করার পর বাধ্যতামূলক সামরিক প্রশিক্ষণ শেষে তিনি জুনিয়র গ্রেড লেফটেন্যান্ট হিসেবে কমিশনপ্রাপ্ত হন এবং হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার প্রজেক্ট ব্যুরোতে নিয়োজিত হন। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়েই সর্বপ্রথম ইলেকট্রোমেকানিক্যাল কম্পিউটার (MK-I) তৈরি হয়েছিল। উক্ত কম্পিউটারটি আকারে বিশাল ছিল এবং বহুদিন ধরে তা সাধারণ কাজকর্মে ব্যবহৃত হতো।

হার্ভার্ডে যোগদান করার পর তিনি মাটির নিচের ঘরে (celler) একটি ল্যাবরেটরিতে ঐ MK-I কম্পিউটার খুঁজে পান এবং ওটির উপর কাজ করার জন্য নৌ সদর দফতরের অনুমতি প্রার্থনা করেন। তাঁর আবেদনের জবাবে জানানো হয় যে, নৌবাহিনীর সদস্যদের এর চেয়ে ভালো অনেক কিছু করণীয় রয়েছে, সুতরাং তাঁর আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হলো। তখন তিনি সরাসরি কমান্ডারের সাথে দেখা করেন। ঐ কমান্ডার ছিলেন বর্তমানে বিশ্ববিখ্যাত হাওয়ার্ড এইকেন। এইকেন তাঁর সাথে কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলে এত সন্তুষ্ট হন যে, তিনি তখন অনুযোগ করে বলেছিলেন যে গ্রেস কেন এতদিন সরাসরি তাঁর সাথে দেখা করেন নি। যা হোক, কমান্ডার এইকেন নিজে একজন অত্যন্ত জ্ঞানী ও অভিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। বিশেষ করে কম্পিউটারের উপর তাঁর সুগভীর পাণ্ডিত্য ও দখল ছিল। তিনি ঐ দিনই গ্রেসকে একটি সমস্যা দিয়ে পরবর্তী বৃহস্পতিবারের মধ্যে কম্পিউটারের সাহায্যে সেটি সমাধান করে দিতে বলেছিলেন। গ্রেসকে খুবই ভাগ্যবতী বলতে হয়, কারণ ঐ সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে তিনি দেখতে পেয়েছিলেন যে, ইতিমধ্যেই দুজন তরুণ ইঞ্জিনিয়ার একই কম্পিউটারের কাজ শুরু করে দিয়েছেন, ফলে তিন জনের একজন হিসেবে নিজকে অত্যন্ত ভাগ্যবতী মনে করে তিনি ঐ সমস্যাটির সমাধান করেছিলেন।

MK-I মডেলটি পরে MK-II এবং MK-III নামে উন্নততর মডেল হিসেবে তৈরি করা হয়। কম্পিউটার ডি–বাগিং (de-bugging) নামে যে শব্দটি এখন প্রচলিত ঐ শব্দটি তিনিই সর্বপ্রথম ব্যবহার করেছিলেন। এ সম্বন্ধে একটি মজার গল্প প্রচলিত আছে। ১৯৪৫ সালের প্রচণ্ড গরমে MK-II–এর একটি রিলে খারাপ হয়ে যায় এবং সেটি মেরামত করতে অনেক সময় লেগে যায়। এ ঘটনার পরে যখনই তাঁরা কমান্ডারের কাছে তাঁদের কাজের অগ্রগতি সম্বন্ধে রিপোর্ট দাখিল করতেন তখন যদি কোনো কারণে কাজে বিলম্ব হতো অথবা অগ্রগতি সন্তোষজনক না হতো তাহলে

তাঁরা কামান্ডারকে বলে পাঠাতেন যে, কম্পিউটারকে ডি–বাগিং করছেন, যার মানে দাঁড়ায় কম্পিউটারের ভিতর যে ছারপোকা সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে সেগুলো তাঁরা খুঁজে বের করে মেরে ফেলার চেষ্টা করছেন, অর্থাৎ সমস্যা দূর করার চেষ্টা করছেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে যখন তাঁকে বলা হলো যে, নৌবাহিনীতে কাজ করার মতো বয়স তাঁর নেই তখন তিনি কলেজের অধ্যাপনায় ফিরে না গিয়ে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করে MK-II ও MK-III কম্পিউটারের উন্নয়নে গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেন। MK-II মডেলের প্রতি তাঁর গভীর আস্থা ছিল, ওটার লজিক–ডিজাইন খুবই উন্নত মানের এবং তিনি তাই সবসময় কম্পিউটার ডিজাইনারদের এর গঠন পদ্ধতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অধ্যয়ন করতে বলতেন।

১৯৪৯ সালে তিনি বাণিজ্যিক ভিত্তিতে কম্পিউটার উৎপাদনকারী AMCC নামক একটি প্রতিষ্ঠানে যোগদান করেন এবং UNIVAC-I (Universal Automatic Computer-I) তৈরিতে অংশগ্রহণ করেন। UNIVAC ছিল যুক্তরাষ্ট্রে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উৎপাদিত প্রথম বিশাল আকারের কম্পিউটার । এটি যথেষ্ট সুনাম অর্জন করে ও ব্যবসায়ে খুবই সাফল্য নিয়ে আসে। কিন্তু উৎপাদন খরচ বেশি হওয়ার কারণে উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানটি ব্যাংকের ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় দেউলিয়া হয়ে যায়। ১৯৫০ সালে রেমিংটন র‍্যান্ড কোম্পানি AMCC কোম্পানির মালিকানাস্বত্ব কিনে নেয়। পরে স্পেরি করপোরেশন ঐ কোম্পানির মালিকানা লাভ করে। এত মালিকানা বদল হওয়া সত্ত্বেও তিনি UNIVAC-এর উৎপাদন বিভাগের সাথেই সবসময় জড়িত ছিলেন।

১৯৫২ সালে তিনি A-O নামে সর্বপ্রথম কমপাইলার উদ্ভাবন করেন। এর পর A-1 এবং A-2 মডেলের উদ্ভাবন করেন। কমপাইলারের প্রধান কাজ হলো এটি কম্পিউটার প্রোগ্রামকে মেশিন কোডে পরিবর্তিত করে দেয়। এটি কমবেশি সকলেরই জানা আছে যে, কম্পিউটার নিজে কোনো প্রোগ্রাম করতে পারে না, কম্পিউটারকে তার বোধগম্য ভাষায় আদেশ দিতে হয়। কম্পিউটার শুধু হিসাব বা অঙ্ক কষতে পারে। একটি কম্পিউটার কি করতে পারে আর কি পারে না এটি কোম্পানি–কর্তৃপক্ষকে বোঝানো খুব কঠিন ব্যাপার ছিল, কিন্তু তিনি তাঁর তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা ও যুক্তিতর্ক দিয়ে কোম্পানি কর্তৃপক্ষকে বহুবার তাঁদের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করাতে সক্ষম হয়েছিলেন।

এদিকে প্রযুক্তির উন্নতির সাথে সাথে কম্পিউটারের গতি দিন দিন দ্রুত থেকে দ্রুততর হতে থাকে, ফলে একথা সবাই পরিষ্কারভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় যে, কম্পিউটার প্রোগ্রাম করার নিয়মাবলি ও পদ্ধতি আরো সহজ এবং দ্রুততর করতে হবে। সে সময় কম্পিউটার প্রোগ্রামিং–এর উপর কাজ করার মতো যোগ্য ও অভিজ্ঞ

ব্যক্তি, বিশেষ করে অঙ্কশাস্ত্রে ডক্টরেট ডিগ্রিধারী কম্পিউটার প্রোগ্রামার খুবই কম ছিল। গ্রেস মারে হুপার একটি কথা খুব ভালোভাবে বুঝেছিলেন যে, কম্পিউটার প্রোগ্রামিং খুব সহজ সরল ভাষায় সঠিকভাবে করতে হবে, যাতে অতি সাধারণ স্তরের লোকজনও সেটি বুঝতে এবং ব্যবহার করতে পারে। তাহলে শিল্পপতি, ব্যবসায়ী, প্রকৌশলী, বিজ্ঞানী, সবাই সহজবোধ্য প্রোগ্রামিং ব্যবহার করে নিজ নিজ সমস্যার সমাধান করতে পারবেন।

১৯৫৩ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি ও তাঁর কয়েকজন সহকর্মী যৌথভাবে কোম্পানি কর্তৃপক্ষের নিকট একটি প্রস্তাব উপস্থাপন করে বলেন যে, অঙ্কশাস্ত্রের সমাধানের জন্য অঙ্ক দিয়েই প্রোগ্রাম লিখতে হবে (mathematical notation), কিন্তু ডেটা প্রসেসিং প্রোগ্রাম অবশ্যই ইংরেজিতে লিখতে হবে। একথা শুনে কর্তৃপক্ষের চক্ষু ছানাবড়া। কারণ কম্পিউটার কি করে ইংরাজি ভাষা বুঝবে ? ফলে কর্তৃপক্ষ কোনো সিদ্ধান্তে পৌছাতে পারেন নি। তিনি কিন্তু চুপ করে বলে ছিলেন না। নিজস্ব চিন্তা ও বুদ্ধি প্রয়োগ করে ১৯৫৫ সালের প্রথম দিকে তিনি কমপাইলারের একটি পরীক্ষামূলক নমুনা ইংরেজিতে লিখে সেটি কর্তৃপক্ষকে দেখালেন। প্রথম কমপাইলার প্রোগ্রামটি খুবই সংক্ষিপ্ত আকারের ছিল। তিনি তাঁর সহকর্মীদের নিয়ে ইংরেজি প্রোগ্রামটির জার্মান ও ফরাসি সংস্করণ লিখেছিলেন একথা মনে করে, যাতে পরবর্তীতে কেউ বলতে না পারে যে, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভানিয়া রাজ্যের ফিলাডেলফিয়া শহরের তৈরি কম্পিউটারটি শুধুমাত্র ইংরেজি ভাষা বোঝে, ফরাসি বা জার্মান ভাষা বুঝে না।

গ্রেস ও তাঁর সহকর্মীদের নিকট B-O কমপাইলারটি খুবই সাধারণ ও সহজ মনে হলেও কর্তৃপক্ষের জন্য এটি দারুণ মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়ায়, কারণ এটি গ্রহণ করার মানেই হলো সম্পূর্ণ নতুনভাবে সবকিছু ঢেলে সাজানো। এর সাথে আর্থিক প্রশ্নও স্বাভাবিকভাবে দেখা দেবে। যা হোক, চার মাস পরে কর্তৃপক্ষ একটি সিদ্ধান্তে পৌছাতে সক্ষম হন। তাঁরা নবোদ্ভাবিত কমপাইলারটির শুধুমাত্র ইংরেজি সংস্করণ উৎপাদন ও ব্যবহারের পক্ষে মত প্রদান করেন। কোম্পানির বিক্রয় বিভাগ B-O কমপাইলারকে 'ফ্লোমের্টিক' কর্তৃপক্ষ কখনোই বিক্রয় বিভাগের কার্যকলাপে হস্তক্ষেপ করেন না বা করার মন–মানসিকতাও পোষণ করেন না, কারণ বিক্রয় বিভাগ তাঁদের নিজস্ব ধ্যানধারণা মোতাবেক কাজ করে থাকে, এ জন্যই বিক্রয় বিভাগকে সবাই সমীহ করে চলে। ১৯৫৭ সালের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের যে তিনটি কম্পিউটার ভাষা ব্যবহৃত হতে থাকে, তার মধ্যে FORTRAN এবং FLOW-MATIC

বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, এবং শুধুমাত্র FLOW-MATIC ইংরেজি ভাষা ব্যবহার করতো।

সময় ও অবস্থার পরিবর্তনের সাথে সাথে কমিউটারের প্রয়োজনীয়তা, চাহিদা ও ব্যবহার দিন দিন বেড়ে যেতে থাকে। আরো বেশি করে লোকজন কম্পিউটারের ব্যবসায়ে জড়িত হতে থাকে, বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন মডেলের কম্পিউটার বাজারে আসতে থাকে, ফলে একটি সর্বজনীন কম্পিউটার–প্রোগ্রামিং ভাষার অভাব অনুভূত হতে থাকে, যা সবধরনের কম্পিউটারে ব্যবহার করা সম্ভব।

১৯৫৯ সালের এপ্রিল মাসে বিভিন্ন কম্পিউটার উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের একটি ছোটখাট সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। তিনিও সেই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, একটি সর্বজনীন গ্রহণযোগ্য সাধারণ ব্যবসায়ী ভাষা (COBOL) উদ্ভাবন করতে হবে। একই বছর পরবর্তী মাসে, অর্থাৎ মে মাসের, বিভিন্ন কোম্পানির চল্লিশজন অভিজ্ঞ প্রতিনিধি দুইদিনব্যাপী এক সম্মেলনে প্রচুর চিন্তাভাবনা ও তর্কবিতর্কের পর একটি সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে সক্ষম হন। সেটি ছিল COBOL ভাষার প্রাথমিক উদ্যোগ। সম্মেলনে উপস্থিত সবাই এক বাক্যে সহজতর ইংরেজি ব্যবহারের পক্ষে মত প্রদান করেন। একই সম্মেলনে প্রোগ্রামের উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিসাধনের জন্য তিনটি পৃথক পৃথক কমিটি গঠিত হয়। স্বল্প প্রোগ্রাম, মাঝারি আকারের প্রোগ্রাম ও লম্বা প্রোগ্রাম কমিটির দুইজন উপদেষ্টার মধ্যে তিনি একজন ছিলেন।

কিছু দিনের মধ্যেই স্বল্প প্রোগাম কমিটি COBOL-O ভাষার উদভাবন করে। তিনি যদিও ঐ কমিটির সদস্য ছিলেন না, কিন্তু তাঁর উদ্ভাবিত FLOW-MATIC ভাষা COBOL উদ্ভাবনে খুবই সহায়ক হয়েছিল। ১৯৫৭ সালে প্রতিষ্ঠিত ঐ বিশেষ নির্বাহী কমিটি এখনো কাজ করে যাচ্ছে।

কম্পিউটার উৎপাদন শিল্পের সাথে জড়িত থেকেও তিনি যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনীর রিজার্ভ ফোর্সে নিয়মিত সার্ভিস দিয়ে যাচ্ছিলেন। ১৯৬৬ সালে নৌবাহিনী তাঁকে অবসর প্রদান করে এবং ১৮ মাস পরে পুনরায় ৬ মাসের জন্য বিশেষ ব্যবস্থাধীনে পুনর্নিয়োগ করে। এবার তাঁকে নৌবাহিনীর জন্য কম্পিউটার–ভাষার মান প্রমিতকরণের বিশেষ দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। সৌভাগ্যই বলতে হবে, কারণ ঐ ৬ মাস সময়সীমা দীর্ঘতর হতে থাকে এবং সুদীর্ঘ ২০ বছর পরে ১৯৮৬ সালে ৭৯ বছর বয়সে রিয়াল অ্যাডমিরাল পদ থেকে তিনি দ্বিতীয়বারের মতো নৌবাহিনী থেকে অবসর গ্রহণ করেন। অবসর গ্রহণ করার মাত্র ১মাস পরে পুনরায় ডিজিটাল

ইকুইপমেন্ট করপোরেশনে (DEC) সিনিয়র কম্পিউটার উপদেষ্টা হিসেবে যোগদান করেন।

যাঁরা বলেন যে, ৬০ বছর পরে শিক্ষা গ্রহণ করার মতো মন–মানসিকতা থাকে না, তিনি তাদের যুক্তি খণ্ডন করে বলেন, 'জীবনে শিক্ষার কোনো শেষ নেই, আমি আমৃত্যু শিখেই যাব।' তাঁর সম্বন্ধে কোম্পানির ভাইস প্রেসিডেন্ট মন্তব্য করে বলেছেন, গ্রেস এত বড় বিজ্ঞানী আর এত বেশি অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ যে, যে সমস্ত তরুণ কর্মী তাঁর সঙ্গে কাজ করার সৌভাগ্য লাভ করবে তারা অতি অল্প সময়ের মধ্যে খুব ভালো প্রশিক্ষণ পেয়ে জ্ঞানী হয়ে উঠবে। যদি তারা সেটি নাও চায় তবুও এটি ঘটবে। হবেই হবে।

তিনি গ্যাজেট (gadget) করতেন এবং গ্যাজেটের প্রয়োগ সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করতে ভালোবাসতেন। যখন তিনি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের মাটির নিচের ঘরে MK-1 কম্পিউটারটি দেখেছিলেন তখন তাঁর মনে হয়েছিল যে, তিনি তাঁর জীবনের সুন্দরতম গ্যাজেট দেখছেন। তিনি সবসময় প্রচলিত মতবাদের বিরোধিতা করেছেন এবং "এটি এভাবেই করতে হবে বা করা উচিত" এ ধারণার বিপরীতে কাজ করেছেন। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের কম্পিউটার প্রোগ্রামকারীদের অত্যন্ত প্রিয় সহকর্মী ছিলেন। তাঁকে বহুরকম পদকে ও সম্মানে ভূষিত করা হয়েছে। কিন্তু তিনি সবচেয়ে বেশি সম্মানিত বোধ করেছেন নৌবাহিনীর রিয়াল অ্যাডমিরাল পদে আসীন হয়ে।

১৯৪৫ সালে স্বামীর সাথে বিবাহ বিচ্ছেদের পর তিনি আর দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন নি। বিশ্বের প্রথম মহিলা রিয়াল অ্যাডমিরারাল ডক্টর গ্রেস মারে হুপার ছিলেন সমগ্র বিশ্বের মহিলাদের জন্য এক উজ্জ্বল পথপ্রদর্শক।

প্রকৌশলী বিজ্ঞানী অধ্যাপক মন্ট কোনরাড সুজে (১৯১০)

বিশ্বের সর্বপ্রথম সফল কম্পিউটারের উদ্ভাবক

একথা হয়তো অনেকেরই জানা নেই যে, বিশ্বের প্রথম কার্যকরী ডিজিটাল কম্পিউটারটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বার্লিন শহরে মিত্রপক্ষের বোমার আঘাতে ধ্বংস হয়েছিল। এটা নামে পরিচিত ছিল এবং এটা তৈরি করেছিলেন একজন জার্মান নাগরিক, সিভিল ইঞ্জিনিয়ার কোনরাড সুজে। তাঁর তৈরি একটি কম্পিউটার দিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যুদ্ধবিমানের ডানার ডিজাইন করা হয়েছিল এবং ওটাই ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্যবহৃত একমাত্র কম্পিউটার । ১৯৪৫ সালে বার্লিনের পতনের সময় কম্পিউটারের একটি উন্নত সংস্করণ রাশিয়ান সৈন্যদের হাতে পড়েছিল, যদিও তারা বুঝতে পারে নি যে এটা কী জিনিস ছিল।

বিস্ময়-উদ্রেককর হলেও সত্য যে, এমন কার্যকরী ডিজিটাল কম্পিউটার প্রবর্তক কোনরাড সুজের নাম আজো অনেকের কছে অজানা। দীর্ঘদিন ধরে বিশ্ববাসী মনে করতো যে, আমেরিকানরাই সর্বপ্রথম কম্পিউটার তৈরি করেছে। কিন্তু পরে দেখা যায় যে, ব্রিটিশরা প্রথমে সংকেত বিশ্লেষণকারী যন্ত্র তৈরি করেছিল, তবে তারও অনেক আগে সুজে তাঁর কম্পিউটার তৈরি করেছিলেন। বস্তুতপক্ষে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হওয়ার অনেক আগে থেকে তিনি তাঁর নিজস্ব চিন্তাভাবনা ও পরিকল্পনা অনুযায়ী কম্পিউটার তৈরি শুরু করেন। পেশাগত দায়িত্ব সম্পাদন করে অবসর মুহূর্তে তিনি কম্পিউটারের উপর কাজ করতেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হওয়ার পরেও তিনি কোনো প্রকার সরকারি সাহায্য পান নি। যুদ্ধ শেষে নিজস্ব কম্পিউটার তৈরি কারখানা স্থাপন করেন এবং ধীরে ধীরে ইউরোপ মহাদেশের সর্ববৃহৎ কম্পিউটার উৎপাদনকারী হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তাঁর কোম্পানিতে তখন এক হাজার কর্মী কাজ করতেন।

এখন তাঁর বয়স ৮৪ বছর। বার্ধক্যে উপনীত হয়েও তিনি এখনো একজন সক্রিয় সিভিল ইঞ্জিনিয়ার ও চিত্রশিল্পী, কিন্তু কম্পিউটারের প্রতি তাঁর দুর্বলতা সবচেয়ে বেশি। তাঁর অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁকে অনেক সম্মানে ভূষিত করা হয়েছে। তিনি বলেন যে, এখনো যদি লোকে তাঁর নিকট কোনো সমস্যা নিয়ে আসে তবে তিনি সেটার

সমাধান করে দিয়ে খুবই আনন্দ লাভ করেন।

১৯১০ সালের ১০ জুন জার্মানির রাজধানী বার্লিন নগরীতে কোনরাড সুজের জন্ম হয়। তাঁর জন্মের পর তাঁর পিতা সরকারি কাজে জার্মানির বিভিন্ন শহরে বসবাস করেছেন। তাঁর পিতা পোস্টমাস্টার ছিলেন। ড্রেসডেন শহর থেকে ৩৫ মাইল দূরবর্তী এক স্থানে তাঁর শিক্ষাজীবন শুরু হয়। স্কুলে থাকাকালেই ইঞ্জিনিয়ারিং-এর প্রতি তাঁর আকর্ষণ জন্মে। একই সাথে চিত্রকর্মেও তাঁর প্রতিভার বিকাশ ঘটতে থাকে। কিন্তু চিত্রকর্মের সাথে ইঞ্জিনিয়ারিং-এর দ্বন্দ্বের ফলে তিনি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়া ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। বার্লিনের শারলোটেনবুর্গ ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন কালে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়াশুনা বিশেষ করে টেকনিক্যাল ড্রইং তাঁর নিকট অত্যন্ত জটিল মনে হয়। পিতামাতার স্বপ্নকে ব্যর্থ করে তিনি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়া বাদ দিয়ে একজন চিত্রশিল্পী হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। এ সময় তিনি একটি যন্ত্রের উদ্ভাবন করেন। রঙিন ফিল্ম থেকে ছবি প্রস্ফুটন ও প্রিন্ট করার স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা ছিল যন্ত্রটিতে।

যা হোক, কিছু দিন পরে তাঁর সুবুদ্ধির উদয় হয় এবং তিনি পুনরায় ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে ১৯৩৫ সালে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ স্নাতক ডিগ্রি লাভ করে হেনসেল এয়ারক্রাফট কোম্পানিতে যোগদান করেন। সেখানে বিমান তৈরি করার জন্য যে ধাতব পদার্থ ব্যবহৃত হতো সেগুলোর পীড়ন-বিশ্লেষক (Stress analyst) হিসেবে তাঁকে কাজ করতে হতো। এই কাজ করার সময় তাঁর সারাদিন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর অঙ্ক কষা নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হতো, ফলে কিছু দিনের মধ্যেই তাঁর মনে একঘেয়েমি ও ক্লান্তির ভাব এসে যায়। তখন তিনি এই একঘেয়েমি থেকে মুক্তি পাওয়ার উদ্দেশ্যে একটি যন্ত্র উভাবনের ব্যাপারে মন দেন।

১৯৩৩-৩৪ সালের দিকে ছাত্র অবস্থাতেই তিনি চিন্তাভাবনা করেছিলেন যে, একই ধরনের কাজ ও অঙ্ক কষা বারে বারে না করে যদি এমন নতুন কোনো পদ্ধতির উদ্ভাবন করা সম্ভব হয় যা দ্বারা কাজটি সহজে এবং কম সময়ে করা সম্ভব, তবে খুব ভাল হয়। এই চিন্তার বশবর্তী হয়ে তিনি অনেক কাজের মধ্যে যেগুলো একই ধরনের সেগুলো নিয়ন্ত্রণ ও রেকর্ড করার জন্য পূর্বনির্ধারিত ছাপানো কিছু ফরম ব্যবহার করেন। এই ক্ষেত্রে পরবর্তী পদক্ষেপ হিসেবে তিনি সচ্ছিদ্র কার্ড ও যান্ত্রিক হিসাবকারী পদ্বতির কথাও ভেবেছিলেন। বস্তুত ইঞ্জিনিয়ারিং অধ্যয়নের সময় তিনি দুরূহ ও কঠিন অংকের সমাধানের জন্য মূলত একটি সাধারণ পদ্ধতির কথা ভেবে ওটার নাম দিয়েছিলেন ইনফরমেশন কন্ট্রোল, যা দ্বারা একটি কঠিন অঙ্ককে কতগুলো সহজ ও সাধারণ পদ্ধতিতে বিভক্ত করে সহজেই সমাধান করা যাবে এবং সেভাবে কাজ

করার জন্য একটি যন্ত্র তৈরি করতে হবে। ১৯৩৪ সালের দিকে তিনি নিজে কতকগুলো টেকনিক্যাল শব্দ ব্যবহার করা শুরু করেছিলেন যেমন "মেমোরি ইউনিট", "সিলেকটর" এবং "কন্ট্রোল ডিভিশন" ইত্যাদি।

পরবর্তীকালে বিমান কোম্পানিতে কাজ করার সময় তাঁর পুরানো ধ্যানধারণাগুলো নতুন করে ঝালাই করে উক্ত সমস্যার সমাধানের জন্য তিনি একটি যন্ত্র তৈরির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং বার্লিনে তাঁর পৈতৃক বাড়ির একটি কক্ষে কারখানা স্থাপন করে যন্ত্রটি তৈরি শুরু করেন। "প্রয়োজনই আবিষ্কারের উৎস" এই জনপ্রিয় প্রবাদ বাক্যটির উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বলেছেন যে, একঘেয়েমি, ক্লান্তিকর ও বিরক্তিজনক কাজের দরুণ মানসিক অশান্তি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যই তিনি ঐ নতুন যন্ত্রটি অর্থাৎ কম্পিউটার তৈরি করার কাজে হাত দিয়েছিলেন।

বাস্তবে যন্ত্রটি তৈরি করতে গিয়ে সর্বপ্রথম যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল সেটি হলো ডেসিমেল বা দশমিক পদ্ধতির পরিবর্তে বাইনারি বা দুই সংখ্যা ভিত্তিক পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে। তাঁর একজন বিশ্বস্ত বন্ধু ও সহকর্মী ওয়ালটার ব্যাটম্যানকে এই দায়িত্ব দেওয়া হয়। ব্যাটম্যান বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত বিখ্যাত অঙ্কশাস্ত্রবিদ গটফ্রিড লাইবনিৎসের লিখিত বৈজ্ঞানিক গবেষণামূলক নিবন্ধগুলো খুব মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন শুরু করেন। লাইবনিৎস ১৭ শতকে সর্বপ্রথম বাইনারি গণিতের ধারণা দিয়েছিলেন।

এইভাবে ১৯৩৬ সালে তিনি সর্বপ্রথম অঙ্ক কষার যন্ত্রটির নির্মাণ কাজ শুরু করেছিলেন। এতে তিনি ধাতব পিন এবং সচ্ছিদ্র ধাতব পাত ব্যবহার করেন। প্রতিটি ছিদ্রের শেষ অংশ দ্বারা এক (১) এবং শূন্য (০) উপস্থাপন করা হতো। উক্ত যন্ত্রের মেমোরিতে ৬৪ টি বাইনারি সংখ্যা ধারণ করা যেতো । এতে প্রতিটি শব্দের জন্য ১৬টি বিট নির্ধারিত ছিল। বিশাল আকৃতির যন্ত্রটি তৈরির ব্যাপারে তাঁর বন্ধুবান্ধবেরা নিজেদের হাতে হাজার হাজার যন্ত্রাংশ তৈরি করে দিয়ে তাঁকে অপরিসীম সাহায্য করেছিল। যা হোক, বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা গেল যে, জটিল গাণিতিক ইউনিট তৈরি করতে হলে আরো বেশি অভিজ্ঞতা, নির্মাণ–দক্ষতার প্রয়োজন। প্রোগ্রামগুলো পাঞ্চ করে কার্ড হিসেবে অনুক্রমে (সিরিজ) ৮ টি ছিদ্রের সাহায্যে কোড করা হয়। উক্ত কাজে ৩৫ মি: মি: চলচ্চিত্রের বাতিলকৃত ফিল্ম ব্যবহার করা হয়, কারণ উক্ত ফিল্ম প্রচলিত কাগজের ফিতা থেকে অনেক সস্তা ছিল। উক্ত যন্ত্রটির নাম দেওয়া হয় ফেরজুখস মডেল–১ (পরীক্ষামূলক মডেল–১), সংক্ষেপে V-1। V-1 সংক্ষেপে পরে আরেকটি মডেল তৈরি করে তাঁর নাম দেওয়া হয় V-2। কিছু দিন পরে অবশ্য এদের

নামকরণ করা হয় Z-1 এবং Z-2, কারণ সে সময় V-1 বলতে লোকে উড়ন্ত বোমা এবং V-2 বলতে রকেট মনে করতো। Z-2 মডেলটি তৈরি করার সময় Z-1 মডেলের মেমোরি ইউনিটটি ব্যবহার করা হলেও এতে পুরনো বাতিলকৃত টেলিফোন সেট থেকে রিলে খুলে নিয়ে নতুন এক ধরনের গাণিতিক ইউনিট লাগানো হয়েছিল।

নতুন রিলের দাম খুব বেশি হওয়ার কারণে তাঁদেরকে খুব হুঁশিয়ার হয়ে খরচ করতে হতো, কারণ উক্ত যন্ত্র তৈরিকালীন সমস্ত খরচ তাঁরা নিজেদের পকেট থেকে যোগাড় করতেন, কখনো কখনো বন্ধুদের পিতারা টাকা যোগাড় করে দিতেন। একটি পূর্ণাঙ্গ মেকানিক্যাল কমপিউটারের পরিকল্পনা বাস্তবে অসম্ভব মনে হওয়ার কারণে এবং শুধুমাত্র রিলে ব্যবহার করা হলে কয়েক হাজার রিলের প্রয়োজন হতো বলে মাত্র ২০০ রিলে ব্যবহার করে একটি পরীক্ষামূলক মডেল তৈরি করা হয়। ইতিমধ্যে সুজে তাঁর ভবিষ্যৎ পরিকল্পিত কমপিউটারের ডিজাইন–কাজ সম্পন্ন করে ফেলেছিলেন এবং বাইনারি লজিক ব্যবহার করে অর্থাৎ 'হাঁ' অথবা 'না' এই পদ্ধতি ব্যবহার করে তা করা হয়েছিল। তিনি অবাক বিস্ময়ে দেখতে পান যে, বাইনারি লজিক–পদ্ধতিটি কমপিউটারের দৈহিক গঠনকাঠামোর উপর মোটেও নির্ভরশীল নয়।

সম্পূর্ণরূপে রিলে ব্যবহার করে কমপিউটার তৈরি করার পরিকল্পনাটি বাস্তবসম্মত না হওয়ার কারণে শ্রেয়ার হঠাৎ একদিন ইলেকট্রনিক ভাল্ভ্ ব্যবহার করে কমপিউটার তৈরির পরিকল্পনা ব্যক্ত করেন। তখনো রিলেকে দুটো অবস্থার মাঝামাঝি সুইচ হিসেবে ব্যবহার করা হয় নি, তাই রিলের পরিবর্তে ইলেকট্রনিক ভাল্ভ্ ব্যবহার করার পরিকল্পনা করা হয়, কারণ ভাল্ভ্ রিলের চেয়ে অনেক দ্রুত কাজ করতে পারে। এ সম্বন্ধে সুজে পরবর্তীকালে মন্তব্য করে বলেছিলেন যে, প্রথমে তিনি উক্ত পরিকল্পনাটিকে তাঁর কোনো এক ছাত্রের চালাকি বলে মনে করেছিলেন, যে ছাত্রটি সব সময় চালবাজি করে সবাইকে বোকা বানিয়ে রাখতো। যা হোক, বাস্তবে দেখা গেল যে, ভাল্ভ্ ব্যবহার করলে প্রায় ২ হাজার ভাল্বের প্রয়োজন। অতগুলো ভাল্ভ্ একসাথে পাওয়া সে সময় সত্যিই খুব দুঃসাধ্য ব্যাপার ছিল, কারণ তখন জার্মানি সারা বিশ্বের বিরুদ্ধে লড়াই করে চলেছে। প্রাইভেট কোম্পানিগুলো কোনোমতেই অতগুলো ভাল্ভ্ সরবরাহ করতে পারতো না। ফলে বাধ্য হয়ে তিনি তৎকালীন জার্মানির সর্বোচ্চ সামরিক পরিষদের শরণাপন্ন হলেন। সামরিক কামান্ড তাঁর কথা শুনে সহানুভূতি প্রদর্শন করলেও বাস্তবে, বিশেষ সাহায্য পাওয়া গেল না।

যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে শ্রেয়ার প্রায় ১০০ থেকে ১৫০ টি ভালভের সমন্বয়ে গঠিত একটি পরীক্ষামূলক কমপিউটার তৈরি করেন। এই কাজটি করে ভাল্ভ্ সুইচিং সার্কিটের উপর

তিনি ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন। অন্যান্য কমপিউটারের সাথে ওটাও যুদ্ধের সময় বোমাবর্ষণে ধ্বংস হয়। যুদ্ধের পর জর্মানিতে ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রপাতির উন্নয়ন ও উদ্ভাবন সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়, ফলে মনের দুঃখে শ্রেয়ার দেশত্যাগ করে দক্ষিণ আমেরিকার ব্রাজিলে যান এবং সেখানেই ৮৫ বছর বয়সে প্রাণত্যাগ করেন। শ্রেয়ার যখন ইলেকট্রনিক মেশিনের নির্মাণ কাজে ব্যস্ত ছিলেন তখন সুজে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রিলেযুক্ত কমপিউটার মডেল Z-3 এর নির্মাণ কাজ শেষ করেন। এ কাজে তাঁকে এক্সপেরিমেন্টাল এয়ার ক্রাফট ইনস্টিটিউট খুবই সাহায্য করে। Z-2 মডেলের কার্যকারিতা ও উপকারিতা দেখে এয়ারক্রাফট কর্তৃপক্ষ খুবই সন্তুষ্ট হয়ে Z-3 মডেল তৈরি করার সময় আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করেছিল। তিনি একা একাই অবসর সময়ে বাড়িতে বসে এই কাজটি শেষ করেন। এর পরপরই তাঁকে পূর্ব সীমান্তে সক্রিয়ভাবে যুদ্ধে যোগ দিতে হয়েছিল।

মডেলটি ছিল বিশ্বের সর্বপ্রথম সাধারণভাবে ব্যবহৃত ডিজিটাল কমপিউটার। এটার কাজ ১৯৪৩ সালে সমাপ্ত হয়েছিল। এতে বাইনারি নাম্বার, ফ্লোটিং পয়েন্ট, অ্যারিথমেটিক এবং ২২ টি বিটসম্পন্ন ওয়ার্ড যুক্ত করা হয়েছিল। হিসাব করে দেখা যায় যে, এতে ২০০০টি রিলে, ৮টি ইউনিসিলেকটর সুইচ লেগেছিল এবং খরচ হয়েছিল ৭ থেকে ৮ হাজার ডলার।

যুদ্ধের পর সুজের উদ্ভাবিত যন্ত্রপাতিগুলো স্থায়িত্ব ও বিশ্বস্ততার ক্ষেত্রে এক অনন্য উদাহরণ হয়ে দাঁড়ায় । Z-3 মডেলটি নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হওয়ার পর এটাকে পরীক্ষামূলক কাজে ব্যবহার করা হতো। এর মেমোরি বা স্মৃতি খুব কম হওয়ার ফলে এটাকে কখনো রুটিন মাফিক কাজে ব্যবহার করা যায় নি। এটা যে পরিপূর্ণরূপে কার্যকরী ছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। যুদ্ধের সময় এটা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হলেও যুদ্ধের পর কয়েক বছর পরে পেটেন্ট অফিস থেকে প্রাপ্ত কাগজপত্র দেখে এটি পূনর্নির্মাণ করা হয়। বর্তমানে এটি মিউনিখের মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে।

সুজে আরো কয়েকটি কমপিউটার বানিয়েছিলেন। এর মধ্যে S-1 মডেলের কমপিউটার ছিল একটি নন–প্রোগ্রামেবল মেশিন। এতে হার্ডওয়ার প্রোগ্রাম ব্যবহার করা হয়। এটি দিয়ে HS-293 নামক উড়ন্ত বোমারু বিমানের ডিজাইন করা হয়। এটা ছিল পাইলটবিহীন বিমান যা একটি বড় বোমারু বিমান, থেকে দূর–নিয়ন্ত্রণ করতে পারতো। পদ্ধতির সাহায্যে নিয়ন্ত্রিত হতো। S-1 মডেলটি কয়েক ডজন ক্যালকুলেটরে কাজ একত্রে (remote-control) S-1 এর পরবর্তী সংস্করণ S-2 তৈরি করা হয়েছিল, কিন্তু সেটা বাস্তবে প্রয়োগের পূর্বেই বার্লিনের পতন হয়। তাঁর মতে

ওটা রাশিয়ান সৈন্যদের হাতে চলে গিয়েছিল, কিন্তু রাশিয়ানরা বুঝতে পারে নি ওটা কি ছিল, Z-4 মডেলের কম্পিউটারটি আকারে বেশ বড় ছিল এবং সাধারণ কাজে ব্যবহার করা যেতো। এটাই একমাত্র কম্পিউটার যেটি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ধ্বংসলীলা থেকে রক্ষা পেয়েছিল।

Z-৩ মডেলের নির্মাণ কাজ শেষ না হতেই Z-4 মডেলের নির্মাণ কাজ শুরু করা হয়। এটা তৈরি করার সময় সাফল্যজনকভাবে তিনি মেকানিক্যাল মেমোরি ডিজাইন করেন। বর্তমান যুগে এই ডিজাইন কাজকে হয়তো খুবই সাধারণ কাজ বলে মনে হবে, কিন্তু সে যুগে ওটা ছিল সর্বাধুনিক পদ্ধতি যার দ্বারা তিনি অনেক মেমোরিযুক্ত এবং যুক্তিসঙ্গত আয়তনের কম্পিউটার তৈরি করেছিলেন। যদি তিনি Z-৩ মডেলের রিলে মেমোরি ব্যবহার করতেন তবে Z-4 এর আয়তন হতো ৩২ টি Z-৩ কম্পিউটারের আয়তনের সমান।

যখন বার্লিনে Z-4 মডেলটি তৈরি করা শুরু হয় তখন মিত্রপক্ষ বার্লিনের উপর বোমাবর্ষণ শুরু করে দিয়েছিল। ফলে বোমা আক্রমণের ভয়ে সবাইকে তটস্থ থাকতে হতো। সুজের ওয়ার্কশপটি বহুবার বোমাবর্ষণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। এজন্য Z-4 তৈরি কালে যন্ত্রটিকে বার্লিনের নানাস্থানে সরিয়ে নিতে হয়েছিল। ১৯৪৫ সালের প্রথমদিকে বোমা আক্রমণ তীব্রতর হলে জার্মান কর্তৃপক্ষ নিরাপত্তার কারণে সুজে ও তাঁর যন্ত্র Z-4 বার্লিন থেকে ১৬০ মাইল দূরে গ্যোটিংগেনে সরিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। ১৯৪৫ সালের ২৮ এপ্রিলের মধ্যে Z-4 মডেলের তিনটি ইউনিট তৈরি সম্পূর্ণ হয় এবং কর্তৃপক্ষের উপস্থিতিতে একটি প্রদর্শনী প্রোগ্রাম পরিচালনা করা হয়। এই উপলক্ষে সুজে বলেছিলেন যে, সুদীর্ঘ ১০ বছরের কঠোর সাধনা, পরিশ্রম ও অপেক্ষার পর তিনি এই সাফল্য অর্জন করেছিলেন।

সবচেয়ে দুঃখজনক ঘটনা হলো এই যে, ঐ বিশেষ প্রদর্শনী–অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার সাথে সাথে সমস্ত কম্পিউটার খুলে ফেলতে হয়েছিল, কারণ ঐ সময়ে মিত্রপক্ষের আমেরিকান বাহিনী গ্যোটিংগেন থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে পৌঁছে গিয়েছিল। যা হোক এই কম্পিউটার তৈরির কাজ খুব গোপনীয়ভাবে চলতে থাকে। হার্জ পর্বতমালার ভিতরে অবস্থিত Z-1 উড়ন্ত বোমা ও V-11 রকেট বোমা তৈরির কারখানায় একই সাথে Z-4 কম্পিউটার সংযোজনের কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে যেতে থাকে। তিনি তাঁর স্মৃতিকথায় সে সময়টাকে অত্যন্ত নাজুক বলে বর্ণনা করেছেন। যুদ্ধে জার্মানির পরাজয় আসন্ন হয়ে উঠলে তিনি Z-4 কে সেখানে রেখে পালাবেন না এই দৃঢ়সংকল্প প্রকাশ করলে বাধ্য হয়ে কর্তৃপক্ষ অনেক কষ্টে সেটিকে অস্ট্রিয়ান

সীমান্তের কাছে আলপাইন পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত একটি গ্রামে শস্যের গোলাঘরের ভিতর লুকিয়ে রাখে। ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত ওটা ওখানেই লুক্কায়িত ছিল। পরে উদ্ধার করে সংস্কার করা হয় এবং ১৯৫০ সালে সুইজারল্যান্ডের জুরিখে অবস্থিত টেকনিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থাপন করা হয়। কিছুদিনের জন্য এটাই ছিল সমগ্র ইউরোপ মহাদেশের একমাত্র কার্যকরী ডিজিটাল কম্পিউটার। বর্তমানে এটি মিউনিখের জাতীয় মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের তাণ্ডবলীলা শেষ হলে সুজে কম্পিউটারের উপর তাঁর চিন্তাভাবনার উন্নতি বিধানে সচেষ্ট হন। এবং সম্ভবত তিনিই সর্বপ্রথম এলগরিদ্‌মিক ভাষায়—কম্পিউটার তৈরির পরিকল্পনা করেছিলেন।

১৯৪৯ সালে তিনি তাঁর ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানটিকে পুনরায় চালু করে এটার নামকরণ করেন সুজে কে, জি। প্রথম দিকে সুইজারল্যান্ড ও পরে জার্মানি থেকে তিনি কম্পিউটার সরবরাহের অনুরোধ পেয়েছিলেন। বহু বছর ধরে তাঁর কোম্পানিটি সমগ্র ইউরোপের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ট বলে বিবেচিত ছিল। সে সময় তাঁর একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল IBM কোম্পানি। বিশ্ববিখ্যাত ক্যামেরা প্রস্তুতকারক LITZ কোম্পানি তার সর্বপ্রথম গ্রাহক ছিল। ১৯৫০ দশকের মাঝামাঝি মধ্য–ইউরোপে সাইন্টিফিক কম্পিউটার তৈরির ক্ষেত্রে বিশেষ করে অপটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিতে ব্যবহৃত কম্পিউটার তৈরির ক্ষেত্রে সুজের কোম্পানি একচেটিয়া আধিপত্য বিস্তার করেছিল।

সিরিজ কম্পিউটার রিলে ব্যবহার করে তৈরি করা হতো। পরবর্তীতে এটা সম্পূর্ণরূপে ইলেকট্রনিক সার্কিটে রূপান্তরিত করা হয়। রিলেযুক্ত কম্পিউটারের সর্বশেষ সিরিজ বিশ্বস্ততা ও দীর্ঘস্থায়িত্বের ক্ষেত্রে এক অনন্য রেকর্ডের অধিকারী হয়েছিল। পরবর্তীকালে কম্পিউটার ব্যবসায়ে নানারকম ও উন্নততর প্রযুক্তিসম্পন্ন ও বহুবিধ সুবিধাযুক্ত কম্পিউটারের উদ্ভাবনের ফলে বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানের প্রযুক্তি বাজারে এসে যাওয়ায় সুজের কোম্পানি তীব্র প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে থাকে এবং আরও বৃহৎ অংকের পুঁজি বিনিয়োগের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এই বৃহৎ অংকের পুঁজি যোগাড় করা সুজের একার পক্ষে অসম্ভব হওয়ায় বিশ্ববিখ্যাত সিমেন্স কোম্পানি সুজের কোম্পানির মালিকানা স্বত্ব ক্রয় করে নেয়।

সুজ বর্তমানে সিমেন্স কোম্পানির কম্পিউটার কনসালটেন্ট হিসেবে কাজ করছেন। পুরনো অভ্যাসবশত এখনো তিনি নিয়মিত ছবি আঁকেন । তাঁর ছবি সম্বন্ধে গুণীজনেরা মন্তব্য করেছেন যে, "সুজের ছবিগুলো মানুষের মনের গভীর অনুভূতি ও বাস্তবতার অদ্ভূত সংমিশ্রণ, যা তিনি বিভিন্ন রং–এর মাধ্যমে সুন্দরভাবে প্রয়োগ করে মনের ও

দেহের অনুভূতির মাঝে সুন্দর এক সীমারেখার সৃষ্টি করেছে। ১৯৮০ সালে এই নিরলস কর্মবীর একটি অত্যন্ত দুরূহ কাজ সম্পন্ন করেছেন। সেটি হলো তাঁর নিজের তৈরি Z-1 কম্পিউটারের আদি মডেলের পূনর্নির্মাণ। এই কাজে তিনি সম্পুর্ণরূপে তাঁর স্মৃতিশক্তির উপর নির্ভর করেছেন। বর্তমানে সেটা জার্মানির মিউনিখের যাদুঘরে রক্ষিত আছে। প্রকৌশলী বিজ্ঞানী মন্ট কোনরাড সুজে যে কোনো উদ্যমী মানুষের জন্য এক অনন্য অনুপ্রেরণার উৎস।

জন অ্যামব্রোস ফ্লেমিং

(১৮৪৯–১৯৪৫)

ইলেকট্রনিক্স প্রযুক্তির প্রথম সফল উদ্ভাবক

বিজ্ঞানী জন অ্যামব্রোস ফ্লেমিং–এর থারমো আয়োনিক ভাল্ভ্ বা ডায়োড ভাল্ভ্ আবিষ্কার বিশ্বের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে এক নব যুগের সূচনা করে, সেটি হচ্ছে প্রযুক্তির পরম বিস্ময় ইলেকট্রনিক্স। সামান্য একটি বৈদ্যুতিক ভাল্ভ্ দিয়ে রেডিও–ডিকেকটর তৈরি করার কথা সাধারণ লোকের চিন্তায় কখনো আসবে না বা আসতে পারে না, কিন্তু বিজ্ঞানী ফ্লেমিং তাই করেছিলেন। ১৯০৪ সালে তাঁর আবিষ্কারের ফলস্বরূপ আমরা পেয়েছি অসসিলেশন ভাল্ভ্ বা কম্পনতরঙ্গ সৃষ্টিকারী একটি নতুন প্রযুক্তি। এটাকে থারমোআয়োনিক ডায়োড (দুটো ইলেকট্রোডযুক্ত ভাল্ভ্) নামে অভিহিত করা হয়। তাঁর ডায়োড আবিষ্কারের দু' বছর পারে বিজ্ঞানী লি–ডি ফরেস্ট ঐ ডায়োড ভালভের মধ্যে নতুন আরেকটি ইলেকট্রোড সংযোগ করে ওটার নাম দেন ট্রায়োড। (তিনটি ইলেকট্রোডযুক্ত ভাল্ভ্)। এই দুটি ঐতিহাসিক ও অনবদ্য আবিষ্কারের পর যে ঘটনা ঘটে তা হলো ঐ দুইজন বিজ্ঞানীর মধ্যে আবিষ্কারের কৃতিত্ব বা দাবি নিয়ে পারস্পরিক আইনগত দ্বন্দ্বের সৃষ্টি। কিন্তু সেটা বড় কথা নয়। তাঁদের উদ্ভাবিত পদ্ধতির সাহায্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির জগতে সম্পূর্ণ নতুন ও বিশাল দিগন্ত জুড়ে এক অনন্য শিল্পের অর্থাৎ ইলেকট্রনিক্স শিল্পের বিকাশ ঘটে।

ইলেকট্রনিক্স–প্রযুক্তির ধারণার সর্বপ্রথম জন্ম দিয়েছিলেন বিশ্ববিখ্যাত আমেরিকান বিজ্ঞানী টমাস আলভা এডিসন। ১৮৮৩ সালে তিনি একটি উজ্জ্বল আলো বিচ্ছুরণকারী বালবের ভিতর প্রথমে একটি তার ও পরে একটি ধাতব পাত সংযুক্ত করে দেখতে পেয়েছিলেন যে, যদি ঐ ধাতব পাতটি ফিলামেন্টের পজিটিভ বা ধনাত্মক অংশের সাথে সংযোগ করা হয় তাহলে গ্যালভানোমিটারের ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হতে দেখা যায়। কিন্তু যদি ঐ ধাতব পাতটি ফিলামেন্টের নেগেটিভ বা ঋণাত্মক অংশের সাথে সংযোগ করা হয় তবে গ্যালভানোমিটারের ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হওয়ার কোনো লক্ষণই দেখা যায় না, অর্থাৎ কোনো প্রকার বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় না। তাঁর ঐ পরীক্ষার কিছুদিন পরে বিজ্ঞানী জে. এলস্টার ও বিজ্ঞানী এইচ. গেইটেল ধাতব

পাতকে ব্যাটারির পজিটিভ অংশের দিকে যুক্ত করে একমুখী বিদ্যুৎপ্রবাহের (Unidirectional current) প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করেছিলেন।

বিজ্ঞানী এডিসনের পর্যবেক্ষণ করা এই বাপারটি পরবর্তী বিশ বছর ধরে বিশ্বের বহু বিজ্ঞানী কর্তৃক পরীক্ষিত হয়েছিল। তাঁদের সবার মূল লক্ষ্য ছিল থারমোআয়োনিক ইমিশন বা ধাতব পাত উত্তপ্ত করে সেটা থেকে ইলেকট্রন-বিকিরণ পরীক্ষা করা। ফ্লেমিং নিজে এ সম্বন্ধে উৎসুক হয়ে ১৮৮৩ সালে প্রথম এবং ১৮৮৬ সালে দ্বিতীয়বার খুবই সাবধানতার সাথে "এডিসন এফেক্ট্" পর্যবেক্ষণ করেন। ১৮৮৪ সালে যুক্তরাষ্ট্র সফরকালে তিনি হয়তোবা এ সম্বন্ধে এডিসনের সাথে আলাপও করেছিলেন। সুদীর্ঘ বিশ বছর ধরে 'এডিসন এফেক্ট্' বিজ্ঞানীদের মাঝে যথেষ্ট কৌতূহল সৃষ্টি করে রেখেছিল সত্যি, কিন্তু কোন্ কোন্ বিশেষ ক্ষেত্রে এটার প্রয়োগ হতে পারে সে সম্বন্ধে কারো কোনো পরিষ্কার ধারণা ছিল না।

বিজ্ঞানী ফ্লেমিংই সর্বপ্রথম "এডিসন এফেকট"–এর বাস্তব প্রয়োগ করতে সক্ষম হন। তিনি হাই ফ্রিকোয়েন্সি অসসিলেশনকে পরিশোধন বা রেক্টিফিকেশন করার কাজে এটি প্রয়োগ করেন। এডিসন যখন তাঁর ঐ উদ্ভাবন সম্বন্ধে সর্বপ্রথম শুনতে পান তখন তিনি নিজকে ধিক্কার দিয়েছিলেন এই বলে যে, এত বড় একটি উদ্ভাবন করা সত্ত্বেও তিনি নিজেই সেটার গুরুত্ব বুঝতে পারেন নি। ১৮৮৪ সালে তিনি অবশ্য তাঁর ঐ পর্যবেক্ষণটি পেটেন্ট করে নিয়েছিল। তাঁর ঐ পর্যবেক্ষণটিকে এবং পেটেন্টটিকে যথাক্রমে ইলেকট্রনিক্স প্রযুক্তির সর্বপ্রথম পর্যবেক্ষণ ও সর্বপ্রথম পেটেন্ট মনে করা হয়। এটাকে অবশ্য তখন ভোল্টেজ ইনডিকেটর হিসেবে ব্যবহার করা হতো।

১৮৪৯ সালের ২৯ নভেম্বর ইংল্যান্ডের ল্যাংকাশায়ারের এক ধর্মযাজক পিতার ঘরে ফ্লেমিংয়ের জন্ম হয়। পিতামাতার ৭ সন্তানের মধ্যে তিনি সর্বজ্যেষ্ঠ ছিলেন। তাঁর মা কেন্টের সোয়ানকম্ব এলাকার এক অভিজাত পরিবারের কন্যা ছিলেন। ঐ পরিবার সর্বপ্রথম পোর্টল্যান্ড সিমেন্ট তৈরি করার অনন্য ঐতিহ্যের অধিকারী ছিল। ১৮৫৪ সালে তাঁর পিতামাতা লন্ডনে বসতি স্থাপন করে। দশ বছর বয়সে তাঁকে সর্বপ্রথম স্কুলে ভর্তি করা হয়। স্কুলে ভর্তি হওয়ার পূর্বে তাঁর মা তাঁকে নিজে পড়াতেন। ঐ সময়ে তিনি "চাইল্ডস গাইড টু নলেজ" নামক বিখ্যাত বইটি সম্পূর্ণ মুখস্থ করেছিলেন। এমনকি পরবর্তী জীবনেও তিনি অবলীলায় বইটির যে কোনো অংশ মুখস্থ বলতে পারতেন। স্কুলে ভর্তি হওয়ার পর জ্যামিতির প্রতি তার খুব বেশি আকর্ষণ দেখা যায়। ইউনিভার্সিটি স্কুলে অধ্যয়নকালে সবসময় অংকে তিনি সর্বোচ্চ নম্বর পেলেও ল্যাটিনে সবার চেয়ে কম নম্বর পেতেন।

ছোটবেলা থেকেই তিনি একজন ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষা মনে মনে পোষণ করতেন, ফলে এগার বছর বয়সেই তিনি নিজস্ব ওয়ার্কশপ গড়ে তুলেছিলেন এবং নৌকা ও জাহাজের বিভিন্ন মডেল নিজ হাতে তৈরি করতেন। ঐ বয়সেই তিনি নিজের ক্যামেরা স্বহস্তে তৈরি করে নিয়েছিলেন এবং সারাজীবন ছবি তোলা তাঁর অন্যতম প্রধান শখ ছিল। একজন ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া অর্থাৎ ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার মতো পারিবারিক আর্থিক স্বচ্ছলতা না থাকার কারণে তাঁকে বিকল্প পথে সম্পূর্ণ নিজস্ব প্রচেষ্টা ও ঐকান্তিক অধ্যবসায়ের দ্বারা ইঞ্জিনিয়ারিং দক্ষতা অর্জন করতে হয়েছিল।

১৮৬০ সালে তিনি লন্ডনের ইউনিভার্সিটি কলেজে বি. এস. সি. ক্লাসে ভর্তি হন। সেখানে অধ্যাপক এ. ডি. মরগানের কাছে অঙ্কশাস্ত্র এবং অধ্যাপক জি. কারে ফস্টারের কাছে পদার্থবিদ্যা অধ্যয়ন করেন। দু' বছর পরে আর্থিক অনটনের কারণে পড়াশুনা ছেড়ে দিয়ে আয়ারল্যান্ডের ডাবলিন শহরে একটি জাহাজ নির্মাণ কারখানায় তাঁকে চাকরি নিতে হয়। ঐ কাজটি তাঁর কাছে খুবই একঘেয়েমি ও বিরক্তিকর মনে হওয়ায় কিছুদিন পর সেটি ছেড়ে দিয়ে লন্ডনের স্টক এক্সচেঞ্জের একটি প্রতিষ্ঠানে চাকরি গ্রহণ করেন এবং দীর্ঘ দু' বছর সেখানে কাজ করেন। পরবর্তীকালে তিনি যখন অধ্যাপক হিসেবে ছেলেমেয়েদেরকে পড়াতেন তখন প্রায়ই ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে বলতেন যে, তাঁর মতে প্রত্যেক ছেলেমেয়ের কিছুদিন স্টক এক্সচেঞ্জের কাজ করে জনগণের বিশ্বাস ও আস্থার বিনিময়ে কিভাবে তীব্র প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশে পয়সা উপার্জন করতে হয় সে সম্বন্ধে কিছু অভিজ্ঞতা অর্জন করা উচিত।

স্টক একচেঞ্জে কাজ করার সময় বিকেল ৪ টার দিকে তাঁর দায়িত্ব শেষ হয়ে যেতো, তখন তিনি টাকা পয়সার বিচিত্র জগৎ ছেড়ে কলেজের সান্ধ্যকালীন ক্লাসে উপস্থিত হয়ে পড়াশুনা চালিয়ে যেতেন। এভাবে ১৮৭০ সালে প্রথম শ্রেণীসহ অনার্স ডিগ্রি লাভ করেন। পরবর্তী ১৮ মাস এক স্কুলে বিজ্ঞানের শিক্ষক হিসেবে শিক্ষকতা করে টাকাপয়সা সঞ্চয় করে পুনরায় পড়াশুনায় ফিরে যান। এবার তিনি রসায়নশাস্ত্র অধ্যয়ন করার জন্য লন্ডনের সাউল কেনসিংটনে অবস্থিত রয়্যাল কলেজ অফ সায়েন্সে ভর্তি হন। এই কলেজটি বর্তমানে ইম্পিরিয়াল কলেজ নামে বিশ্ববিখ্যাত। সেখানে তিনি সর্বপ্রথম ভোল্টায়িক সেল বা ভোল্টা বিদ্যুৎকোষের উপর পড়াশুনা করেন এবং তাঁর জীবনের প্রথম বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রবন্ধ রচনা করেন। ভোল্টা সেলের উপর রচিত গবেষণা নিবন্ধটি তাঁর জীবনে এক বিরাট পরিবর্তনের সূচনা করে। তাঁর নিবন্ধটি নবপ্রতিষ্ঠিত লন্ডন ফিজিক্যাল সোসাইটির (বর্তমানে ইনস্টিটিউট অব ফিজিক্স) সর্বপ্রথম গবেষণাপত্র হিসেবে পঠিত হয় এবং সোসাইটির কার্য বিবরণীর (procedings) প্রথম পাতায় প্রকাশিত হয়।

আর্থিক দৈন্যের কারণে তাঁকে পুনরায় শিক্ষকতার পেশায় ফিরে যেতে হয়। ১৮৭৪ সালের গ্রীষ্মকালে তিনি চেলটেনহাম পাবলিক কলেজের বিজ্ঞানশিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। এ সময় শিক্ষকতার সাথে সাথে তিনি নিজস্ব গবেষণাও করতেন এবং কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানী অধ্যাপক ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েলের সাথে পত্রের মাধ্যমে যোগাযোগ করেন। এক বছর শিক্ষকতা করে চারশত পাউন্ড সঞ্চয় করে এবং বছরে পঞ্চাশ পাউন্ডের একটি বৃত্তির ব্যবস্থা করে ১৮৭৭ সালের অক্টোবর মাসে ২৮ বছর বয়সে তিনি পুনরায় কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। বিজ্ঞানী ক্লার্ক ম্যাক্সওয়লের নিকট তিনি অধ্যয়ন করতেন। ম্যাক্সওয়েলের বক্তৃতা এত বেশি উচ্চমানের হতো যে, কখনো কখনো ক্লাশে ছাত্রদের পক্ষে তা অনুসরণ করা খুবই কষ্টসাধ্য হতো। ম্যাক্সওয়েল কথা বলার সময় এত দ্রুত ও অস্পষ্ট স্বরে বলতেন যে, ছাত্ররা এর মাথামুণ্ড কিছুই বুঝতো না। এ সম্বন্ধে গল্প প্রচলিত আছে যে, কখনো কখনো এরূপ হতো যে, ম্যাক্সওয়েলের ক্লাসে একমাত্র ফ্লেমিং ছাড়া আর কোনো ছাত্রকেই পাওয়া যেতো না।

কিছুদিন পর ফ্লেমিং পদার্থবিদ্যা ও রসায়নসহ প্রথম শ্রেণির ডিগ্রি লাভ করেন এবং লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় হতে ডক্টর অফ সায়েন্স (D.S.C.) ডিগ্রি অর্জন করে এক বছর কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং–এর ডেমনেস্ট্রেটর হিসেবে কাজ করেন। সেখান থেকে নটিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিজিক্স ও ম্যাথমেটিক্স–এর প্রথম প্রফেসর হিসেবে কিছুদিন কাজ করার পর সেটাও ছেড়ে দেন।

তাঁর জীবনের এই অধ্যায় পর্যন্ত বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, তিনি শুধু একজন অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ও সফল শিক্ষকই ছিলেন না, শিক্ষা গ্রহণ করার প্রতি তাঁর একটি সহজাত প্রবৃত্তি জাগ্রত ছিল, ফলে কোনো স্থায়ী কাজ তাঁর পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব হয় নি। লেখাপড়া শেষ করে তিনি যখন কোন পথে অগ্রসর হবেন, জীবনধারণের জন্য কী ধরনের পেশা গ্রহণ করবেন ইত্যাদি চিন্তাভাবনা করছিলেন, ঠিক তখনি তাঁর এক চাচাতো ভাই আরনল্ড হোয়াইট, যিনি লন্ডনস্থ এডিসন টেলিফোন কোম্পানির সেক্রেটারী ছিলেন, ফ্লেমিংকে তাঁর কোম্পানির কনসালটেন্ট হওয়ার জন্য প্রস্তাব করেন। সে সময় টেলিফোন–ব্যবসা খুব দ্রুত প্রসার লাভ করছিল। বিভিন্ন টেলিফোন কোম্পানি একে অন্যের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে বৃহত্তর কোম্পানি গঠন করছিল। বিশেষ করে পোস্ট অফিস তখন টেলিগ্রাফ প্রযুক্তিকে পরিবর্তন করে টেলিফোন প্রযুক্তির উপর সর্বশেষ গুরুত্ব আরোপ করছিল। এই রকম যুগ–সন্ধিক্ষণে তিনি এডিসন টেলিফোন কোম্পানিতে যোগদান করেন। তাঁর ভাই একই সাথে এডিসন ইলেট্রিক লাইট

কোম্পানিরও সেক্রেটারী ছিলেন। তাঁর বিশেষ অনুরোধে তিনি লাইটিং কোম্পানিরও উপদেষ্টা নিযুক্ত হন। ঐ কোম্পানিতে যোগদান করার পর তিনি কোম্পানিকে বেশ কিছু সংখ্যক বড় বড় ব্যবসা পেতে সাহায্য করেন, তার মধ্যে ব্রিটিশ নৌবাহিনীর যুদ্ধজাহাজে বৈদ্যুতিক বাতি সংযোজনের কাজটি উল্লেখযোগ্য। ১৮৮৪ সালে কোম্পানির পক্ষ থেকে তাঁকে যুক্তরাষ্ট্রে পাঠানো হয়। তখন তিনি বিখ্যাত বিজ্ঞানী এডিসনের সাথে দেখা করার সৌভাগ্য লাভ করেন।

তাঁর যোগ্যতা ও কর্মকুশলতার কথা ধীরে ধীরে সর্বত্র প্রচারিত হতে থাকে। ১৮৮৬ সালে তাঁকে লন্ডন ইউনিভারসিটি কলেজের ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং–এর প্রথম অধ্যাপক হিসেবে নিয়োগ করার প্রস্তাব করা হয়। এতদিন পরে মনে হয় যে, তাঁর তীক্ষ্ণ মেধা ও অভিজ্ঞতা যথাযথভাবে প্রয়োগ করার মতো সঠিক পেশায় তিনি নিযুক্ত হন। লন্ডন শহরটি তিনি খুবই পছন্দ করতেন, কাজেই লন্ডনে থাকার মতো একটি কর্মসংস্থান হওয়ায় তিনি খুবই খুশি হন। এ সময় পড়াশুনার চাপ কম থাকায় (সপ্তাহে ১ ঘন্টা) বাকি সময় তিনি কনসালটেন্সিতে ব্যস্ত থাকতেন। প্রথম যখন তিনি অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন, তখন তাঁকে শুধুমাত্র একটি ব্ল্যাকবোর্ড ও একটি চকপেন্সিল দেওয়া হয়। ধীরে ধীরে তিনি কর্তৃপক্ষকে রাজি করিয়ে তাঁর জন্য একটি ঘর এবং মাসে ১৫০ পাউন্ডের একটি অনুদান আদায় করতে সক্ষম হন। পরবর্তী এক বছরের মধ্যে তাঁর আন্তরিক প্রচেষ্টায় ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং–এর একটি পূর্ণাঙ্গ ল্যাবরেটরি প্রতিষ্ঠার জন্য কর্তৃপক্ষ পাঁচ হাজার পাউন্ড প্রদান করে।

১৮৯৯ সালে তিনি মার্কনি ওয়ারলেস কোম্পানির উপদেষ্টা নিযুক্ত হন। উক্ত পদে থাকাকালে ১৯০১ সালে আটলান্টিকের এপার থেকে ওপারে সিগনাল প্রেরণের ঐতিহাসিক ঘটনায় যে যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হয়েছিল সেগুলোর নির্বাচন তিনি করেন। ন্যাশনাল টেলিফোন কোম্পানি ও এডিসন লাইট কোম্পানির পরামর্শদাতা হিসেবে তিনি অনেক অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। তত্ত্বীয় বিদ্যা ও বাস্তব অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হয়ে তিনি এমন এক স্তরে উপনীত হন যেখান থেকে অনায়াসে তিনি ইলেকট্রনিক্স নামক সম্পূর্ণ নতুন এক জগতে পদক্ষেপ করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

১৯০৪ সালের অক্টোবর মাসে হঠাৎ একদিন তাঁর মাথায় একটি চিন্তার উদয় হয়। সে চিন্তাটিকে পরবর্তীকালে তিনি খুবই সুখকর এবং সাফল্যজনক চিন্তা বলে অভিহিত করেছেন। তিনি ধারণা করেন যে, টেলিফোন ও গ্যালভানোমিটারের সাহায্যে একটি দ্রুত কম্পনশীল রেডিও সিগনালের পজিটিভ ও নেগেটিভ সাইক্লিক গতির পরিমাপ করা যায় না, যেটা পরিমাপ করা যায় সেটা হচ্ছে এর গড় মান, অর্থাৎ শূন্য মান। যে

কোনো চক্রাকার গতির গড় মান শূন্য হয়। 'এডিসন এফেক্ট' থেকে এটা সবারই জানা ছিল যে, একটি বৈদ্যুতিক বালবের ভিতর যদি একটি উত্তপ্ত ফিলামেন্ট এবং একটি ইনসুলেটেড ধাতব পাত স্থাপন করা যায় তাহলে একমুখী বিদ্যুৎপ্রবাহের সৃষ্টি করা যায়। তিনি তখন আরো চিন্তা করেছিলেন যে, একইভাবে একটি উচ্চ কম্পনশীল বিদ্যুৎপ্রবাহকে সংশোধন করার জন্য ঐ পদ্ধতি ব্যবহার করা যেতে পারে। একথা চিন্তা করে তৎক্ষণাৎ তাঁর সহকারী জি. বি. ডাইককে পরিকল্পনা মোতাবেক পরীক্ষণ করার জন্য বলেন এবং আশ্চর্যের বিষয় যে, বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা গেল, সত্যিই ঐ পদ্ধতিটি একটি রেকটিফায়ার হিসেবে কাজ করছে, অর্থাৎ উচ্চ মাত্রায় কম্পনশীল দিক পরিবর্তনকারী বিদ্যুৎপ্রবাহকে একমুখী বিদ্যুৎপ্রবাহে রূপান্তরিত করতে সক্ষম হচ্ছে।

এ ঘটনার এক মাস পর তিনি বিজ্ঞানী মার্কনির নিকট লিখিত একটি পত্রে উল্লেখ করেন যে, শুধুমাত্র একটি গ্যালভানোমিটার ও নতুন পদ্ধতি ব্যবহার করে তিনি অ্যান্টেনা থেকে বেতার সংকেত (Radio-signal) ধারণ করতে পেরেছেন। বিজ্ঞানী মার্কনি ফ্লেমিং–এর চিন্তাধারা ব্যবহার করে নিজের নামে উক্ত পদ্ধতিটির স্বত্বাধিকার পেটেন্ট করিয়ে নেন। একথা শুনে ফ্লেমিং খুবই মর্মাহত হয়েছিলেন। মার্কনি বেশ কয়েকটি ডায়োড রেকটিফায়ারও তৈরি করেছিলেন, কিন্তু সেগুলো তৎকালে রেডিও সিগনাল নির্ণয়পদ্ধতিতে তেমন উল্লেখযোগ্য কোনো অবদান রাখতে সক্ষম হয় নি।

কয়েক বছর পরে ডি–ফরেস্ট ওয়ারলেস কোম্পানির বিজ্ঞানী এইচ. এইচ. ডানিউডি কৃস্টাল ডিটেক্টর করে ডায়োডের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি পদ্ধতির প্রচলন করেন। তাঁর ঐ উদ্ভাবন ছিল বিজ্ঞানী ডি. ফরেস্টের অসীম অধ্যবসায়ের ফসল। তিনি মার্কনি প্রবর্তিত রেডিও প্রযুক্তির একচেটিয়া আধিপত্য ক্ষুণ্ন করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে অবশেষে সফলকাম হন। ১৯০৫ সালে তিনি ডায়োডের পেটেন্ট লাভ করেন। তাঁর উদ্ভাবিত ডায়োডে তিনি দুই ব্যাটারির সংযোগ পদ্ধাতির প্রবর্তন করেন, অপরদিকে ফ্লেমিং এক ব্যাটারির সংযোগবিশিষ্ট ডায়োডের উদ্ভাবন করেছিলেন। ডি. ফরেস্ট তাঁর উদ্ভাবিত ডায়োডের নামকরণ করেছিলেন "ওডিয়ন"। ফ্লেমিং মনে করেছিলেন যে, ডি. ফরেস্ট তাঁর উদ্ভাবিত পদ্ধতি নকল করেছেন, তাই তিনি ডি. ফরেস্টের বিরুদ্ধে তাঁর উদ্ভাবিত পদ্ধতি চুরির অভিযোগ করে মামলা দায়ের করেন এবং এভাবে দুই বিজ্ঞানীর মধ্যে আবিষ্কার স্বত্ব নিয়ে সুদীর্ঘ ও তিক্ত বিবাদের সূচনা হয়। ১৯০৬ সালের অকটোবরে ডি. ফরেস্ট ডায়োডের মধ্যে নতুন আরেকটি ইলেকট্রোড যুক্ত করে এর নাম দিলেন ট্রায়োড (তিনটি ইলেকট্রোড বিশিষ্ট বালব) এবং দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি এই নব উদ্ভাবিত ট্রায়োডেরও নামকরণ করেন "ওডিয়ন", ফলে ফ্লেমিং–এর সাথে তাঁর ভুল

বোঝাবুঝি ও রেষারেষি আরো বেড়ে যায় এবং এটা দীর্ঘকাল ধরে চলতে থাকে। বিজ্ঞানী ফ্লেমিং ডায়োডের আবিষ্কারক হিসেবে নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আইনগত লড়াই করে চলেছিলেন, তিনি ট্রায়োড সম্বন্ধে কখনো কোনো প্রকার দাবি উত্থাপন করেন নি।

তিনি অবশ্য ধাতব পাতের পরিবর্তে আঁকাবাঁকা তার ব্যবহার করে (অ্যানোড) পরীক্ষণ কাজ করেছিলেন, কিন্তু ধাতব পাত ও আঁকাবাঁকা তার, এ দুটো কখনো একসাথে ব্যবহার করেন নি। এ সম্বন্ধে তিনি অবশ্য পরবর্তীকালে লিখেছিলেন, 'দুঃখের বিষয়ই বলতে হয় যে , আমি কখনো চিন্তাই করি নি যে, ধাতব পাত ও আঁকাবাঁকা তার, এ দুটো একই বালবের ভিতর স্থাপন করে এবং ইলেকট্রিক চার্জ করে অ্যানোড প্লেটের দিকে ইলেকট্রন প্রবাহের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হতে পারে।'

ফ্লেমিং দীর্ঘ জীবনের অধিকারী হয়ে ৯৫ বছর বেঁচে ছিলেন। অবশ্য জীবনের শেষ পর্যায়ে তিনি বধিরতা রোগে আক্রান্ত হন। এটা তাঁদের বংশানুক্রমিক রোগ ছিল। তাঁর বোনও একই রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। লন্ডন ইউনিভর্সিটি কলেজের প্রফেসর হিসেবে কর্মরত অবস্থায় একদিন তিনি তাঁর বোনের সাথে খুবই উচ্চস্বরে কথাবার্তা বলছিলেন, এতে বিরক্ত হয়ে তাঁর বোন উচ্চস্বরে কথা বলতে নিষেধ করেছিলেন। তাঁর সহকর্মীরা অবশ্য মনে করতেন যে, সময় সময় তিনি বেশ ভালো শুনতে পেতেন এবং কখনো কখনো একেবারেই শুনতে পেতেন না। এটা অবশ্য নির্ভর করতো তিনি যেটা শুনছেন সেটা তাঁর পছন্দনীয় বিষয় কি না তার ওপর।

জীবনের পরিণত বয়সেও বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তিনি জ্ঞানার্জনের চেষ্টা করেছেন। তিনি সর্বদাই নতুন কিছু জানার চেষ্টা করতেন। ট্রান্সফরমারের কার্যকারিতা পরীক্ষা করে তিনি এই বিষয়ে এতই দক্ষতা অর্জন করেন যে, বিখ্যাত ট্রান্সফরমার নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান "ফেরান্টি" কোম্পানি তাঁকে উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ করে। তিনি ইলেকট্রিসিটির বিভিন্ন পরিমাপ ও মান নির্ণয়ে যথেষ্ট অবদান রেখেছেন, আলো বিচ্ছুরণকারী বাতি, ফটোমেট্রি, ইলেকট্রিক্যাল রেজিস্টেন্সের উপর নিম্ন তাপমাত্রার প্রভাব এবং সবশেষে থারমোআয়োনিক প্রক্রিয়া অর্থাৎ ধাতব পদার্থকে উত্তপ্ত করে সেটা থেকে ইলেকট্রন নির্গত করার কলাকৌশল আয়ত্ত ও প্রয়োগ করে খ্যাতি অর্জন করেছেন।

কর্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণ করার পরবর্তী ১৫ বছর তিনি লন্ডন টেলিভিশন সোসাইটির সভাপতি ছিলেন। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে তাঁর অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বিভিন্ন

প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে তাঁকে নানা প্রকার সম্মান ও পদকে ভূষিত করা হয়। এগুলোর মধ্যে ১৮৯২ সালে প্রদত্ত রয়্যাল সোসাইটির সদস্যপদ উল্লেখযোগ্য। ১৯২৯ সালে ব্রিটিশ সরকার তাঁকে স্যার উপাধিতে ভূষিত করে। সুদীর্ঘ ৭৭ বছর লন্ডনে বসবাস করে কর্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণ করার পর তিনি সমুদ্রতীরবর্তী শহর মিডসাইডে জীবনের অবশিষ্ট ২০টি বছর অতিবাহিত করেন এবং ১৯৪৫ সালের ১৮ এপ্রিল বার্ধক্যজনিত কারণে ৯৫ বছর বয়সে স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেন। তিনি দুবার বিয়ে করেছিলেন, তবে তাঁর কোনো সন্তান নেই। ১৯১৭ সালে প্রথমা স্ত্রী ক্লারা রিপ্লের মৃত্যু হলে ১৯৩৩ সালে অলভ ফ্রাককে বিয়ে করেন। দ্বিতীয়া স্ত্রী বহু বছর জীবিত ছিলেন।

তাঁর সমসাময়িক বিজ্ঞানীরা তাঁকে একজন সফল ও জনপ্রিয় শিক্ষক হিসেবে বর্ণনা করেছেন। অনেকে বলেছেন যে, তিনি একজন শিক্ষক হিসেবেই পৃথিবীতে জন্ম নিয়েছিলেন। তাঁর বক্তৃতা শুনে সবাই মুগ্ধ হয়ে যেত। তিনি একজন অত্যন্ত দক্ষ ফটোগ্রাফার ছিলেন। এছাড়াও ছবি আঁকা এবং পর্বতারোহণ তাঁর অত্যন্ত প্রিয় সখ ছিল। তবে খুব বেশি মেলামেশা তিনি পছন্দ করতেন না এবং লোকদেখানো কোনো প্রকার আত্মম্ভরিতা বা অহংকার তাঁর মধ্যে ছিল না। তিনি পিতার মতোই অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ ছিলেন। মাঝে মাঝে গীর্জায় গিয়ে লোককে ধর্ম সম্বন্ধে উপদেশও দিয়েছেন। নিজের কোনো সন্তানসন্ততি না থাকার কারণে তিনি তাঁর সমস্ত সম্পত্তি চার্চের নামে এবং যে সমস্ত জনকল্যাণমুলক প্রতিষ্ঠান সমাজের দুস্থ ও অসহায় মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত তাদের নামে ওয়াকফ করে দিয়েছিলেন।

একটি বৈদ্যুতিক বাতিকে (elcetric bulb) ইলেকট্রনিক ভালভে রূপান্তরিত করে তিনি পৃথিবীর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে এক বিপ্লব ও নবযুগের সূচনা করে গেছেন। তাঁর অধ্যবসায়ী জীবন বিশেষ করে বিদ্যার্জনের প্রতি তাঁর অনুরাগ ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য এক অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসেবে চির অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে আছে এবং থাকবে।

জ্যাঁ মরিস ইমিলি বদো

(১৮৪৫—১৯০৩)

কৃষক হতে বিজ্ঞানী

কৃষক পিতার ঘরে জন্ম নিয়ে এবং সুদীর্ঘকাল কৃষিকাজে নিয়োজিত থেকেও বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন বিজ্ঞানী জ্যাঁ মরিস ইমিলি বদো। টাইম ডিভিশন মাল্টিপ্লেক্সি টেলিগ্রাফ পদ্ধতির উদ্ভাবন করে বদো টেলিগ্রাফ প্রযুক্তির ক্ষেত্রে এক অনন্য অবদান রেখে গেছেন। ১৯২৭ সালে বার্লিনে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক টেলিগ্রাফ সম্মেলনে তাঁর অবদানের প্রতি স্বীকৃতির নিদর্শনস্বরূপ টেলিগ্রাফ সিগনাল গতির একক তাঁর নামে গৃহীত হয়।

১৮৪৫ সালের ১১ সেপ্টেম্বর ফ্রান্সের সারনে শহরের ম্যাগনিউক্স নামক স্থানে বিজ্ঞানী জাঁ মরিস ইমিলি বদোর জন্ম হয়। তাঁর পিতা একজন কৃষক ছিলেন এবং অবসর সময়ে জুতা সেলাইয়ের কাজও করতেন। তাঁর মা ছিলেন দর্জি। ছোটবেলায় স্থানীয় প্রাইমারি স্কুলে সামান্য লেখা পড়া করার সুযোগ হয়েছিল তাঁর। সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করার কথা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নি। তাঁর পিতা তাঁকে একজন সত্যিকার কৃষক হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন। গ্রামীণ পরিবেশে লালিত পালিত হওয়ার কারণে আজীবন তিনি সহজ সরল জীবন যাপন করে গেছেন।

২৪ বছর বয়সে কৃষিকাজ ছেড়ে দিয়ে তিনি ফরাসি টেলিগ্রাফ সার্ভিসে যোগদান করেন। এই কোম্পানিতে কাজ করার সময় তিনি সম্পূর্ণ নতুন ধরনের টেলিগ্রাফ পদ্ধতির উদ্ভাবন করে বিশ্বখ্যাত হন। তাঁর আবিষ্কৃত পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, এতে টেলিগ্রাফ সঙ্কেত সহজ ভাষায় ছাপা হয়ে বের হতো এবং টাইম ডিভিশন মাল্টিপ্লেক্সিং পদ্ধতিতে একই সাথে একাধিক ম্যাসেজ একই তারের মাধ্যমে পাঠানো যেতো। টেলিগ্রাফের সংবাদ ছাপার অক্ষরে গ্রহণ করা এবং একই সাথে একই তারের মাধ্যমে অনেক ম্যাসেজ পাঠানোর চেষ্টা অনেক আগে থেকেই বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীরা করছিলেন। কিন্তু বদোই হচ্ছেন প্রথম বিজ্ঞানী যিনি দুটো পদ্ধতিকে একসাথে যুক্ত করে বাস্তবে প্রয়োগ করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

তিনি যখন টেলিগ্রাফ বিভাগে যোগদান করেন তখন প্রিন্টিং টেলিগ্রাফ সম্বন্ধে তাঁর

কোনোরূপ ধারণাই ছিল না। তাঁর ধারণা শুধুমাত্র মোর্স কোড ও ডায়াল টেলিগ্রাফ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। একটি সাধারণ কৃষক পরিবারে জন্ম নিয়ে গ্রামের প্রাইমারি স্কুলের সামান্য লেখাপড়া নিয়ে টেলিগ্রাফ পদ্ধতিতে নতুন প্রযুক্তির উদ্ভাবন করে বিশ্ব বিখ্যাত হয়ে যাওয়া অনেকের নিকটই বিস্ময়কর মনে হবে। টেলিগ্রাফ বিভাগে নিযুক্ত হওয়ার পর তিনি নতুন কিছু করা বিশেষ করে ডায়াল টেলিগ্রাফ পদ্ধতির উদ্ভাবনের চিন্তাভাবনা করেছিলেন, কিন্তু বাস্তবে রূপদান করতে পারেন নি। পরবর্তীকালে এ সম্বন্ধে তাঁর লিখিত কাগজপত্র থেকে দেখা যায় যে, তাঁর ঐ চিন্তাভাবনা সমসাময়িক ডায়াল টেলিগ্রাফ পদ্ধতি উদ্ভাবকদের চেয়ে কোনো অংশেই কম উন্নত মানের ছিল না, যদিও ঐ সমস্ত উদ্ভাবকদের সম্বন্ধে তাঁর কোনোরূপ ধারণা বা তাঁদের সঙ্গে তাঁর কোনো যোগাযোগ ছিল না।

১৮৬৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে টেলিগ্রাফ বিভাগে যোগদান করার পর তিনি প্যারিসে অবস্থিত বিভাগীয় প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে হিউজেস টেলিগ্রাফ পদ্ধতির উপর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হন। ঐ পদ্ধতিতে গৃহীত বার্তা রোমান হরফে স্বয়ংক্রিয়ভাবে লেখা হতো। ১৮৫৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত বিজ্ঞানী ডেভিড এডওয়ার্ড হিউজেস এটা উদ্ভাবন করেছিলেন। তাঁর উদ্ভাবিত টেলিগ্রাফ পদ্ধতি সমগ্র যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপ মহাদেশে খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। হিউজেস টেলিগ্রাফ পদ্ধতির কর্মধারা ও গঠনকৌশল দেখে বদো এই যন্ত্রের প্রতি আকর্ষণ বোধ করেন এবং পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে এর কলাকৌশল সম্বন্ধে অবহিত হন।

প্রশিক্ষণ সমাপ্ত হওয়ার পর ১৮৭০ সালে তাঁকে প্যারিসের কেন্দ্রীয় টেলিগাফ দফতরে নিযুক্ত করা হয়। সে সময় ফ্রান্স ও প্রুশিয়ার মধ্যে যুদ্ধ বেধে যাওয়ায় একই বৎসরের শেষের দিকে সেনাবাহিনীতে দ্বিতীয় লেফটেন্যান্ট হিসেবে কমিশনপ্রাপ্ত হয়ে তিনি সেনাবাহিনীর টেলিগ্রাফ সার্ভিসে যোগদান করেন। ১৮৭২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে যুদ্ধ শেষ হলে লেফটেন্যান্ট বদো পুনরায় বেসামরিক নাগরিক হিসেবে টেলিগ্রাফ বিভাগের পূর্বতন কাজে ফিরে আসেন।

এই সময় তিনি সারাক্ষণ একটি চিন্তায় বিভোর থাকতেন। সেটি হচ্ছে প্রচলিত দুটি টেলিগ্রাফ পদ্ধতিকে কিভাবে একসাথে যুক্ত করা যেতে পারে। সে সময় দুটি পদ্ধতি পাশাপাশি প্রচলিত ছিল। একটি হলো বিখ্যাত মোর্স কোড পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে একজন বিশেষভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অপারেটরের প্রয়োজন হতো, কারণ আগত সঙ্কেতকে ডিকোড করে অর্থাৎ এর মর্ম উদ্ধার করে নিজহাতে কাগজের উপর বাণীটি লিখে নিতে হতো। ফরাসি বিজ্ঞানী বারনার্ড মেয়ার কর্তৃক মোর্স পদ্ধতির

কর্মদক্ষতার অনেক উন্নয়ন সাধিত হয়েছিল, ফলে একই সাথে একই তারের ভিতর দিয়ে ক্রমান্বয়ে ৪টি ম্যাসেজ বা সিগনাল প্রেরণ করা যেতো। অপরটি ছিল হিউজেস পদ্ধতি। এর সাহায্যে আগত সঙ্কেত বা ম্যাসেজকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে লিপিবদ্ধ করা যেতো, কিন্তু অসুবিধা ছিল এই যে, একবারে একটির বেশি বাণী বা ম্যাসেজ পাঠানো যেতো না। কিছুদিনের মধ্যেই নতুন নতুন উদ্ভাবনক্ষমতা ও নতুন নতুন চিন্তাধারার প্রবর্তক হিসেবে এবং কর্মদক্ষতার জন্য বদোর সুনাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। টেলিগ্রাফ বিভাগের প্রধান পরিদর্শক এম. হোকেট এ সময় তাঁকে হিউজেস পদ্ধতির পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও উন্নয়নের জন্য বিভিন্নভাবে অনুপ্রাণিত করেন, বিশেষ করে একই তারের ভিতর দিয়ে একই সময়ে একাধিক ম্যাসেজ বা বাণী প্রেরণ করার নবতর পদ্ধতি উদ্ভাবন করার জন্য দারুণভাবে উৎসাহ প্রদান করেন। এভাবে উর্ধতন কর্মকর্তাদের অনুপ্রেরণায় উৎসাহিত হয়ে তিনি খুবই মনোযোগ সহকারে কাজটি করার জন্য চিন্তাভাবনা শুরু করেন এবং অফিসে নিজস্ব কর্তব্য ও দায়িত্ব পালন করার পর বাড়িতে ফিরে এসে রাত জেগে কিংবা অফিস ছুটির পরেও অফিসে বসেই কাজকর্ম চালিয়ে যেতে থাকেন।

ধীরে ধীরে তাঁর কাজের অগ্রগতি হতে থাকে এবং এমন এক পর্যায়ে এসে পৌঁছায় যে, তাঁর বেতনের সামান্য টাকা দিয়ে তাঁর উদ্ভাবিত ও ডিজাইনকৃত যন্ত্রটি নির্মাণ করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। বাধ্য হয়ে তিনি টেলিগ্রাফ বিভাগের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট ধন্না দেন। তাঁর দুর্ভাগ্য, সে সময় টেলিগ্রাফ বিভাগের কোনো প্রকার গবেষণাগার ছিল না। কর্তৃপক্ষকে তাঁর ধ্যানধারণা ভালোভাবে বোঝানো এবং তাঁদের কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য আদায়ের লক্ষ্যে তাঁর উদ্ভাবিত যন্ত্রটির একটি কার্যকর নমুনা তৈরি করা একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তাঁর সহানুভূতিশীল সহকর্মীরা অফিসের পরে প্রতিদিন অতিরিক্ত পরিশ্রম করে তাঁর প্রয়োজনীয় সমস্ত নকশা তৈরি করে দেন। অবশেষে ১৮৭৪ সালের ১৭ জুন তিনি তাঁর উদ্ভাবিত পদ্ধতির পেটেন্ট লাভ করেন। পেটেন্টের বিষয়বস্তু ছিল "সেস্টেম দ্য টেলিগ্রাফি রেপিদি" অর্থাৎ দ্রুতগতিসম্পন্ন টেলিগ্রাফ পদ্ধতি। তাঁর পেটেন্ট লাভ করার ৬ মাস পরে তাঁরই এক সহকর্মী প্রকৌশলী লুই ভিকটর মিনন্ট আরেকটি নতুন পদ্ধতির পেটেন্ট লাভ করেন। বদোর পেটেন্ট লাভ করার তিন সপ্তাহ পরে তাঁর প্রস্তাবিত নকশাটি নির্মাণের আর্থিক সাহায্য লাভের আশায় টেলিগ্রাফ প্রশাসন কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করেন এবং প্রস্তাবিত পদ্ধতির পূর্ণাঙ্গ বর্ণনা দিয়ে ২৫ জুলাই কর্তৃপক্ষের নিকট একটি পত্র লেখেন। কর্তৃপক্ষ এ সম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিশন গঠন করে, চিফ ইঞ্জিনিয়ার এম. রেনোডও এতে ছিলেন। উক্ত কমিশন প্রস্তাবিত যন্ত্রটি

তৈরিতে সহযোগিতা করার জন্য দুহাজার ফ্রাংক আর্থিক সাহায্যের সুপারিশ করে। একই বছর ১৮৭৫ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে একটি কার্যকর মডেল তৈরি সমাপ্ত হয়। এটির পরীক্ষামূলক প্রয়োগ সাফল্যজনকভাবে সমাপ্ত হওয়ার পর একই সাথে একই তারের ভিতর দিয়ে ৪ গুণ বেশি ম্যাসেজ পাঠানো ও লিপিবদ্ধ করার সুবিধাসহ নতুন টেলিগ্রাফ পদ্ধতির বাণিজ্যিক ব্যবহার শুরু হয়।

বদো তাঁর উদ্ভাবিত পদ্ধতিতে একটি নতুন ধারণা প্রয়োগ করেছিলেন। সেটি হলো, তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে, যখন টেলিগ্রাফ লাইনে কোনো সঙ্কেত পাঠানো হয় তখন যে পালস বা স্পন্দনের সাহায্যে সঙ্কেত পাঠানো হয় সেগুলো শুধুমাত্র ম্যাসেজ প্রেরণকালেই প্রবাহিত হয় অর্থাৎ শুধুমাত্র ম্যাসেজ চলাচলকালে লাইনটি সক্রিয় থাকে, বাকি সময় লাইনটি নিষ্ক্রিয় বা অব্যবহৃত থাকে। তখন তিনি এমন কোনো পদ্ধতি উদ্ভাবনের কথা ভাবেন যাতে অনেকগুলো ট্রান্সমিটার থেকে একই সময়ে বিভিন্ন ম্যাসেজ প্রেরণ করা যায়।

তাঁর এই ধারণাকে বাস্তব রূপ দিতে গিয়ে লাইনের প্রত্যেক প্রান্ত অনেকগুলো ভাগে বিভক্ত পরিবেশক (segmented distributor) লাগানো হয়, ফলে যত সংখ্যক ম্যাসেজই একসাথে আসুক না কেন, লাইনটি একবারে একটি মাত্র ম্যাসেজ বা বাণী লিপিবদ্ধ করবে। এভাবে ৬ জন অপারেটর একই সাথে অংশীদারত্বের ভিত্তিতে (Time Division Multiplexing—TDM) একই লাইনে ম্যাসেজ পাঠাতে সক্ষম হবে। এ জাতীয় পদ্ধতি অবশ্য অনেক আগেই বিজ্ঞানী বারনার্ড মেয়ার কর্তৃক উদ্ভাবিত হয়েছিল এবং ফরাসি কর্তৃপক্ষ সেটা ব্যবহারও করেছিলেন।

যে চাকতিটি ডিস্ট্রিবিউটর হিসেবে ব্যবহৃত হতো সেটি ছিল একটি ঘূর্ণায়মান চাকতি এবং সেটি অনেকগুলো ভাগে বিভক্ত ছিল ও ঘূর্ণায়মান বাহুগুলো প্রধান লাইনের সাথে সংযুক্ত ছিল। ঘূর্ণনকালে প্রত্যেকটি বাহু পর্যায়ক্রমে ৬টি ট্রান্সমিটারের সাথে যুক্ত হয়ে যেতো। ফলে একই লাইন দিয়ে ৬টি ম্যাসেজ প্রেরণ করা সম্ভব ছিল। প্রত্যেকটি বাহু পুনরায় ৫টি ভাগে বিভক্ত করা ছিল। প্রত্যেকটি ভাগ বদো কোডের একটি ইউনিট হিসেবে ব্যবহৃত হতো। রিসিভারের বাহুগুলো ট্রান্সমিটারের বাহুগুলোর চেয়ে অপেক্ষাকৃত দ্রুততর বেগে ঘুরানো হতো এবং ৬নং সংযোগটির সাহায্যে প্রত্যেকটি ঘূর্ণনের পর একবার করে চাকটিতিকে থামানো হতো। ট্রান্সমিটার ও রিসিভারের ঘূর্ণায়মান বাহুগুলো একই দিকে ঘড়ির কাঁটার অনুরূপ দিকে ঘুরতো।

এই পদ্ধতিতে (TDM) প্রত্যেকটি বর্ণ (letter) এবং চিহ্ন (character) একই সময়ে প্রেরণের ব্যবস্থা ছিল। প্রত্যেকটি চিহ্ন পাঁচটি পালসের সমন্বয়ে গঠিত, এটা

পজিটিভ হতে পারে কিংবা নেগেটিভও হতে পারে। আধুনিক ইলেকট্রনিক্স প্রযুক্তির আলোকে এটিকে বিচার করতে হলে কিংবা বর্ণনা করতে হলে বলা যায় যে, এটি ছিল ৫ বিটবিশিষ্ট কোড, যা শূন্য ও একের (০ এবং ১) সমন্বয়ে গঠিত বাইনারির কোড ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থার গ্রাহক প্রান্তে প্রিন্টারটিকে জ্যামিতিক প্রবৃদ্ধির হারে অগ্রসর করানো হতো। প্রথম আগত পালসটি টাইপ (type) হুইলকে এক ঘর ঘুরাতো, দ্বিতীয় পালসটি দুই ঘর, তৃতীয় পালসটি ৪ ঘর, চতুর্থ পালসটি ৮ ঘর, পঞ্চম পালস ১৬ ঘর ($২^{০}$, $২^{২}$, $২^{৩}$, $২^{৪}$, $২^{৫}$) এবং সর্বশেষ পালসটি ৩২ ঘর ঘুরাতো। এভাবে নির্বাচিত শব্দটি নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট স্থানে এনে সহজ ভাষায় লিপিবদ্ধ করা যেতো। প্রাথমিকভাবে দেখা যায় যে, পর পর পাঁচটি পালসের পর ষষ্ঠ পালসটি ব্যবহার করে হুইলকে ৩২তম স্থানে নিয়ে আসা হতো।

১৯২১ সালে বিজ্ঞানী ফ্লেমিং কর্তৃক প্রকাশিত এক নিবন্ধে বদোর টেলিগ্রাফ-পদ্ধতি সম্বন্ধে বলা হয় যে, ওটা ছিল তৎকালীন বিশ্বে উদ্ভাবিত টেলিগ্রাফ পদ্ধতিগুলোর মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি। বদোর আবিষ্কারের ৪৬ বছর পরে মন্তব্য করতে গিয়ে ফ্লেমিং আরো বলেছেন, ঐ শ্রেষ্ঠতম পদ্ধতিটির একটিমাত্র অসুবিধা ছিল। সেটি হচ্ছে, এ পদ্ধতি ব্যবহারকারী অপারেটরের উপর প্রচণ্ড মানসিক চাপের সৃষ্টি হতো, কারণ ট্রান্সমিটার অপারেটরকে ঘূর্ণায়মান চাকতির বাহুগুলোর সাথে সামঞ্জস্য রেখে ৫টি সুইচ টিপে দিতে হতো—এ কাজটি আগেও করা যাবে না, পরেও করা যাবে না, সঠিক মুহূর্তে বোতামটি টিপ দিতে হতো। এটা ছিল অপারেটরদের ধৈর্যের উপর একটি কঠিন পরীক্ষা। একটি ব্যবস্থা অবশ্য ছিল সেটি হচ্ছে কোন মুহূর্তে বোতামটি টিপ দিতে হবে সেটি একটি (alarm) বা শব্দ সঙ্কেতের সাহায্যে অপারেটরকে বলে দেওয়া হতো। একটি বৈদ্যুতিক চুম্বক ঐ সুইচগুলোর বোতামগুলোকে একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা পর্যন্ত ($\frac{১}{১৪}$ সেকেন্ড) নিচের দিকে দাবিয়ে রাখতো। ঐ যন্ত্রের সাহায্যে একজন অপারেটর প্রতি মিনিটে ১৪০টি বর্ণ ও চিহ্ন পাঠাতে পারতো, যদিও বাস্তবক্ষেত্রে মাত্র ২০টি শব্দ প্রেরণ করা যেতো। পরে অবশ্য এই গতিবেগ বৃদ্ধি করে ৬০টি পর্যন্ত শব্দ প্রতি মিনিটে প্রেরণ করা যেতো।

প্রকৌশলী মিনন্টও বসে ছিলেন না। তিনি রাতদিন পরিশ্রম করে তাঁর নিজস্ব চিন্তাধারা থেকে উদ্ভাবিত পদ্ধতির অনেক উন্নয়ন সাধন করেন। তিনি বদোর সাথে দেখা করেন এবং উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কও স্থাপিত হয়। দুজনেই ছিলেন বয়সে তরুণ এবং তাঁরা একে অন্যকে খুব ভাল বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। দুর্ভাগ্যবশত মিনন্টের উদ্ভাবিত পদ্ধতি ফরাসি টেলিগ্রাফ বিভাগের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের

সহানুভূতি ও সমর্থন লাভে ব্যর্থ হয় এবং মিনন্টে হতাশাগ্রস্ত হয়ে চরম প্রতিশোধ নেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কখনো কখনো হতাশাগ্রস্ত ব্যক্তিরা তাদের উপরওয়ালাদের খুন করার পরিকল্পনা করে থাকেন। প্রকৌশলী মিনন্টও চরম হতাশাগ্রস্ত হয়ে ঝোঁকের মাথায় চিফ ইঞ্জিনিয়ারকে খুন করার পরিকল্পনা করেন। ১৮৮৮ সালের ৪ জানুয়ারি ফরাসি টেলিগ্রাফ বিভাগের চিফ ইঞ্জিনিয়ার ও টেলিগ্রাফ প্রশিক্ষণ কলেজের অধ্যক্ষ জে. এম. রেনোড প্যারিসের রুন্দ্য নোলিতে অবস্থিত তাঁর সদর দফতর থেকে দুপুর পৌনে বারটার সময় পায়ে হেঁটে বাসায় যাওয়ার পথে একব্যক্তি তাঁর পথরোধ করে দাঁড়ায় এবং নয় মিলিমিটার রিভলবার হতে পর পর ছয় টি গুলি ছোঁড়ে। গুলিবিদ্ধ রেনোডকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, সেখান হতে স্ট্রেচারে করে বাসায় নেওয়ার আট ঘন্টা পরে তিনি মারা যান।

হত্যাকারী হিসেবে প্রকৌশলী লুই ভিকটর মিনন্টকে সনাক্ত করা হয়। আদালতে মিনন্ট তাঁর প্রতি চরম অবিচার করার জন্য চিফ ইঞ্জিনিয়ারকে দায়ী করে এবং নবতর টেলিগ্রাফ পদ্ধতির একমাত্র আবিষ্কারক বলে দাবি করেন, যেটা এমিলি বদোর নামে নামকরণ করা হয়। চিফ ইঞ্জিনিয়ারের উপর দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল কে প্রকৃত আবিষ্কারক সেটা নির্ধারণ করা। চিফ ইঞ্জিনিয়ার এমিলি বদোর পক্ষে রায় দেয়ায় অসন্তুষ্ট মিনন্ট নিজের হাতে আইন তুলে নেয় এবং এই হত্যাকাণ্ড ঘটায়। যা হোক বিচারে মিনন্ট খুনের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হন, কিন্তু যেহেতু তিনি হিতাহিত জ্ঞানশূন্য এবং ক্রোধের বশবর্তী হয়ে এ কাজ করেছিলেন তাই বিজ্ঞ বিচারক সদয় হয়ে তাঁকে দশ বছর সশ্রম কারাদণ্ড ও বিশ বছর বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করেন। এরপর মিনন্ট সবার স্মৃতি থেকে হারিয়ে যান।

১৯০৩ সালে ৫৮ বছর বয়সে বিজ্ঞানী বদো পরলোক গমন করেন। তিনি একজন নিরলস পরিশ্রমী ব্যক্তি ছিলেন এবং অতিরিক্ত পরিশ্রমের কারণে স্বাস্থ্যভঙ্গা হওয়ায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর এই পরিশ্রম বৃথা যায় নি। জীবিত অবস্থাতেই তিনি দেখে গিয়েছিলেন যে, তাঁর উদ্ভাবিত টেলিগ্রাফ পদ্ধতি সমগ্র পৃথিবীতে ব্যবহৃত হচ্ছে। প্রথমে ফ্রান্সে, পরে সমগ্র ইউরোপে ও ভারতবর্ষ এবং দক্ষিণ আমেরিকাতে এটির প্রচলন হয়। ব্রিটিশ সরকার যৌথ ব্রিটিশ–ফরাসি টেলিগ্রাফ লাইনে তাঁর পদ্ধতি ব্যবহার করেছে। যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানী হুইটস্টোমের স্বয়ংক্রিয় টেলিগ্রাফ পদ্ধতি, বিজ্ঞানী বদোর স্বয়ংক্রিয় টেলিগ্রাফ লিপিবদ্ধকরণ পদ্ধতি, বিজ্ঞানী বদোর TDM পদ্ধতি, এই তিনটি তৎকালীন বিশ্বে বহুলভাবে প্রচলিত ছিল (রেডিও টেলিফোন আবিষ্কার হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত)।

প্রযুক্তির উন্নয়নের সাথে সাথে (TELEX, FAX) বাজারে এসেছে ঠিকই, কিন্তু এসব উন্নততর প্রযুক্তির ভিত্তি যাঁরা রচনা করে গেছেন তাঁদের অবদান কোনোক্রমেই ছোট করে দেখার অবকাশ নেই।

গ্রামের এক দরিদ্র কৃষকের সন্তান এবং নিজেও কৃষক হিসেবেই জীবনের অনেক বছর কাটিয়ে পরবর্তীকালে বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানীদের একজন হয়ে ফরাসি বিজ্ঞানী জ্যাঁ মরিস এমিলি বদো এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন।

চার্লস কুয়েন

(১৯৩৩–)

অপ্‌টিক্যাল ফাইবারের আবিষ্কারক

আধুনিক টেলিফোন যোগাযোগ ব্যবস্থায় অপ্‌টিক্যাল ফাইবার একটি বিস্ময়কর ও বহুল পরিচিত নাম। ১৯৬৬ সালে অপ্‌টিক্যাল ফাইবার আবিষ্কৃত হওয়ার পর থেকে মাত্র কয়েক বছরে এর প্রয়োগ, প্রসার এবং জনপ্রিয়তা, যে হারে বাড়ছে তাতে মনে হয়, ভবিষ্যতের সমস্ত টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থায় অপ্‌টিক্যাল ফাইবারই একমাত্র মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হবে। আমাদের বাংলাদেশের রেলওয়ে সিগনাল ব্যবস্থায় এবং টেলিযোগাযোগ আধুনিকীকরণে ডিজিটাল টেলিফোনে অপ্‌টিক্যাল ফাইবার ব্যবহৃত হচ্ছে।

একথা শুনে আরও আশ্চর্য মনে হবে যে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির চরম উৎকর্ষের যুগে টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থায় যেখানে কৃত্রিম উপগ্রহ ব্যবহৃত হচ্ছে, সেখানে আটলান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে টেলিফোন কেবল বসানো হচ্ছে। ১৮৬৬ সালে জার্মানির সিমেন্স ব্রাদার্স গ্রেট ইস্টার্ন নামক জাহাজে চড়ে টেলিগ্রাফ ও টেলিফোনের তার বসানোর এক শত বছর ধরে পুনরায় ১৯৮৬ সনে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়েছে। তবে একশত বছর পূর্বে যে তার বসানো হয়েছিল সেটা ছিল তামার তার–আকারে খুব মোটা, ওজনে খুবই ভারি এবং এর ভিতর দিয়ে মাত্র কয়েকশত টেলিফোন চ্যানেল বাস্তবায়ন করা যেতো। ঐ কেবলে পাঁচ কিলোমিটার পর পর রিপিটার বা সঙ্কেত বর্ধনকারী যন্ত্র বসানো ছিল। আর এখন যে টেলিফোন কেবল বসানো হয়েছে সেটি হলো অপ্‌টিক্যাল ফাইবার, যা কাঁচের আঁশের তৈরি এবং আকারে আয়তনে চুলের মতো সরু ও ওজনে কয়েক হাজার গুণ কম। এর ভিতর দিয়ে লক্ষ লক্ষ টেলিফোন–বার্তা একসাথে প্রেরণ করা সম্ভব।

১৯৬৬ সালে বিজ্ঞানী অধ্যাপক চার্লস কুয়েন কাও এবং অধ্যাপক বিজ্ঞানী জর্জ হক হ্যামের যৌথভাবে লিখিত একটি বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার পর পরই সারা বিশ্বে তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি হয়। ১৮৩০ সালে বিজ্ঞানী জে. টিনডেল লন্ডনের রয়্যাল সোসাইটিতে অপ্‌টিক্যাল গাইড সম্বন্ধে যে সম্ভাবনার কথা

তাত্ত্বিকভাবে উল্লেখ করে গিয়েছিলেন ১৯৬৬ সালে সুদীর্ঘ এক শত বছরের সাধনার ফলে বিজ্ঞানীরা সেই স্বপ্নকে বাস্তব রূপ দানে সমর্থ হয়েছেন এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে এক নবদিগন্তের সূচনা করেছেন।

বর্তমানে প্রচলিত তামার তারের ভিতর সঙ্কেত অপচয়ের পরিমাণ প্রতি কিলোমিটারে কয়েক হাজার ডেসিবেল, অপরদিকে অপ্‌টিক্যাল ফাইবারের সঙ্কেত অপচয়ের (যাকে ট্রান্সমিশন লস্‌ও বলা হয়) পরিমাণ প্রতি কিলোমিটার মাত্র ২০ ডেসিবেল বা তারও কম। একথা অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি যে, প্রতি কিলোমিটারে মাত্র ০.১ ডেসিবেল ট্রান্সমিশন লস্ সঙ্কেত সংকোচনসম্পন্ন অপ্‌টিক্যাল ফাইবার উদ্ভাবন করা সম্ভব হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের কর্নিং গ্লাস কোম্পানি সর্বপ্রথম একই অপ্‌টিক্যাল ফাইবার তৈরি করে বিজ্ঞানীদের শত বছরের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিয়েছেন। অধ্যাপক বিজ্ঞানী চার্লস কুয়েন কাওকে অপ্‌টিক্যাল ফাইবারের জনক বলা হয়।

১৯৩৩ সালে ৪ নভেম্বর চীনদেশের সাংহাই নগরীতে কাও–এর জন্ম হয়। তাঁর জন্মের দুবছর পূর্বে জাপানি বাহিনী মাঞ্চুরিয়া দখল করে মূল চীনা ভূখন্ডের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। ১৯৩২ সালের জানুয়ারি মাসে সাংহাই নগরীতে জাপানি সেনাবাহিনী উপস্থিত হলে ইউরোপীয় শক্তিসমূহ সাংহাই নগরীতে যে বিশেষ অধিকার ভোগ করতো সেটা ক্ষুণ্ন হয়। সাংহাই–এর যে অংশ ফরাসি প্রভাবাধীন ছিল সেই অংশে কাও–এর পরিবার বাস করতো। ১৯৪১ সালের ৮ ডিসেম্বর জাপানি বাহিনী চূড়ান্তভাবে সাংহাই অধিকার করে নেয়। একই সময়ে জাপানি বাহিনী হংকং, মালয়েশিয়া, ফিলিপাইন ও পার্ল হারবার দখল করেছিল।

গোটা বিশ্ব জুড়ে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রচণ্ড তাণ্ডবলীলার মাঝে কাও–এর শৈশব অতিবাহিত হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হলে কাও–এর পরিবার সাংহাই থেকে হংকং চলে আসে, কারণ হংকং তখন ব্রিটিশদের দখলে চলে এসেছিল। সেখানে সেন্ট জোসেফ কলেজে তাঁর শিক্ষাজীবন শুরু হয়। তখন চীন দেশে নিয়ম ছিল যে, কোনো চীনা বালক যদি ইংরেজি স্কুলে অধ্যয়ন করে তাহলে তাকে চার্লস নামে ডাকা হবে। ইংরেজ শিক্ষকমণ্ডলী কর্তৃক পরিচালিত স্কুলে লেখাপড়া করার ফলে তিনি অত্যন্ত উন্নত মানের ও উন্নত পরিবেশে শিক্ষা লাভ করেন, যা পরবর্তী জীবনে তাঁর খুব কাজে লেগেছিল। স্কুলে অধ্যয়নকালেই তাঁকে লন্ডনে পাঠিয়ে দেয়া হয়। সেখানে উলউইচ পলিটেকনিক থেকে "এ" লেভেল এবং ১৯৫৭ সালে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং–এ স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি এসেক্সে অবস্থিত স্ট্যান্ডার্ড টেলিফোনস্ এন্ড কেবলস্ (STC) কোম্পানিতে যোগদান করেন এবং

পরবর্তীকালে একজন রিসার্চ ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে একই কোম্পানির রিসার্চ ল্যাবরেটরিতে (STL) নিযুক্তি লাভ করেন।

এভাবে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইন্ডাস্ট্রিতে, ইন্ডাস্ট্রি থেকে ল্যাবরেটরিতে কাজ করার ফলে তাঁর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা দুটোই সমৃদ্ধ হতে থাকে। ১৯৭০ থেকে ১৯৭৪ এই চার বছর তিনি হংকং বিশ্ববিদ্যালয়ের ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে চেয়ারম্যান হিসেবে কর্মরত ছিলেন। সেখান থেকে বিশ্ববিখ্যাত ইন্টারন্যাশনাল টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন (ITT) কোম্পানির ইলেকট্রো–অপ্‌টিক্যাল ডিভিশনের চিফ সাইন্টিস্ট নিযুক্ত হন এবং পরে ITT কোম্পানির প্রধান দফতরে এক্সিকিউটিভ সাইনটিস্ট হিসেবে পদোন্নতি লাভ করেন। এরই মধ্যে ITT এর জার্মান ব্রাঞ্চ লরেন্সের স্ট্যান্ডার্ড ইলেকট্রিক–এ এক বছর অতিবাহিত করেন। ১৯৮৮ সালের অক্টোবরে ITT হেডকোয়ার্টার্স (সদর দফতর) থেকে চাকুরিতে ইস্তফা দিয়ে হংকং বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর হিসেবে যোগদান করেন। তাঁর এই ধরনের কর্মধারার পরিবর্তন দেখে অনেকেই ভাবছেন যে, মাত্র ৫৭ বছর বয়সে যিনি এত কিছু করেছেন, পরে তিনি আর কি কি করবেন ? তাঁর এইরূপ কর্মধারা পরিবর্তনের বিচিত্রতা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি উত্তরে বলেছেন যে, একজন ব্যক্তির বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা, ইন্ডাষ্ট্রিতে উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনিক প্রধান হিসেবে প্রশাসন ব্যবস্থাপনা, গবেষণাগারে গবেষণার কাজ ইত্যাদি সম্পর্কে বহুমুখী অভিজ্ঞতা তাঁকে অনেক দূর এগিয়ে যেতে সাহায্য করে। তবু, মনে হয় একমাত্র তাঁর মতো ব্যক্তিত্বের পক্ষেই এ রকম বিচিত্র কর্মময় জীবনযাপন করা সম্ভব।

১৯৬০ সালে তাঁর STC কোম্পানিতে যোগদান করার পূর্ব পর্যন্ত টেলিযোগযোগ ব্যবস্থায় অপটিক্যাল গাইডের কোনো ভূমিকাই ছিল না। অবশ্য ১৯৫০ সাল থেকে STC কোম্পানি টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থায় ট্রান্সমিশন মাধ্যম হিসেবে অপ্‌টিক্যাল গাইডের প্রয়োগ কিভাবে করা যায় সে সম্পর্কে চিন্তভাবনা ও কাজকর্ম শুরু করেছিল। কারণ তখন সারা বিশ্বে টেলিফোনের চাহিদা এত দ্রুত হারে বেড়ে যাচ্ছিল যে, প্রচলিত তামার তারের পক্ষে ঐ চাহিদা মিটানো আর সম্ভব হচ্ছিল না। অনেক চিন্তাভাবনার পর অপ্‌টিক্যাল ওয়েভ গাইডের ক্ষুদ্রতম তরঙ্গদৈর্ঘ্যসম্পন্ন বিশাল ব্যান্ড উইড্‌থ্‌ বা কম্পনধারণ ক্ষমতার সদ্ব্যবহার কারে এ সমস্যা সমাধানের চেষ্টা চলছিল, কিন্তু তখন পর্যন্ত করো পক্ষে সাফল্য অর্জন সম্ভব হয় নি।

সে সময় STL এ অনেক বিজ্ঞানী অপ্‌টিক্যাল ওয়েভ গাইডের উপর কাজ করে যাচ্ছিলেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন বিজ্ঞানী স্যার এলেক রিভস (পালস কোড

মডুলেশনের উদ্ভাবক)। তিনি একটি দলের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। তিনি ডিসচার্জ লেন্স থেকে নির্গত আলোকরশ্মিকে মডুলেট করে সেটাকে একটি নির্দিষ্ট পথে পরিচালিত করার পরিকল্পনাকে বাস্তব রূপ দানের চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন। কিন্তু শত চেষ্টা সত্ত্বেও ১৯৫৯ সালে লেসার রশ্মি আবিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত এ বিষয়ে তেমন কোনো অগ্রগতি অর্জিত হয় নি। লেসার রশ্মির বিশেষ গুণাবলি হলো, এটা আকারে খুব ক্ষুদ্র, সহজেই মডুলেশন করা যায়, উচ্চ শক্তিসম্পন্ন এবং দীর্ঘ সময় ধরে কার্যক্ষম থাকতে পারে ; ফলে অপ্‌টিক্যাল কম্যুনিকেশন পদ্ধতি উদ্ভাবনের প্রচেষ্টায় ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানির বিজ্ঞানীদের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায়। সে সময় যে সমস্যাগুলো বিজ্ঞানীদের ব্যতিব্যস্ত করে রেখেছিল সেগুলো হচ্ছে সিগনাল সোর্স বা সঙ্কেত উৎসের উৎকর্ষ সাধন, সর্বোৎকৃষ্ট ট্রান্সমিশন মাধ্যমের উদ্ভাবন এবং একটি উন্নত মানের ডিটেক্টর বা নির্ণায়ক তৈরি করা। বিজ্ঞানী ই. এইচ. আর্মষ্ট্রং, আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেল, চার্লস হুইটস্টোন, স্যামুয়েল মোর্স এবং এমনকি ১৭২৯ সালে বিজ্ঞানী ষ্টিফেন গ্রেও একই ধরনের মৌলিক সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, আগামী শতকের বিজ্ঞানীদেরও একই ধরনের সমস্যার মোকাবিলা করতে হবে।

লেসার রশ্মি বাজারে এসে যাওয়ায় ক্ষুদ্রতম তরঙ্গদৈর্ঘ্যবিশিষ্ট ওয়েভ গাইড ব্যবহার করার সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে দেখা দেয়। ১৮৩০ সালে বিজ্ঞানী জে. টিনডেল বাতাসের মধ্য দিয়ে সিগনাল প্রেরণ করার কথা চিন্তাভাবনা করেছিলেন, কিন্তু এতে দুটো প্রধান সমস্যা ছিল—একটি হলো খারাপ আবহাওয়া, অপরটি বাতাসের ঘনত্বের পরিবর্তন। ফলে গাইডেড ওয়েভ বা নির্দিষ্ট পথে নিয়ন্ত্রিত তরঙ্গমালা ব্যবহার করার পরিকল্পনা করা হয়, কিন্তু তখন সবার মনে একটিই প্রশ্ন ছিল, কিভাবে সম্ভব হবে?

একটি পরিকল্পনা এইরূপ ছিল যে, লম্বা চোংগাকৃতি পাইপের ভিতর দিয়ে আলোকরশ্মির সঙ্কেত প্রবাহিত করা হবে। ঐ পাইপগুলোর ভিতরের দিক খুব মসৃণ করে বিশেষ কোনো পদার্থের আস্তর দিয়ে দেয়া হবে যাতে আলো খুব সহজেই প্রতিফলিত হতে পারে। আরেকটি পদ্ধতি এ রকম ভাবা হয়েছিল যে, পর পর কতকগুলো লেন্স ব্যবহার করে আলোক একটি নির্দিষ্ট সরলরেখা পথে পরিচালিত করা হবে, কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে দিয়ে যে সব সমস্যা দেখা দেয় তা সমাধান করা বিজ্ঞানীদের জন্য খুবই কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। কাও নিজেও বুঝতে পেরেছিলেন যে, একটি যথাযথ প্রেরণ মাধ্যম খুঁজে বের করা খুব সহজ কাজ নয়।

১৯৬৩ সালে অন্য বিজ্ঞানীদের সাথে কাওকে অপ্‌টিক্যাল কমিউনিকেশনের উপর কাজ করার দায়িত্ব দেয়া হয়। মাত্র এক বছর কাজ করার পর তিনি উপলব্ধি

করেছিলেন যে, ডাই-ইলেকট্রিক ওয়েভ গাইডের (চোংগাকৃতি পাইপের বদলে নিরেট কঠিন ধাতব বস্তু) কিছু সুপ্ত সম্ভাবনা রয়েছে। সেগুলো হবে আকারে ছোট, পারিপার্শ্বিক প্রতিবন্ধকমুক্ত এবং এগুলো আলোকরশ্মিকে কোনো আয়নার সাহায্য ব্যতীত নিজেরাই বাঁকা পথে পরিচালিত করতে পারবে। ইতিমধ্যে গ্লাস ফাইবার কনডাক্টর বাজারে এসে যায়। একসাথে কয়েক শত কিংবা কয়েক হাজার, আঁটি বেঁধে এগুলোর ভিতর দিয়ে আলো প্রবাহিত করে কম শক্তিসম্পন্ন আলোকসজ্জা করা সম্ভব হয় এবং দ্বি-মাত্রিক পদ্ধতিতে সাজিয়ে এগুলোর ভিতর দিয়ে প্রতিবিম্ব প্রেরণ করা সম্ভব হতো। আলোক পরিবহণকারী হিসেবে এগুলোর পরিবহণ ক্ষয়ের (Transmission Loss) পরিমাণ ছিল প্রতি মিটারে ৩ ডেসিবেল, ফলে বেশিরভাগ সঙ্কেত-শক্তি পরিবহণকালে অপচয় হওয়ার ফলে সঙ্কেত-শক্তি খুবই নিম্নতম পর্যায়ে নেমে যেতো এবং নানাবিধ সমস্যার সৃষ্টি হতো।

কাও অনেক চিন্তাভাবনা করে সম্পূর্ণ নতুন ধরনের গ্লাস-ফাইবার তৈরি করেছিলেন। তিনি একটি গোলাকৃতি লম্বা কাঁচের নলের উপর আরেকটি অপেক্ষাকৃত বড় আকারের (ব্যাস) কাঁচের নল আবরণ হিসেবে জড়িয়ে দেন। ভিতরের দিকের কাঁচের নলটিকে কোর (CORE) এবং বাইরের আবরণটিকে ক্ল্যাডিং (Cladding) নাম দেয়া হয়। কোরের প্রতিসরাঙ্ক (refractive index) ক্ল্যাডিং-এর প্রতিসরাঙ্ক হতে সামান্য বেশি রাখা হয়। ফলে এই নতুন ধরনের কাঁচের নলের ভিতর দিয়ে আলোক-সঙ্কেত সাফল্যজনকভাবে একটি নির্দিষ্ট পথে প্রেরণ করা সম্ভব হয়। এখন প্রশ্ন দেখা দেয়, এটাকে যোগাযোগ ক্ষেত্রে কেবল্ হিসেবে ব্যবহার করা সম্ভব হবে কি ? এই সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে উন্নতমানের পদার্থ ও গঠনপ্রকৃতির পরিবর্তন সম্বন্ধে চিন্তাভাবনা শুরু হয় ১৯৬৫ সালে তিনি সমস্ত বিজ্ঞানীদের নিকট প্রশ্ন রেখেছিলেন, পরিবহণকালীন আলোক-সঙ্কেতের যে পরিবর্তন ও সঙ্কোচন হয় এবং কারণগুলো কি কি ? এই প্রশ্ন তাঁর পূর্বে আর কারো চিন্তায় উদয় হয় নি। গবেষণা করে দেখা দিল যে, ফাইবারের ভিতর দিয়ে আলোক-সঙ্কেত শক্তির অপচয়/সঙ্কোচন হওয়ার কারণ হলো কাচ দ্বারা আলোক শোষণ এবং এই শুষে নেয়ার প্রধান কারণ হলো কাচের মধ্যে অন্য পদার্থের, বিশেষ করে, লোহার উপস্থিতি। এই অপচয়কে বিচ্ছুরণজনিত ক্ষতি (scattering loss) বলা হয়।

তাত্ত্বিকভাবে পর্যালোচনা করে দেখা গেল যে, এই অপচয় কমিয়ে প্রতি কিলোমিটারে ১ ডেসিবেল করা সম্ভব, কিন্তু বাস্তবে ১০০০ ডেসিবেল-এর কম করা সম্ভব হলো না। সুদীর্ঘ একটি বছর অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর কাও তাঁর সহযোগী

প্রকৌশলী জর্জ হোকাসের সাথে যুগ্মভাবে 'ডাই-ইলেকট্রিক্স ফাইবার সারফেস ওয়েভ গাইডস ফর অপ্‌টিক্যাল ফ্রিকোয়েন্সি' নামে একটি গবেষণা নিবন্ধ ১৯৬৬ সালের জুলাই মাসে IEEEএর প্রসিডিংস-এ প্রকাশ করেন। ঐ নিবন্ধে বলা হয় যে, কাচের আঁশের তৈরি একটি নলকে কোর হিসেবে এবং উপরে গায়ে আরেকটি নল জড়িয়ে যে নতুন ধরনের অপটিক্যাল ফাইবার তৈরি হবে সেটাকেই অপটিক্যাল ওয়েভ গাইড হিসেবে ব্যবহার করে টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার নতুন মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

অতি সংক্ষিপ্ত এই প্রবন্ধটি প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথে গোটা বিশ্বে তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি হয়। বিশেষ করে, গ্রেট ব্রিটেন ঐ একই বছরে ফুটবলে বিশ্বকাপ বিজয়ী হওয়ায় যতখানি আনন্দিত হয়েছিল এই অপ্‌টিক্যাল ফাইবার আবিষ্কারের ঘটনায় আনন্দিত হয়েছিল তার চেয়ে বেশি। তাঁদের প্রবন্ধে তাঁরা উল্লেখ করেছিলেন যে, এই নতুন অপ্‌টিক্যাল ফাইবারের সঙ্কেত—অপচয়ের পরিমাণ হবে প্রতি কিলোমটিরে মাত্র ২০ ডেসিবেল। এটা তৈরি করা কষ্টসাধ্য হলেও অসম্ভব নয়।

বৃটিশ পোস্ট অফিসের রিসার্চ সেন্টারের তৎকালীন পরিচালক জন ব্রে এই নিবন্ধটি পাঠ করে তৎক্ষণাৎ এর উপর কাজ শুরু করে দেন। এই রিসার্চ সেন্টারটি এখন 'বিটিশ টেলিকম' নামে পরিচিত এবং অপ্‌টিক্যাল ফাইবারের বাস্তব প্রয়োগের উপর এঁদের অপরিসীম অবদান রয়েছে। ইতিমধ্যে কাও বৃটেন ও জার্মানির বিভিন্ন রিসার্চ প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করেন এবং যুক্তরাষ্ট্র ও জাপান সরকারের আমন্ত্রণে সে দেশগুলো ভ্রমণ করে আসেন। তাঁর প্রবন্ধটি প্রকাশিত হওয়ার মাত্র চার বছরের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের কর্নিং গ্লাস কোম্পানি ২০ ডেসিবেল অপচয়সম্পন্ন অপ্‌টিক্যাল ফাইবার তৈরি করতে সক্ষম হয়। ১৯৭৬ সালের মধ্যে ১ ডেসিবেল অপচয়সম্পন্ন ফাইবার তৈরি হয়ে যায়। ইতিমধ্যে ০.১ ডেসিবেল অপচয়সম্পন্ন ফাইবারও তৈরি হয়ে গেছে। অর্থাৎ অপ্‌টিক্যাল ফাইবারের ভিতর দিয়ে সঙ্কেত প্রেরণকালে কোনো প্রকার অপচয় হবেই না বলা চলে। আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এ এক অবাক বিস্ময়। অপ্‌টিক্যাল ফাইবারের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য নিচে দেয়া হলো।

(১) তামার তারের তুলনায় অনেক গুণ বেশি টেলিফোন ও টেলিভিশন চ্যানেল বহণের ক্ষমতা (এক হাজার গুণ বেশি)।

(২) অতি উচ্চ কম্পন ধারণক্ষমতা। প্রতি সেকেন্ডে টেরা বিটস ($১০^{১২}$ বিট/ সেকেন্ড)।

(৩) নামমাত্র সঙ্কেত অপচয় (প্রতি কিলোমিটারে মাত্র ০.২ ডেসিবেলস)।

(৪) ইনপুট ও আউটপুটের মধ্যে বৈদ্যুতিক বিচ্ছিন্নতা (Electrical Isolation)।

(৫) দুই রিপিটার স্টেশনের মধ্যে অধিক দূরত্ব (৩০০–৫০০ কিলোমিটার)

(৬) বিদ্যুৎচুম্বকীয় আবেশ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত।

(৭) সঙ্কেত ফাঁস হওয়া ও ক্রস–টকের সমস্যা থেকে মুক্ত।

(৮) সংবাদ চুরি হওয়ার আশঙ্কা থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত, কারণ এটা ট্যাপ করা যায় না।

(৯) আকারে ও আয়তনে খুবই ছোট (মাথার চুলের মতো) ওজনে তামার তারের চেয়ে কয়েক হাজার গুণ হালকা।

(১০) শক্ত, সহনশীল, স্থিতিস্থাপকতাসম্পন্ন এবং আবহাওয়াজনিত ক্ষতির আশঙ্কা থেকে মুক্ত।

(১১) কম খরচে সিস্টেম সংস্থাপন করা যায়।

শুধুমাত্র টেলিযোগাযোগ ক্ষেত্রে নয় অন্যান্য নানাবিধ ক্ষেত্রে এর ব্যাপক ও বহুল প্রয়োগ হচ্ছে ; যেমন সাবমেরিন কেবল, বেসামরিক শিল্পক্ষেত্র, চিকিৎসাবিজ্ঞান, বায়োমেডিক্যাল রবোটিকস, বায়োকেমিক্যাল ও জৈব–পদার্থ গবেষণা, অপ্‌টিক্যাল কম্পিউটার এবং TOC বা ইন্টিগ্রেটেড অপ্‌টিক্যাল সার্কিট তৈরির ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ হচ্ছে।

সর্বপ্রথম সাফল্যজনকভাবে এর প্রয়োগ হয় ওকাউ ও ব্রিটিশ পোষ্ট অফিসের যৌথ উদ্যোগে ৯ কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত ইংল্যান্ডের স্টিভিনেজ ও হিচিন্‌স্ শহরের মধ্যে উচ্চ গতির টেলিফোন যোগাযোগ ব্যবস্থায় (১৯৭৭–১৯৮০)। বর্তমানে এটি সমগ্র বিশ্বের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির জগতের চেহারা সম্পূর্ণরূপে বদলে দিচ্ছে। TAT-7 নামক ৬৫০০ কিঃ মিঃ দীর্ঘ সাবমেরিন কেবল আটলান্টিক মহাসাগরের বুকে স্থাপিত হয়ে ইউরোপ ও আমেরিকাকে যুক্ত করেছে এবং TPC-33 নামক ১৩২০০ কিঃ মিঃ দীর্ঘ সাবমেরিন কেবল প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে স্থাপিত হয়ে জাপান ও আমেরিকাকে যুক্ত করেছে। গোটা পৃথিবী এই অবিস্মরণীয় আবিস্কারের জন্য বিজ্ঞানী কাওকে সম্মানিত করেছে। তিনি অপ্‌টিক্যাল ফাইবার ও অপ্‌টিক্যাল কম্যুনিকেশনের উপর অনেক প্রবন্ধ ও পুস্তক রচনা করেছেন। তাঁর ৩০টি পেটেন্ট রয়েছে। ১৯৭৭ সালের দিকে দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করে তিনি বলেছিলেন যে, ভবিষ্যৎ যোগাযোগ ব্যবস্থায় অপ্‌টিক্যাল ফাইবার একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করবে। তাঁর এই ভবিষদ্বাণী আজ

১৯৯০–এর দশকে এসে সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। বর্তমানে "ইনফরমেশন সোসাইটি" নামে পরিচিত যোগাযোগ ব্যবস্থায় ভয়েস ডেটা (DATA) টেলিফোন, টেলিভিশন, ফ্যাক্সসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে অপ্‌টিক্যাল ফাইবার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। ITT-এর সদর দফতর ছেড়ে ১৯৮৮ সালে হংকং বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর হিসেবে যোগদানের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত তিনি যোগাযোগ ব্যবস্থায় আরো বৃহৎ আয়তনের ও উচ্চ মানের ব্যান্ড উইড্‌থ (কম্পন ধারণক্ষমতা) ব্যবহার করার উপায় নির্ধারণী দলের প্রধান হিসেবে কাজ করছিলেন এবং প্রচলিত গিগাবিটসের ১০৯ বিট (সেকেন্ড) স্থলে টেরাবিটস (১০^{১২} বিটশ/সেকেন্ড) সঙ্কেত পাঠানোর পদ্ধতির উদ্ভাবন প্রচেষ্টায় নিয়োজিত ছিলেন। তিনি বলেছেন, যতই দিন যাচ্ছে গবেষণার মান ততই উন্নত হচ্ছে, ফলে আজ যা মানুষের ধারণার বাইরে মনে হচ্ছে কাল সেটা মানুষের করায়ত্ত হবে। তিনি আরো বলেছেন যে, আগামী শতকটি হবে "ফাইবার সোসাইটি" শতক এবং ঐ অনাগত সোসাইটির একজন সম্মানিত সদস্য হিসেবে বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষা তিনি প্রকাশ করেছেন।

বিজ্ঞানী অধ্যাপক চার্লস কুয়েন কাও–এর বৈচিত্রময় জীবন যে কোনো মানুষের মনে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণার সঞ্চার করবে, সন্দেহ নেই। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে একচেটিয়া আধিপত্য বিস্তারকারী পশ্চিমা জগতের নিকট কাও যেমন একটি ব্যতিক্রমধর্মী প্রতিভা, ঠিক তেমনি অনগ্রসর ও পশ্চাৎপদ এশিয়া–আফ্রিকাবাসীদের জন্য তিনি একটি অনন্য আশার প্রদীপ।

BANSDOC Library
Accession No. 18484